কোয়াটারনারি এবং বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ

মোঃ হোসেন মনসুর

কোয়াটারনারি এবং বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ

কোয়াটারনারি এবং বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ

(Quaternary and Geological Evolution of Bangladesh)

ড. মোঃ হোসেন মনসুর
প্রফেসর
ভূতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৫/জুন ১৯৯৮
বাএ (৯৭-৯৮ পাঠ্যপুস্তক : ভৌ ও প্র : ১২) ৩৭৯৩

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ
ভৌ ও প্র ১৮২

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
শচীন্দ্রলাল বড়ুয়া

মূল্য : ৬০.০০

QUATERNARY EBONG BANGLADESHER BHUTATTIC CHROMOBIKASH (Quaternary and Geological Evolution of Bangladesh) by Dr. Md. Hussain Monsur, Professor, Department of Geology, Dhaka University. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, June 1998. Price : Taka 60.00

ISBN 984-07-3802-X

BANSDOC Library

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক মরহুম মওলানা মোহাম্মদ তোফায়েল
উদ্দিন সিদ্দিকীর স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষা বাংলায় সহজতর করে কোয়াটারনারি এবং বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে কোয়াটারনারির সনাতন ধ্যান-ধারণার পাশাপাশি আধুনিক উপাত্ত দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। **কোয়াটারনারি এবং বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ** বইটি বাংলাদেশের সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিষয়ক বিভাগগুলোর বি. এসসি ও এম. এসসি মানের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বইটি উচ্চতর গবেষণার চাহিদা মেটানো ছাড়াও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সংযোজনে ইউরোপে বিশেষ করে, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে রচিত হয়েছে। স্তরতত্ত্বের অনেক কিছুই ক্লাসে পঠিত অধ্যাপক আর পাপের (R. Paepe) সরবরাহকৃত হ্যান্ডনোট। আমি প্রথমেই আমার শিক্ষক অধ্যাপক পাপ ও তাঁর বিভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সকল শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থটি প্রণয়নে অনেক বিদেশী লেখক ও গবেষকের রচনাবলী ও চিত্রাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। সেজন্য আমি অধ্যাপক ডি কিউ বোয়েনসহ সকল বিশেষজ্ঞদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কম্পিউটারের মাধ্যমে চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে আমার সহকর্মী ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার সর্বোতভাবে আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ ছাড়াও গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি টাইপে বিভাগীয় কর্মচারী জনাব মুজিবুর রহমান যথেষ্ট সাহায্য করেছেন বিধায় তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটির উপাত্ত সংগ্রহে ইউনেস্কো ও ইউনেস্কো পরিচালিত আইজিসিপি-৩৪৭ নং প্রজেক্টের আওতায় মাঠকার্যের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সহায়তা করেছে বিধায় আমি আইজিসিপির সেক্রেটারি জেনারেল ড. বাবুস্কাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে, আমি আশা করছি, বইটি বাংলা ভাষায় অধ্যয়নরত বি. এসসি, এম. এসসি ও সংশ্লিষ্ট গবেষকদের জ্ঞানার্জনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

মোঃ হোসেন মনসুর

BANSDOC Library Dhaka

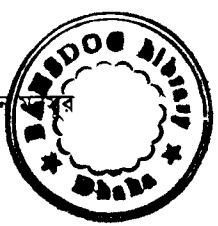

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : **কোয়াটারনারির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ** ১-৫৭

ভূমিকা

কোয়াটারনারি, প্লেইস্টোসিন ও হলোসিন নামকরণের উৎপত্তি

হিমযুগ ও হিমবিরতি এবং তাদের কাল ও অন্তর্বর্তীকাল পরিভাষার সংজ্ঞা

ক্ল্যাসিক্যাল মডেলসমূহ

(ক) আলপাইন মডেল

হিমযুগ ও হিমবিরতির স্থিতিকাল

(খ) উত্তর ইউরোপের মডেল

এলস্‌টার হিমক্রিয়া

হলস্টেইন হিমবিরতি

সায়ালে হিমক্রিয়া

এমিয়ান হিমবিরতি

উইচ্‌সেল হিমক্রিয়া

(গ) উত্তর সাগর অববাহিকায় ব্যবহৃত কালস্তরতত্ত্ব

বুডেলের জলবায়ুর রেখাচিত্র

জলবায়ুর রেখাচিত্র এবং ঠাণ্ডা-গরমের চক্রসমূহ

টিবার সীমা

ক্যালাব্রিয়া সোপান

ভিলাফ্রাঙ্কার জীবাশ্মের সমাবেশসমূহ

প্লেইসটোসিন সময়ের স্তন্যপায়ী প্রাণিকুল

বর্ষাকাল ও বর্ষাবিরতি

মানবের বিবর্তন

সিবালিক জীবাশ্মের সমাবেশ

সিবালিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

BANSDOC Library Dhaka

কামলিয়াল সোপান
চিঞ্জি সোপান
নাগ্রি সোপান
ধোক পাঠান সোপান
ট্যাট্রট-পিঞ্জর সোপান
তাবি বা বোল্ডার কংগ্লোমারেট সোপান
প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন সীমারেখা
হৈমিক ও হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলের ভূতত্ত্ব
হিমাবৃতাঞ্চল
পলি : (ক) অস্তরীভূত
(খ) স্তরীভূত অবক্ষেপ
ভূমিরূপ
হিমসান্নিগ্ধাঞ্চল
চীরতুষার ভূমি, কালিয় হিম জমাট ভূমি এবং সক্রিয় স্তর
হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুখাবয়ব

দ্বিতীয় অধ্যায় : **বাংলাদেশের কোয়াটারনারির স্তরতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ** ৫৮-৮১
ভূমিকা
(ক) মধুপুর এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম
(খ) বরেন্দ্র এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম
(গ) চলনবিল এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম
(ঘ) দহগ্রাম-পঞ্চগড় এলাকার কোয়াটারনারি অবক্ষেপের স্তরক্রম
(ঙ) জৈন্তপুর এলাকার কোয়াটারনারি অবক্ষেপের স্তরক্রম
বিভিন্ন স্তরীয় এককের মধ্যে পারম্পর্য স্থাপন
মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘদ্বয়ের অবক্ষেপণের প্রতিবেশ
নব কোয়াটারনারির মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এবং বাংলা বেসিনের অবক্ষেপণের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায় : **পুরাচৌম্বকত্ব** ৮২-৯৬
ভূমিকা
ভূচৌম্বকত্ব
ভূচৌম্বকের ক্ষেত্র পরিবর্তন
চৌম্বকীয় পদার্থ
কুরী তাপমাত্রা
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক চুম্বকায়ন
বিভিন্ন প্রকার চুম্বকাবশেষ
নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরিমাপ
গবেষণালব্ধ উপাত্তের বিশ্লেষণ
বাংলাদেশের কোয়াটারনারি অবক্ষেপের পুরাচৌম্বকত্বের ফলাফল

চতুর্থ অধ্যায় : **সমুদ্রপৃষ্ঠ** ৯৭-১০৯
ভূমিকা
পেইস্টোসিন উপযুগের সমুদ্রপৃষ্ঠ
হলোসিনের সমুদ্রপৃষ্ঠ
অতীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তনের প্রমাণাদি
বঙ্গোপসাগর তটে সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তনের নির্দশনসমূহ

পঞ্চম অধ্যায় : **পুরামৃত্তিকা** ১১০-১১৭
ভূমিকা
পুরামৃত্তিকার প্রকারভেদ
পুরামৃত্তিকার শনাক্তকরণ
মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের মাইক্রোমরফোলজিক্যাল গবেষণা

ষষ্ঠ অধ্যায় : **অক্সিজেন আইসোটোপ** ১১৮-১২৭
ভূমিকা
আইসোটোপ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়াসমূহ
বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন

আইসোটোপ মাপক যন্ত্র ও মান
সাগর তলানির অক্সিজেন আইসোটোপীয় গবেষণা
অক্সিজেন আইসোটোপ গবেষণার সংক্ষিপ্ত কার্যপ্রণালী
অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্র

গ্রন্থপঞ্জি ১২৯-১৩২
পরিভাষা ১৩৩-১৩৫

প্রথম অধ্যায়

কোয়াটারনারির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(General Characteristics of the Quaternary)

ভূমিকা

কোয়াটারনারি যুগ (Quaternary Period) হলো ভূতাত্ত্বিক সময়ের এমন একটি ভাগ, যে ভাগে বর্তমানও অন্তর্ভুক্ত। ভূতত্ত্ববিদদের অনেকেই সনাতন ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁরা অনেকেই বলেন, কোয়াটারনারি আবার কি? কিইবা তার দুনিয়া জোড়া আলাদা ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য? আসলে কোয়াটারনারি বলে কিছু নেই ; কোয়াটারনারি যুগ হলো টারশিয়ারি যুগের (Tertiary Period) ধারাবাহিকতা। তা না হলে টারশিয়ারি ও কোয়াটারনারির নির্দিষ্ট সীমারেখা কোথায়? উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর সমাধান পেলেই কোয়াটারনারি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা উপলব্ধি করা যাবে এবং ঐসব প্রশ্ন সামনে রেখেই এখানে কোয়াটারনারির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হবে। নানাদিক থেকেই কোয়াটারনারি বৈচিত্র্যময়। এ সময়ের ভূরূপ বা প্রাকৃতিক গঠন (Geomorphology), তাপমাত্রার চরম হ্রাসবৃদ্ধি, নতুন নতুন প্রাণীর আবির্ভাব বিশেষ করে পৃথিবীতে মেধাসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব কোয়াটারনারিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

কোয়াটারনারির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তন (climatic change)। জলবায়ুর পরিবর্তন পশ্চিম ইউরোপে প্রকটভাবে দেখা দেয় যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন ১৭৯৫ সালে জেমস হাটন (James Hutton) আলপাইন (Alpine) এলাকায় কিছু বিদেশী শিলাখণ্ড (Erratic blocks) দেখতে পান যা তিনি হৈমবাহিত (Glacier borne) বলে মনে করতেন। আসলে ঐ এলাকাটিতে হিমবাহ বিস্তৃত হবার কথা নয়। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে জন প্লেফেয়ার (John Playfair) নামে সুইজারল্যান্ডের একজন কৃষক আলপস পার্বত্য এলাকায় অতীতের বরফ বিস্তৃতির আলামত দেখতে পান। অন্যদিকে ১৮২৪ সালে এসমার্ক (Esmark) নরওয়েতে প্রাচীনকালের বরফের বিস্তৃতির আলামত দেখতে পান পাহাড়িয়া এলাকায়। এরপরই ১৮২৯ সালে ভেনেজ (Venezt) জোরালো দাবি তুললেন যে এককালে ইউরোপ বরফে ঢাকা ছিল। ১৮৩৮ সালে বাকল্যান্ড (Buckland) এমন সিদ্ধান্তে আসেন যে বৃটেনও বরফে ঢাকা ছিল। আর হিমযুগের ধারণাটি ১৮৩৯ সালে কনর‍্যাড (Conrad) এর মাধ্যমে আমেরিকায় স্বীকৃতি লাভ করে।

ধীরে ধীরে মানুষের কাছে এটিই প্রতীয়মান হতে থাকে যে, পৃথিবী অতীতে চরম ঠাণ্ডা হয়েছিল যার ফলে মেরু অঞ্চল থেকে হিমবাহ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়েছিল। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার বিশাল এলাকা বরফে ঢেকে যায়। হিমবাহ ৫০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

আমরা অতীতের বরফের বিস্তৃতির সময়কে "হিমযুগ (Glacial Period)" বলব। হিসাব করে দেখা গেছে যে, হিমযুগে বরফের স্তর বা হিমবাহের বিস্তৃতি এখনকার বিস্তৃতির চেয়ে তের গুণ বেশি ছিল। আর বড় বড় বরফের স্তরের গড় পুরুত্ব ছিল প্রায় দুই কিলোমিটার। কি বিশাল ছিল বরফের স্তূপ। এটি কোয়াটারনারির বৈশিষ্ট্য বৈ কি?

কোয়াটারনারির সময়ে হিমবাহের আবির্ভাব শুধু একবার নয়। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে, স্থলভাগ বরফে ঢেকেছে। আবার পৃথিবী গরম হয়েছে, বরফের স্তর গলে গিয়েছে। উষ্ণ মরু অঞ্চলের জলাশয় বা সরোবরগুলো (lakes) কোয়াটারনারির কোনো কোনো সময়ে পানিতে কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আবার কোনো কোনো সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

কোয়াটারনারির আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের আকস্মিক উঠানামা (Sea-level changes)। এইতো মাত্র ১৮,০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠ (Present mean sea-level) অপেক্ষা ১০০ থেকে ১৩০ মিটার নিচে ছিল। পৃথিবীর তাপমাত্রার তারতম্যের সাথে সাথে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঠানামা করতো। একই সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় হিমযুগ (Glacial Period) ও হিমবিরতি যুগের (Interglacial Period) গড় বার্ষিক তাপমাত্রার তারতম্য ছিল প্রায় ৫° সেলসিয়াস, আর স্থলভাগের অভ্যন্তরে এ তারতম্য ১০° সেলসিয়াস ছেড়ে গিয়েছিল।

হিমবাহের প্রসারণ ও সংকোচন অনেকটা হারমোনিয়ামের বেলুর মতো। পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকলে বরফের স্তর নিরক্ষরেখার দিকে এগুতে থাকে আবার গরম হলে মেরু অঞ্চলের দিকে সংকুচিত হয়। পর্বতাঞ্চলের হিমবাহসমূহও তাপমাত্রা তারতম্যে সাড়া দিয়ে থাকে। বরফের যুগে হিমবাহ (Glacier) পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত নেমে এসেছিল এবং গরমের যুগে হিমবাহ পর্বতের চূড়ার দিকে উঠে যায়। তাপমাত্রার এই হারমোনিক গতিধারায় উদ্ভিদ জগতেও পরিবর্তন ঘটে। বনাঞ্চল তাপমাত্রার তারতম্যের সাথে সাথে মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চল আবার নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হতে থাকে। ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গাছপালার ভিন্নতায়। একই অঞ্চলে হিমযুগ ও হিমবিরতির যুগে গাছপালার প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। ১.১ চিত্রে অক্ষাংশ ভেদে বনাঞ্চলের যে ধারাবাহিক পরিবর্তন হয় তা দেখানো হয়েছে।

কোয়াটারনারির আর একটি দিক হলো এই যে, এ পললগুলোর (sediments) মধ্যে যত মলাস্কের জীবাশ্ম (Molluscan Fauna) পাওয়া যায় তার ৭০% ভাগ প্রজাতিই এখনও জীবন্ত আছে। এছাড়া হাতি (Elephus), গরু (Leptobos), ঘোড়া (Equus) ও মানুষের (Hominid) আবির্ভাব কোয়াটারনারি যুগকে অন্যান্য যুগ থেকে আলাদা করে রেখেছে।

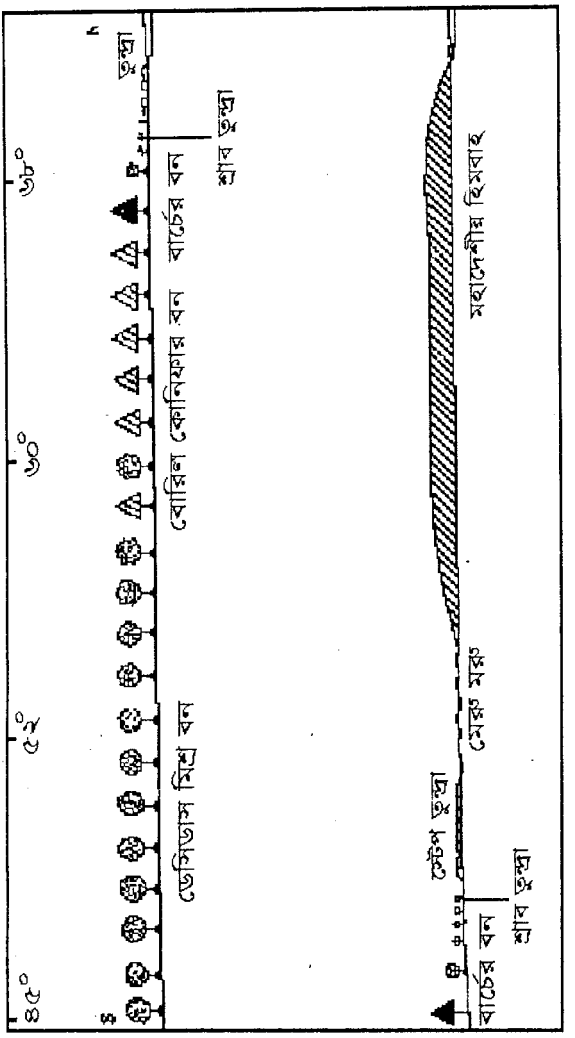

চিত্র ১.১ : ইউরোপের হিমযুগ ও হিমবিরতির গাছপালাসমূহ (সূত্র : ভ্যানডার হামেন ও অন্যান্য, ১৯৭১)।

কোয়াটারনারি, প্লেইসটোসিন ও হলোসিন নামকরণের উৎপত্তি

১৯২৯ সালে ডেসনোয়ারস (Desnoyers)-ই কোয়াটারনারি নামের প্রবর্তন করেন। সে সময়ে তিনি প্যারিস বেসিনের উপর গবেষণা করছিলেন এবং প্যারিস বেসিনে টারশিয়ারি স্তরের উপর যত অবক্ষেপ (deposits) ছিল সবগুলোকেই তিনি কোয়াটারনারি অবক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। ১৮৩৩ সালে রেবাউল (Rebaul) কোয়াটারনারির চমৎকার বর্ণনা

দেন, তিনি বলেন, কোয়াটারনারি তলানিতে ফাউনা (Fauna, প্রাণী জীবাশ্ম) ও ফ্লোরা (Flora, উদ্ভিদ জীবাশ্ম) থাকবে যে প্রজাতি এখনও জীবন্ত।

১৮৩৯ সালে চার্লস লিয়েল (C. Lyell) প্রত্নজীববিদ্যার (Palaeontology) উপর ভিত্তি করে প্লেইসটোসিন (Pleistocene) নামের প্রবর্তন করেন। প্লেইসটোসিন মানে হলো সবচেয়ে নবীন। তাঁর মতে, প্লেইসটোসিন অবক্ষেপগুলোতে যে সকল মলাস্কা (Mollusca) পাওয়া যায় তার শতকরা ৭০ ভাগ প্রজাতি এখনও বেঁচে আছে (অর্থাৎ সে সকল প্রজাতির জীবনচক্র এখনও শেষ হয় নি)। ১৮৪৬ সালে ফরবেস (Forbes) লিয়েলের প্লেইসটোসিন ধারণাকে আরও সতেজ করে তুলেন এবং তিনি বলেন, প্লেইসটোসিন আর হিমযুগ একার্থেই প্রয়োগ করা উচিত। আর হিমযুগের পরবর্তী সময় হলো নবকাল (recent)। এভাবেই গত শতাব্দীর কোয়াটারনারির ধারণার গোড়াপত্তন হতে থাকে। কিন্তু আসল কথা হলো, প্লেইসটোসিন আর হিমযুগ একার্থে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ কোয়াটারনারির আগেই হিমযুগ শুরু হয়েছে। ১৮৪৬ সালে ফরবেস নবকাল নামকরণ করলেও ১৮৮৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়নি। ১৮৮৫ সালে নবকালের পরিবর্তে হলোসিন (Holocene) বা সম্পূর্ণ নবকাল নামের স্বীকৃতি পায়। গারভেইস (Gervais)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেস (International Geological Congress) ১৮৮৫ সালে হলোসিন উপযুগ (Holocene Epoch) এর স্বীকৃতি দান করেন। এভাবেই সেনোজইক অধিযুগকে (Cenozoic Era) টারশিয়ারি ও কোয়াটারনারি নামে দুটি যুগে ভাগ করা হয় এবং কোয়াটারনারি যুগকে প্লেইসটোসিন ও হলোসিন উপযুগে বিভক্ত করা হয়।

হিমযুগ ও হিমবিরতি এবং তাদের কাল ও অন্তর্বর্তীকাল পরিভাষার সংজ্ঞা (Definition of Glacial, Interglacial and their Stadial and Interstadial Terminology)

(ক) হিমযুগ (Glacial Period) : কোয়াটারনারি যুগে জলবায়ুর পরিবর্তন লক্ষণীয়। জলবায়ু তারতম্যের ফলে ভূতাত্ত্বিক সময়ে পৃথিবী বহুবার শীতল ও উষ্ণ হয়ে উঠেছে। যখন পৃথিবী শীতল হয়ে উঠেছে তখন মেরু অঞ্চল থেকে হিমবাহ নিরক্ষরেখার দিকে ধাবিত হয়েছে। সে সময়ে পৃথিবীর স্থলভাগের বিরাট অংশ বরফে ঢেকে গেছে। নিরক্ষ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত বরফের বিস্তৃতি ঘটেছে। সমুদ্রের পানি প্রথমে জলীয়বাষ্প আকারে এবং পরে তুষার বা বরফ আকারে স্থলভাগের উপরে জমা হয়েছিল। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ (sea-level) নিচে নেমে গিয়েছিল। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে উঠার এই সময়কে **হিমযুগ** বলে। এই হিমযুগে অল্প সময়ের জন্য কোনো কোনো সময় পৃথিবী বেশি ঠাণ্ডা হয়েছে। সে সময়কে আমরা **শীতল হিমযুগ** (Stadial in Glacial Period) এবং হিমযুগে অল্প সময়ের জন্য কিছুটা হালকা শীতল সময়কে **উষ্ণ হিমযুগ** (Interstadial in Glacial Period) বলবো।

(খ) হিমবিরতি (Interglacial Period) : প্রতিটি হিমযুগের পরে পৃথিবী গরম হয়ে উঠেছিল। স্থলভাগের বরফ গলে গিয়েছিল। বরফ গলা পানি সমুদ্রে ফেরত যাওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর আবহাওয়া অনেকটা বর্তমান কালের মতো ছিল। কোয়াটারনারির তেমন কালকে হিমবিরতি বলে। হিমবিরতিতেও তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যায়। কোনো সময় বেশি উষ্ণ, আবার কোনো সময় কিছুটা শীতল। অর্থাৎ জলবায়ু চক্রাকারে উঠানামা করে। এ যুগের অতি উষ্ণ কালকে আমরা উষ্ণ হিমবিরতি (Interstadial in Interglacial) এবং কিছুটা শীতল হিমবিরতিকে আমরা শীতল হিমবিরতি (Stadial in interglacial) বলবো।

ক্ল্যাসিক্যাল মডেলসমূহ (Classical Models)

এ অনুচ্ছেদে আমরা প্লেইসটোসিন উপযুগকে শ্রেণীবিভাগ করার কয়েকটি সর্বস্বীকৃত মডেল নিয়ে আলোচনা করবো। ক্লাসিক্যাল মডেলগুলোর মধ্যে (ক) আলপাইন মডেল (The Alpine Model), (খ) উত্তর ইউরোপের মডেল (North European Model), (গ) বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মডেল (Model of the British Isles) এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় উত্তর আমেরিকার মডেল (Central North American Model) নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(ক) আলপাইন মডেল (Alpine Model)

আলব্রেচ পেন্ক (Albrecht Penck) ও এডওয়ার্ট ব্রাকনার (Edward Bruckner) ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্লেইসটোসিন উপযুগকে ৪ ভাঁজে ভাগ করে শ্রেণীবিভাগ করেন। এ দু'জন ভূতত্ত্ববিদের এটাই ছিল সর্বোত্তম কৃতিত্ব। তাঁদের এ গবেষণা কার্য সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাদের ধাঁচে প্রতিটি দেশে বছরের পর বছর ধরে প্লেইসটোসিন অবক্ষেপগুলোকে শ্রেণীবিভাগ করার অনুশীলন চলতে থাকে। আলপাইন বরফের যুগের মূল পরিকল্পনাকারী হলেন আলব্রেচ পেন্ক (১৮৮৫)। তাঁর এই পরিকল্পনা পরবর্তী বহু বছর ধরে ভূতত্ত্ববিদদের প্রভাবান্বিত করে তুলে। উলম (Ulm) ও মিউনিকের (Munic) দক্ষিণে বিভার মালভূমি (Bivarian Plateau)। আর এ মালভূমি হলো লেচ (Lech) ও ইলার (Iller) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল (চিত্র ১.২)। আলপাইন মডেলের মূল পরিকল্পনার এখান থেকেই শুরু। আলপাইন মডেলের মূল পরিকল্পনায় তিনটি বরফের যুগের কথা বলা হয়েছে। ১৮৮৫ সালে পেন্ক বিভারিয়ায় ও লেক কনস্টানস (Lake Constance) এর চারপাশে নুড়িপাথরের তিনটি টেরাস (Terrace) শনাক্ত করেন। এই নুড়ি পাথরগুলো ছিল বরফ গলা পানির নদীবাহিত পাথর যা তিনটি সময়ে হৈমপ্লাবনভূমিতে (Fluvioglacial Flood plain) তিনটি হৈমপ্লাবনভূমির টেরাস তৈরি করেছে (Fluvioglacial Outwash Terrace)। ১৮৮৫ সালে পেন্ক এই তিনটি টেরাসকে (১)

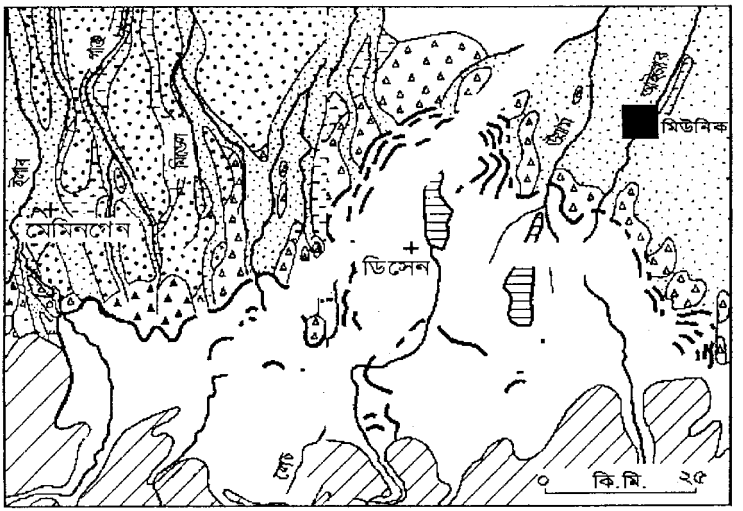

চিত্র ১.২ : ব্যাভারিয়া এলাকা। মোটা রেখা : মোরেন ; খোলা ত্রিভুজ : রিস্ মোরেন ; পূর্ণ ত্রিভুজ : মিন্ডেল মোরেন ; মোটা ফোঁটা : ডেকেন সুটার ; ড্যাস : উঁচু টেরাস ; চিকন ফোঁটা : নিচু টেরাস (সূত্র : পেনক্ ও ব্রাকনার, ১৯০৯)।

ডেকেন সুটার (Decken Schotter or Cover grave) (২) উঁচু টেরাস (High Terrace) ও (৩) নিচু টেরাস (Low Terrace) বলে আখ্যায়িত করেন। পেন্কের ধারণা ছিল প্রত্যেকটি টেরাস এক একটি হিমযুগে গঠিত হয়েছে। পেন্কের মূল পরিকল্পনায় উঁচু ও নিচু টেরাস দুটি শেষ মোরেন দ্বারা (End Moraine) সম্পর্কযুক্ত ছিল। ডেকেন সুটার ছিল বিক্ষিপ্ত একটি টেরাস। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এডওয়ার্ড ব্রাকনার বিভারিয়ার আরোও পূর্বে স্যালজ্যাক উপত্যকায় এমন তিনটি টেরাসের অস্তিত্ব দেখতে পান। পরবর্তীতে পেন্ক ও ব্রাকনার দুজনে মিলে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ডাই আলপেন ইন এইসজেইটালটার (Die Alpen Eiszeitaltar) নামক একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইটিতে পেন্ক ডেকেন সুটারকে পুরানো ও নব (Older and Younger Decken Schotter) দুটি ভাগে ভাগ করে মোট ৪টি টেরাসের কথা বলেছেন (চিত্র ১.৩)। এই চারটি টেরাসই ৪টি হিমযুগের ইঙ্গিত বহন করে। পেন্ক ও ব্রাকনারের প্লেইসটোসিন সময়ের চারবার বরফের যুগের আবির্ভাবের ধারণা সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। লেচ ও ইলার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল সাম্প্রতিককালে বরফে ঢাকা ছিল না। তাই এই এলাকায় মোরেনের অস্তিত্ব বিস্ময়কর বৈকি !

এই মোরেন ও হিমকর্দের (Till) অবক্ষেপগুলো চারটি সময়ের চারটি টেরাস (Terrace, সমতল ছাদ বা ধাপ) তৈরি করেছে। এক একটি হিমযুগে পৃথিবী শীতল হয়েছে, বিভারিয়া এলাকা বরফে ঢেকে গেছে, আবার পৃথিবী গরম হয়ে উঠেছে (হিমবিরতি), বিভারিয়া এলাকার বরফ গলে গেছে। এভাবেই হিমযুগ ও হিমবিরতির ধারণার সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডার যুগ শেষ হয় গরমের যুগ আসে, আবার গরমের যুগ শেষ হয় ঠাণ্ডার যুগ আসে। এভাবেই চার বার হিমযুগ ও চার বার হিমবিরতির আবির্ভাব ঘটে প্লেইসটোসিন সময়ে। হিমযুগ ও হিমবিরতিকে আমরা অনেক সময় "বরফকাল ও গরমকাল" বলেও আখ্যায়িত করবো।

পেন্‌ক এবং ব্রাকনার (১৯০৯) এই চারটি বরফের যুগের নাম দিয়েছেন বিভারিয়া এলাকায় প্রবাহিত চারটি নদীর নামানুসারে। নদীগুলো হলো উয়ার্ম (Wurm), রিস (Riss), মিন্ডেল (Mindel) এবং গাঞ্জ (Gunz)। পেন্‌ক এবং ব্রাকনার চারটি হিমযুগকে উয়ার্ম, রিস, মিন্ডেল এবং গাঞ্জ বলে অভিহিত করেন। নিম্নে পেন্‌ক এবং ব্রাকনারের ৪টি বরফের যুগ ও চারটি গরমের যুগের তালিকা প্রদত্ত হলো।

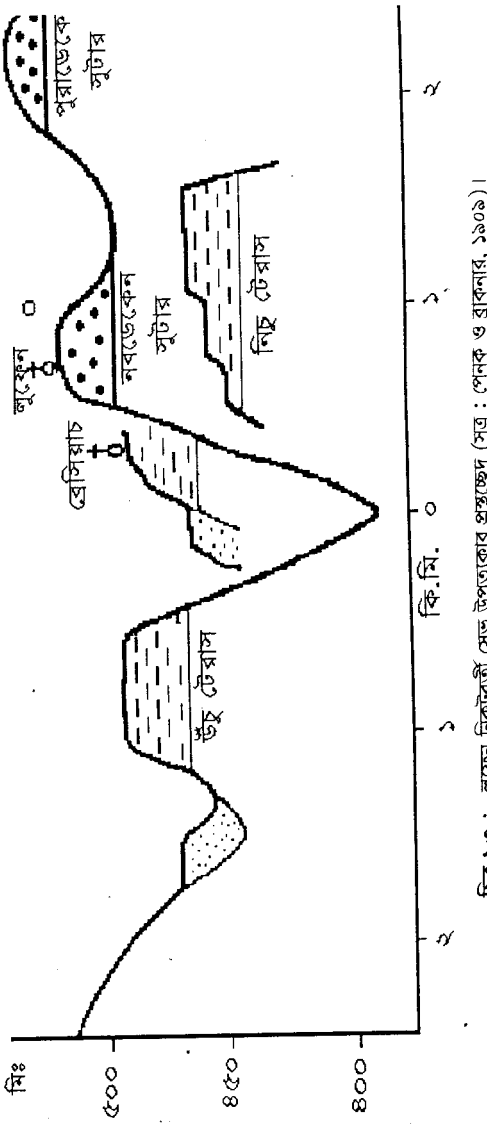

চিত্র ১.৩ : লুফেন নিকটবর্তী সেভ উপত্যকার প্রস্থচ্ছেদ (সূত্র : পেনক ও ব্রাকনার, ১৯০৯)।

উয়ার্ম হিমযুগ	— নিচু টেরাস
রিস-উয়ার্ম হিমবিরতি	— ক্ষয় সাধন
রিস হিমযুগ	— উঁচু টেরাস
মিন্ডেল-রিস হিমবিরতি	— ক্ষয় সাধন
মিন্ডেল হিমযুগ	— নব নুড়িপাথর
গাঞ্জ-মিন্ডেল হিমবিরত	— ক্ষয় সাধন
গাঞ্জ হিমযুগ	— পুরানো নুড়িপাথর

উঁচু ও নিচু টেরাস দুটি বিখ্যাত শেষ মোরেনের (End Moraine) এলাকা দ্বারা সংযুক্ত ছিল। নিচু টেরাসের ভিতরের মোরেনগুলো ছিল বেশ টাটকা বা সতেজ। নিচু টেরাসের (Low terrace) মোরেনগুলো পরবর্তী সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নি। উচু টেরাসের মোরেনগুলো নিচু টেরাসের মত টাটকা ছিল না ; কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত ছিল। নতুন ও পুরানো অবক্ষেপগুলোর আরো একটি দিক হলো এ সমস্ত মোরেনের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীনালার প্রাকৃতিক ভেদাভেদ। পুরানো মোরেনের টেরাসের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো বেশ পরিপক্ব ; অন্যদিকে নবীন টেরাসের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো ততো পরিপক্ব নয় এবং ছোট ছোট জলাশয় দিয়ে ভর্তি। এ ছাড়াও পুরানো মোরেনগুলো লোয়েস (Loess) দ্বারা ঢাকা পড়েছে। লোয়েস হলো বায়ুবাহিত বালিকণা।

উঁচু ও নিচু দুটি টেরাসই আলপাইন এলাকায় উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। পেন্‌ক ও ব্রাকনারের অঙ্কিত লুফেনের (Luffen) নিকট সেভ উপত্যকার (Save valley) একটি প্রস্থচ্ছেদ (cross section) ১.৩ চিত্রে দেখানো হলো। নবীন ও পুরানো ডেকেনসুটার (Younger and Older Decken schotter) দুটি অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত। বিভারিয়াতে পুরানো ডেকেন সুটার কয়েকটি খণ্ড খণ্ড নুড়িপাথরের স্তর নিয়ে গঠিত। এই খণ্ড খণ্ড নুড়িপাথরের আলপস পর্বতমালার পাদদেশ থেকে বিস্তৃত। ডেকেন নুড়িপাথরের স্তর যেগুলো এখনও টিকে আছে সেগুলো প্রায়ই দেখা যায় বিক্ষিপ্ত মালভূমিতে (Plateau) অথবা পাহাড়ের উপরে। এই ডেকেন সুটারের উপরেই আধুনিককালে তৈরি করা হয়েছে অনেক গির্জা।

হিমযুগ ও হিমবিরতির স্থিতিকাল (Duration of the Glacial and Interglacial Periods)

পেন্‌ক ও ব্রাকনার (১৯০৯) চারটি বরফকালের আপেক্ষিক স্থিতিকাল হিসাব করে বের করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, রিস হিমযুগ উয়ার্ম হিমযুগের চেয়ে দীর্ঘ সময় স্থায়ী ছিল। তাঁদের এ ধারণার ভিত্তি ছিল হৈম ও বরফ গলা পানির পরিমাণের উপর। তাঁরা মনে করেছিলেন, অবক্ষেপগুলোর পরিমাণ বেশি হলে সময় বেশি হবে, আর

অবক্ষেপগুলোর পরিমাণ কম হলে সময় কম হবে। রিস হিমযুগের অবক্ষেপগুলোর পরিমাণ উয়ার্ম হিমযুগের চেয়ে বেশি। তাই তাঁদের ধারণানুযায়ী, রিস হিমযুগের স্থিতিকাল উয়ার্ম হিমযুগের চেয়ে দীর্ঘ। একই কারণে তাঁরা মনে করতেন গাঞ্জ হিমযুগের স্থিতিকাল ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা হিমবিরতিগুলোরও স্থিতিকালের হিসাব করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, মিন্ডেল-রিস হিমবিরতি ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। মিন্ডেল ও গাঞ্জ হিমযুগের টেরাস দুটি উয়ার্ম ও রিস হিমযুগের টেরাস থেকে অনেক উঁচুতে ছিল। মিন্ডেল ও গাঞ্জ হিমযুগের অবক্ষেপগুলো ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত (weathered)। পেন্ক ও ব্রাকনারের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেকটি গরমকালের আপেক্ষিক স্থিতিকালের অনুপাত নিচে দেয়া হলো।

গাঞ্জ-মিন্ডেল	মিন্ডেল-রিস	রিস-উয়ার্ম	উয়ার্ম-পরবর্তী
৩	১২	৩	১

আমরা আগেই বলেছি, পেন্ক ও ব্রাকনারের আলপাইন মডেল সারাবিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁদের এ মডেলটি ছিল মরফোস্ট্র্যাটিগ্রাফিক্যাল (ভূরূপক স্তরতাত্ত্বিক)। সনাতন স্তরবিদ্যার (Stratigraphy) বৈশিষ্ট্য তাতে ছিল না। তাই ভূতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর চেয়ে ভৌগোলিক বিষয়বস্তু তাতে প্রাধান্য পেয়েছিল। চারটি খণ্ড খণ্ড টেরাস সংবলিত স্তরতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে স্তরবিদ্যার স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে নি।

পেন্ক ও ব্রাকনারের আলপাইন মডেলে প্লেইসটোসিন সময়ের চারবার হিমযুগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা সঠিক নয়। এই চারটি হিমযুগ প্লেইসটোসিন উপযুগের সামান্য একটি অংশ জুড়ে থাকতে পারে, তাই বলে সম্পূর্ণ প্লেইসটোসিন সময় ধরে নয়। সামুদ্রিক পলি নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, প্লেইসটোসিন সময়ে পৃথিবী ২২ বার ঠাণ্ডা ও গরম হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি হিমযুগ বা হিমবিরতিতেই স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ঠাণ্ডা ও গরমের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং পেন্ক ও ব্রাকনারের ঠাণ্ডা ও গরম কালের ধারণা সত্যিকারার্থে আধুনিককালে বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নেই। কিন্তু চক্রাকারে পৃথিবী ঠাণ্ডা ও গরম হবার তাদের এ যুগান্তকারী ধারণা তা কোয়াটারনারির নতুন দিক উন্মোচন করে। ভূতত্ত্ববিদরা কোয়াটারনারি নিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু পেন্ক ও ব্রাকনারের প্লেইসটোসিন উপযুগকে চার ভাঁজে শ্রেণীবিভাগ করবার যে ভুল ধারণা প্রবর্তন করেন তা সারা বিশ্বের ভূতত্ত্ববিদদের মনে শিকড় বিস্তার করে এবং বছরের পর বছর ধরে সে শিকড়ের শাখা-প্রশাখা গভীর থেকে গভীরতায় প্রবেশ করতে থাকে।

পেন্ক ও ব্রাকনারের আলপাইন মডেলের কিছু সংযোজন পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে এবার্ল (Eberl) দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, গাঞ্জের আগেও হিমযুগ ছিল। তিনি তার নাম দিলেন ডনাউ (Donou) হিমযুগ। প্রমাণ হিসেবে তিনি যেসব মোরেনের টেরাস তুলে ধরলেন সেগুলোর অবশ্য পেন্ক ও ব্রাকনারের মোরেন

টেরাসগুলোর সাথে কোনো সংযোগ (connection) ছিল না। এবার্লের মোরেনের টেরাস ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

সবশেষে আলপাইন মডেলে আরোও একটি সংযোজনের প্রস্তাব এলো। ১৯৫৩ সালে সায়েফার (Schaefer) ডনাউ হিমযুগের আগে আরো একটি হিমযুগের অস্তিত্ব দেখতে পেলেন। তিনি সে হিমযুগের নাম দিলেন বিবার (Biber) হিমযুগ। এবার্লের ডনাউ হিমযুগের মোরেনের টেরাসের মত বিবার হিমযুগের মোরেনের টেরাসগুলোও পেন্‌ক ও ব্রাকনারের মোরেনের টিলার সাথে কোনো যোগসূত্র ছিল না।

যাহোক, আলপাইন মডেল আশাপ্রদ ছিল না, বরং অনেকটা হতাশাব্যঞ্জক ছিল। এতদসত্ত্বেও উয়ার্ম, রিস, মিন্ডেল ও গাঞ্জের প্রতিধ্বনি সারা বিশ্বে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। পেন্‌ক ও ব্রাকনারের মোরেন টেরাস নিয়ে যে স্তরতত্ত্ব তা অবশ্যই সাধারণ স্তরতত্ত্বের নিয়মকানুন অনুসরণ করে নি। উয়ার্ম, রিস, মিন্ডেল ও গাঞ্জ বলে মোরেন টেরাসগুলোর নাম দেয়া যেতে পারে কিন্তু তাই বলে স্তরীয় এককের (Stratigraphic unit) নাম হতে পারে না। ভূরূপ স্তরতত্ত্ব বা মরফোস্ট্রাটিগ্রাফী (Morphostratigraphy) ও কালস্তরতত্ত্ব বা ক্রোনোস্ট্রাটিগ্রাফী (Chronostratigraphy) একই পরিভাষা নয়। পেন্‌ক ও ব্রাকনার ভূরূপ স্তরতত্ত্ব ও কালস্তরতত্ত্ব (মরফোস্ট্রাটিগ্রাফী ও ক্রোনোস্ট্রাটিগ্রাফীকে) একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেই যত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এ সকল ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও পেন্‌ক ও ব্রাকনারের বরফ যাত্রা (Ice advancement) ও তার প্রস্থানের (retreat) যে যুগান্তকারী ধারণা তা কোয়াটারনারির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে। ভূতত্ত্ববিদরা কোয়াটারনারিকে নতুন আঙ্গিকে ভাববার সুযোগ পেয়েছে আর বুঝতে পেরেছে যে, কোয়াটারনারির সময় পৃথিবী বার বার শীতল ও উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এ নতুন ধারণা প্রবর্তনের কৃতিত্ব অবশ্যই পেন্‌ক ও ব্রাকনারের।

(খ) উত্তর ইউরোপের মডেল (North European Model)

পেন্‌ক ও ব্রাকনারের (১৯০৯) আলপাইন মডেলের ধাঁচে অনেক দেশের ভূতত্ত্ববিদগণ কোয়াটারনারির অবক্ষেপগুলোর শ্রেণীবিভাগ শুরু করেন। উত্তর ইউরোপেও শুরু হলো কোয়াটারনারি অবক্ষেপের স্তরতত্ত্বের অবকাঠামো বিন্যাসের চর্চা। পেন্‌ক ও ব্রাকনারের হিমযুগ ও হিমবিরতির ধারণার আলোকে জার্মানিতে কোয়াটারনারি অবক্ষেপের যে শ্রেণীবিভাগ শুরু হয়েছিল তা মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার হৈমবাহিত অবক্ষেপের (Glacial deposit) বিভক্তিকরণ। আর এ অবক্ষেপগুলো উত্তর জার্মান সমভূমি জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এগুলো ছিল হিমবাহের শেষ মোরেন (চিত্র ১.৪)। এ মোরেনগুলোকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি ভাগ ছিল এক একটি বরফের কাল নির্দেশক। ১৯২৬ সালে কেইলাক (Keilack) ওয়ার্দে ছাড়া সবগুলো হিমক্রিয়ার (Glaciations) নামকরণ করেন। এ সকল হিমক্রিয়ার নাম দেয়া হয়েছিল সে এলাকায় প্রবাহিত বিভিন্ন নদীর নামানুসারে, যেমন, এলসটার (Elster), সায়ালে (Saale), ওয়ার্দে (Warthe) উইচসেল (Weichsel)

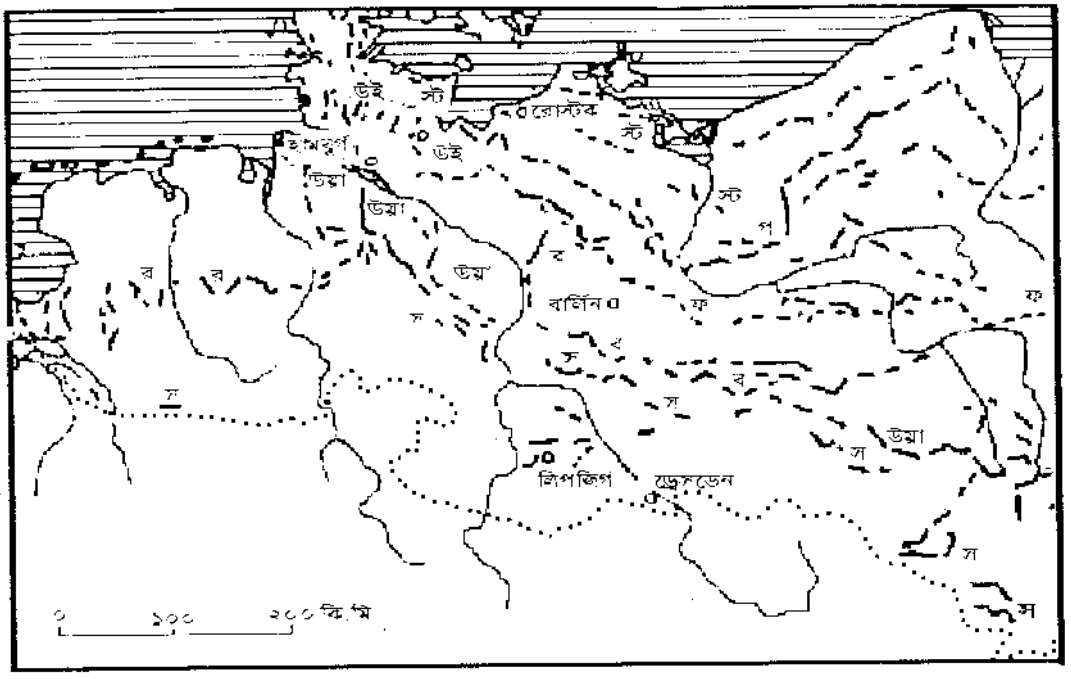

চিত্র ১.৪ : উত্তর জার্মানির শেষ মোরেন (ওল্ডস্টেডট, ১৯৬৭)।
স–সায়ালে ; র–রেহ্বার্গার ; উয়া–ওয়ার্দে ; ব–ব্রান্ডেনবার্গ ; ফ–ফ্রাঙ্কফুর্ট ; উই–উইসেল ; প–পমেরানিয়ান ; স্ট–স্টেটিং। ফোঁটা ফোঁটা রেখায় সর্বোচ্চ হিমক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

হিমক্রিয়া। ওয়ার্দে ও উইচসেল হিমক্রিয়ার শেষ মোরেনগুলো ছিল অবিকৃত, ঝকঝকে তকতকে এবং তাদের আসল আকারের কোনো পরিবর্তন ছিল না। পক্ষান্তরে, সায়ালে হিমক্রিয়ার শেষ মোরেনগুলোর গা কিছুটা নরম হয়ে গিয়েছিল, তাদের আসল আকৃতির পরিবর্তন হয়েছিল এবং অনেকটা ক্ষয় হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। আর এলসটার সময়ের শেষ মোরেনগুলোর গা এত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল যে তা প্রায় সম্পূর্ণই বিকৃত হয়েছিল এবং তাদের আসল চেহারা চেনাই যাচ্ছিল না। উত্তর ইউরোপের হিমযুগ ও হিমবিরতির একটি ক্ল্যাসিক্যাল মডেল নিম্নরূপ।

উইচসেল হিমক্রিয়া (Wiechselian Glaciation)	হিমযুগ
এমিয়ান (Eemian Interglacial)	হিমবিরতি
ওয়ার্দে হিমক্রিয়া (Warthe Glaciation)	হিমযুগ
ড্রেনথে (Drenthe)	হিমযুগ
হলসটেইন হিমবিরতি (Holstein Interglacial)	হিমবিরতি
এলসটার হিমক্রিয়া (Elster Glaciation)	হিমযুগ
ক্রোমেরিয়ান (Cromerian Interglacials)	হিমবিরতি

আলপাইন ও উত্তর ইউরোপের মডেল দুটি তুলনা করা যেতে পারে। এ মডেল দুটি প্রায় একই রকম এবং দুটি মডেলই তৈরি হয়েছে ভূরূপ স্তরবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে। যাহোক, উত্তর ইউরোপের মডেল আলপাইন মডেলের হুবহু প্রতিকৃতি ছিল না। সামান্য একটু ব্যতিক্রম ছিল। তাহলো এ মডেলের স্তরবিন্যাস করবার সময় গরমকালের সামুদ্রিক (marine) ও স্থলভাগের (continental) অবক্ষেপগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল এবং সেগুলোকে হিমকালের অবক্ষেপগুলোর উপরে বা নিচে প্রতিস্থাপিত করে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। নিম্নে উত্তর ইউরোপের ক্ল্যাসিক্যাল মডেলের প্রতিটি হিমক্রিয়ার একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া হলো।

এলসটার হিমক্রিয়া (Elster Glaciation)

এলসটার হিমক্রিয়ার হিমাবক্ষেপগুলো জার্মানির হামবুর্গ (Humburg) এলাকায় অত্যন্ত সুপরিচিত (চিত্র ১.৪)। হামবুর্গ এলাকার এলসটার হিমাবক্ষেপের স্তর প্রায় ৭০ মিটার পুরু। প্রায় সকল স্থানেই এ সময়ের অবক্ষেপগুলো মাটির গভীরে ঢাকা পড়ে আছে। এ অবক্ষেপগুলো পরবর্তী হিমক্রিয়া সায়ালের অবক্ষেপগুলো থেকে বাছাই করা মুশকিল। এলসটার ও সায়ালে হিমক্রিয়ার দুটি অবক্ষেপই প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত। তাই পার্থক্য নির্ণয় কঠিন ব্যাপার। থুরিঙ্গীয়া (Thuringis) ও ঊর্ধ্ব স্যাক্সনি (Upper Saxony) ছাড়া এ অবক্ষেপগুলো কোথাও মাটির উপরে দেখা যায় না বা অনাবৃত (exposed) নয়। স্তরতত্ত্ব

বা স্তরবিদ্যানুসারে এলসটার হিমাবক্ষেপগুলো ক্রোমার (Cromer) হিমবিরতির অবক্ষেপগুলোর চেয়ে নবীন। উত্তর-পশ্চিম জার্মানিতে লয়েনবার্গ কাদামাটি (Launburg clay) নামক একটি বালি-কাদা বা কাদামাটির নির্দেশক স্তর (marker bed) হিসেবে সুবিস্তৃত। এই লয়েনবার্গ কাদামাটি এলসটার হৈমবাহিত অবক্ষেপগুলোকে উপরাচ্ছাদিত করে রেখেছে। অনেকেই মনে করেন এই কাদামাটির স্তরটি এলসটার হিমযুগের অব্যবহিত পরেই বরফ গলা পানির তলানি হিসেবে পালিত হয়েছে।

নেদারল্যান্ড এ সময়ে হিমাবৃত ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এলসটার হিমযুগের সুনির্দিষ্ট কোনো হিমকর্দ (Glacial till) নেদারল্যান্ডে দেখা যায় না (অথবা আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে)। তবে এমন নিদর্শন আছে যে হিমাগ্রভাগ (ice front) নেদারল্যান্ড থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় পক্লে (Poklei, মৃৎপাত্র তৈরির কাদামাটি) নামক অবক্ষেপের কথা। এই পক্লে উত্তর সাগরের (সে সময়ে উত্তর সাগর শুকনো ছিল, কিন্তু সাগরতলে কোথাও কোথাও নিচু জায়গা ছিল যেটা অনেকটা সরোবর আকারে ছিল) সরোবরে প্রবাহিত নদীর অববাহিকায় পাললিত হয়েছিল। পক্লে নিয়ে আরোও সমস্যা আছে : তাহলো এই কাদামাটি যে সকল গভীর ও সংকীর্ণ বেসিনে (basin) পাললিত হয়েছিল সে বেসিনগুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। স্তরবিদ্যানুসারে এই কাদামাটি হলসটেইন হিমবিরতির আগের সময়ের অবক্ষেপ। কিন্তু অনেকেই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, নেদারল্যান্ডের পক্লে ও উত্তর পশ্চিম জার্মানির লয়েনবার্গ কাদামাটি একই সময়ের। এ থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ব ও পশ্চিম স্ক্যান্ডিনাভিয়া থেকে হিমক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নিম্ন স্যাক্সোনিতে স্ক্যান্ডিনাভিয়া থেকে আগত প্রচুর বিদেশীয় শিলা পাওয়া যায়।

রিচটার (Richter, ১৯৬১) বলেন, এলসটার হিমযুগে জার্মানিতে পাঁচবার বরফের বিস্তৃতি ঘটেছে। এ সময়কে আমরা শীতল হিমযুগ (Stadial) বলেছি। প্রতিটি শীতল হিমযুগ উষ্ণ হিমযুগ (Interstadial) দ্বারা আলাদা করে রেখেছে। এমন সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাসের জন্য অবশ্য হিমকর্দের শৈল বৈষম্য (Lithological contrast) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে।

হলস্টেইন হিমবিরতি (Holsteinian Interglacial)

এলসটার হিমযুগের শেষে জলভাগের বরফ গলতে থাকে। বরফ গলা পানি প্রবলবেগে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হতে থাকে। জার্মানিতে হলসটেইন হিমবিরতির অবক্ষেপগুলো এলসটার হিমযুগের অবক্ষেপগুলোকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। পক্ষান্তরে, হলসটেইন হিমবিরতির অবক্ষেপগুলো পরবর্তীকালের সায়ালে হিমযুগের অবক্ষেপ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে। ফলে কিছুটা বিকৃত হয়েছে। হলসটেইন যুগের সমুদ্রের সম্মুখগামিতা উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে জার্মানির দিকে এগুতে থাকে এবং সমসাময়িক কালের সমুদ্রতীর উত্তর নেদারল্যান্ডে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ছিল। মলাস্কা জীবাশ্ম থেকে পাওয়া পুরাপ্রতিবেশ সংস্থানুসারে বলা যায় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল এবং হলসটেইনের শীর্ষ

সময়ের তাপমাত্রা অনেকটা আজকের মতো। উদ্ভিদ স্তরক্রম (Vegetational succession) থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এলসটার হিমযুগের শেষে বার্চ (Birch), পাইন (Pine) এবং হিপোফায়ের (Hippophae) যে গাছপালা ছিল তা পরবর্তীতে বার্চ–পাইনে এসে দাঁড়ায়। এর পরে ধীরে ধীরে মিশ্র ওক (Oak) বনাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটে। হলসটেইন যুগের শেষে যখন আবহাওয়ার চরম অবনতি ঘটতে থাকে তখন আবিস (Abies) ও কার্পিনাস (Carpinus) গাছপালার আবির্ভাব ঘটে। হলসটেইন হিমবিরতির বৈশিষ্ট্য হলো, এ কালের প্রথমার্ধে পিছিয়া (Picea) ও শেষাংশে আবিস (Abies) উদ্ভিদ প্রজাতির বিস্তৃতি।

সায়ালে হিমক্রিয়া (Saale Glaciation)

সায়ালে সময়ের শেষ মোরেনগুলো জার্মানির প্রবাহিত নদীগুলোর মধ্যকার টেরাসসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সায়ালে হিমযুগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা ড্রেনথে (Drenthe) ও ওয়ার্দে (Warthe) (চিত্র ১.৫)। ড্রেনথে সময়ের শেষ মোরেনগুলোর গা নরম হয়ে গেছে, কিছুটা বিকৃতও বটে, তবুও চিনতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, ওয়ার্দে হিমযুগের

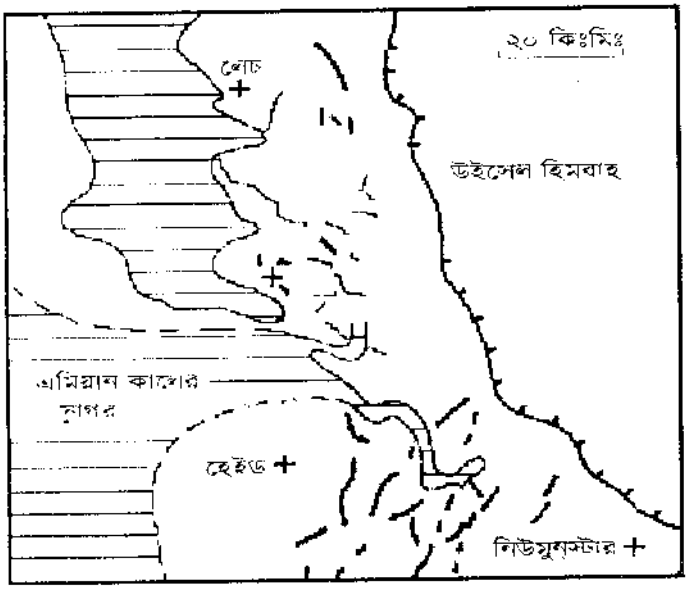

চিত্র ১.৫ : এমিয়ান হিমবিরতির অবক্ষেপের ফাটল দিয়ে অনাবৃত ওয়ার্দে হিমযুগের মোরেন (ওল্ডস্টেডট, ১৯৫৪)।

শেষ মোরেনগুলো মোটেই ক্ষয়প্রাপ্ত নয়, সেগুলো বেশ তাজা বা সতেজ। সায়লে হিমক্রিয়া অনেকটা মিশ্র প্রকৃতির (complex) ছিল। এ সময়ে বেশ কয়েকবার হিমচক্র (cold cycles) পরিলক্ষিত হয়, যেগুলোকে ইতঃপূর্বে আমরা শীতল হিমযুগ বলেছি।

জার্মানিতে এটা সবাই স্বীকার করেন যে, ড্রেনথে ওয়ার্দে হিমক্রিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ছোট আকারের উষ্ণ হিমযুগ ছিল তবে তাকে কোনোভাবেই হিমবিরতি বলা যায় না। ড্রেনথে ও ওয়ার্দে হিমযুগের মধ্যবর্তী এই উষ্ণ হিমযুগের অস্তিত্ব এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। ইতঃপূর্বে যে সকল অবক্ষেপ এই উষ্ণ হিমযুগের বলে ধারণা করা হয়েছিল এখন সেগুলো হলসটেইন বা পরবর্তী এমিয়ান হিমযুগের বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ড্রেনথে ও ওয়ার্দের মাঝখানে একটা পুরামৃত্তিকা (paleosol) দেখা যায়। হয়তো বা এই পুরামৃত্তিকাই সেই উষ্ণ হিমযুগের সাক্ষর বহন করে।

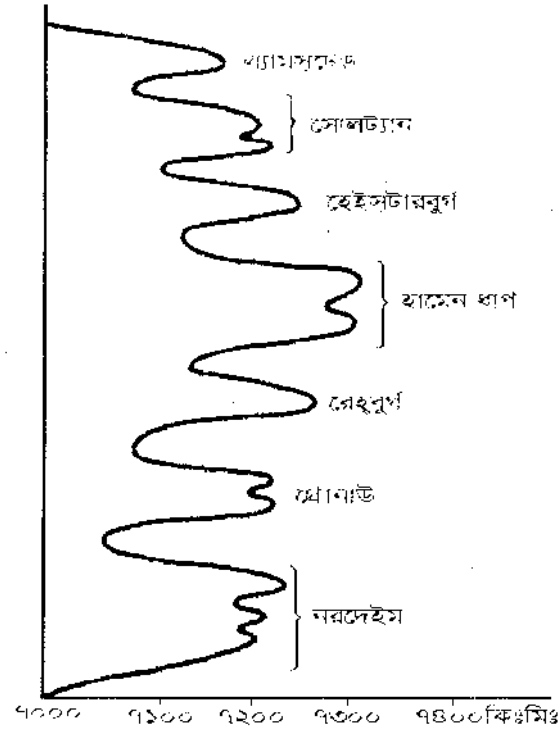

BABSDOC library Dhaka

চিত্র ১.৬ : ড্রেনথে হিমক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ। হামেন ধাপে সর্বোচ্চ হিমক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় (সূত্র : লুটিগ, ১৯৬৮)।

এ ছাড়াও সায়ালে হিমক্রিয়ার কয়েকবার হিমবাহের আগমন ও প্রত্যাগমনের চক্র (cycles of advancement and retreat) লক্ষণীয়। লুটিগের (Luttig) ধারণানুযায়ী ড্রেনথে হিমক্রিয়ার বেশ কয়েকটি শীতল হিমযুগ ও উষ্ণ হিমযুগের চক্র দেখা যায়। তার এ পরিকল্পনাটিও জটিলতা মুক্ত ছিল না। তাঁর এ পরিকল্পনাটি হিমকর্দের শৈল পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল ছিল ; আর যার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বিতর্কিত রেহবার্গ ধাপ (rehburg phase) বা চক্রের এবং তার শেষ মোরেনগুলোর। লুটিগের ধারণানুযায়ী সর্বোচ্চ হিমক্রিয়া (maximum glaciation) ছিল হামেনধাপে (Hameln phase) (চিত্র ১.৬)।

ওয়ার্দে হিমযুগের টাটকা ঢিবি আকারের (Hummock) শেষ মোরেনগুলোর বয়স নিয়ে ইতঃপূর্বে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এ মোরেনগুলোর সজীবতা দেখে এক সময়ে এগুলোর বয়স পুরাউইচসেল বলে মনে করা হতো (Zeuner, 1959)। আসলে এগুলো এমিয়ান হিমবিরতির আগের সময়ের। অর্থাৎ ওয়ার্দে হিমযুগের। ওয়ার্দে হিমক্রিয়াতেও শীতল ও উষ্ণ চক্র (cold and warm phases) দেখা যায়। যাহোক, ড্রেনথে ও ওয়ার্দে হিমক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারটি বিতর্কিতই রয়ে গেছে এবং সঠিক শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে মোরেন ও হিমকর্দের সূক্ষ্ম শৈল পার্থক্য নির্ণয়ের উপর।

এমিয়ান হিমবিরতি (Emian Interglacial)

এমিয়ান হিমবিরতিকে ভূতত্ত্ববিদগণ শেষ হিমবিরতি বলে থাকেন। সাকলেটন এবং ওপডাইকের (Shackleton and Opdyke) অক্সিজেন আইসোটোপ (Oxygen Isotope) রেখাচিত্রে এই হিম বিরতির স্থান ৫ই তে। তাই সায়ালে হিমক্রিয়া ও এমিয়ান হিমবিরতির মধ্যবর্তী সীমারেখার বয়স অনেকে ১,২৭,০০০ বছর বর্তমান থেকে আগে বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ ১২০ বা ১২৫ হাজার বছর আগেরও বলে থাকেন। নেদারল্যান্ডের একটি নদীর নামানুসারে এমিয়ান নামকরণ করা হয়েছে। এমিয়ান হিমবিরতির অবক্ষেপগুলো বেশ সতেজ এবং সায়ালে হিমক্রিয়ার অবক্ষেপের চেয়ে নবীন। এগুলো আবার উত্তর জার্মানিতে উইচসেল হিমক্রিয়ার অবক্ষেপ দ্বারা ঢাকা পড়েছে। এমিয়ান হিমবিরতির অবক্ষেপ ইউরোপের বিশাল এলাকা জুড়ে আছে। নেদারল্যান্ড থেকে জার্মানি হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এমিয়ান হিমবিরতির তাপমাত্রা এখনকার চেয়ে উষ্ণ ছিল। সেজন্যই হয়তো বা সমুদ্রপৃষ্ঠ এখনকার সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা উঁচুতে ছিল।

উইচসেল হিমক্রিয়া (Weichsel Glaciation)

উইচসেল হিমক্রিয়াকে সর্বশেষ হিমক্রিয়া বলা হয়। এ সময়ের অবক্ষেপগুলো বেশ টাটকা এবং শেষ মোরেনগুলো সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। এ সময়ের অবক্ষেপ ব্রানডেনবার্গ (Brandenburg), ফ্রানফুর্ট (Frunfurt) এবং পমেরান (Pomeran) এলাকায় বিস্তৃত।

উইচসেল হিমক্রিয়া থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সর্বোচ্চ শীতলের সময় সকল স্থানে একই সময়ে ছিল না। আর আরোও একটা দিক হলো আলপস পর্বতমালার হিমক্রিয়ার মতো উইচসেল হিমক্রিয়ার অবক্ষেপের স্তূপগুলোর পৃষ্ঠদেশে ঘন ঘন অবভূমি (depression) দেখা যায় এবং জার্মানিতে এমন অবভূমি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই অবভূমিগুলো লোয়েস দ্বারাও ঢাকা নয়। স্টেটিন মোরেনগুলোকে (চিত্র ১.৪) অনেকে শীতলের সর্বোচ্চ চূড়ার আগের সময়ের বলে মনে করেন। এগুলোর স্তরীয় অবস্থান যে সবকিছুর উপরে তা নিয়ে সন্দেহ নেই, তবে সে মোরেনগুলোর বয়স নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। ওলডস্টেডট (Woldstedt) এ মোরেনগুলোকে নব উইচসেল বলে মনে করেন। আবার অনেকেই পুরা উইচসেল বলেও ধারণা পোষণ করেন। পোল্যান্ডে স্টেটিন সঞ্চরণ (Stettin drift) মাউস্টার নিদর্শনের (Mouster artifact) সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর রাশিয়ার কালিনিন স্তূপটি (Kalinin drift) নব উইচসেল সময়ের বলে মনে করা হয়। উইচসেল হিমক্রিয়ার পূর্ণ তথ্য নেদারল্যান্ডে পাওয়া যায় যদিও নেদারল্যান্ডে হিমনিকটাঞ্চল বা হিমসান্নিগ্ধাঞ্চল (Periglacial area) ছিল।

উইচসেল সময়ে নেদারল্যান্ড ছিল লোয়েস এবং আবরণ বালির (cover sand) কেন্দ্রভূমি। এ সকল লোয়েস, লোম (Loam, সারমাটি) এবং আবরণ বালির মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো পুরামৃত্তিকা। হিমক্রিয়ার উষ্ণচক্রে এ সকল পুরামৃত্তিকার উৎপত্তি হয়েছিল। জাকভেইন (Zagwijn, 1975), উইমস্ট্রা (Wijmstra, ১৯৬৯) এবং ভ্যান ডার হামেন (Hummen, ১৯৭১) এর এ সময়ের পরাগতাত্ত্বিক যথেষ্ট গবেষণা আছে। তাদের মতে, এ সময়ে নেদারল্যান্ডে গাছপালা ছিল। তবে অতি শীতল হিমযুগে উদ্ভিদ ছিল না ; না থাকলেও অতি নগণ্য সংখ্যক। শীতল হিমযুগে নেদারল্যান্ডে **মেরু মরুভূমির** (Polar desert) মত অবস্থা বিরাজ করছিল। এ সময়ের অবক্ষেপে বরফ গোঁজ (Ice wedge) দেখা যায়। **আর মাটি চির তুষার ভূমি** (Permafrost) অবস্থায় ছিল।

বনাঞ্চলের ইতিবৃত্তসহ এমিয়ান হিমবিরতি, শেষ হিমক্রিয়া এবং হলোসিন সময়ের ভ্যান ডার হামেনের একটি চিত্র দেয়া হলো (চিত্র ১.৭)। এ চিত্রে উইচসেল হিমক্রিয়ার সকল উষ্ণ হিমযুগ চক্রের (Interstadial cycles) নাম দেয়া হয়েছে। এমার্সফুর্ট (Amersfoort), মায়ারশুফড (Moershoofd), হেনজেলো (Hengelo) এবং ডেনিক্যাম্প (Denekamp) উষ্ণ হিমযুগের নমুনাঞ্চলসমূহ (Type localities) নেদারল্যান্ডে অবস্থিত। পক্ষান্তরে ব্রারাপ (Brorup), বোলিং (Bolling) এবং অ্যাল্লেরোড (Allerod) উষ্ণ হিমযুগের নমুনাঞ্চল জার্মানিতে অবস্থিত। ডেনমার্কের নমুনাঞ্চলকে ভিত্তি করে নব উইচসেল হিমযুগকে তিনটি পরাগাঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা : (১) পুরা ড্রায়াস (Older dryas), (২) অ্যাল্লেরোড (Alleroid) এবং (৩) নব ড্রায়াস (Younger dryas)। এই শ্রেণীবিভাগগুলোকে আবার তেজস্ক্রিয় কার্বনের (radioactive carbon) দ্বারা বয়স নির্ণয় করা হয়েছে।

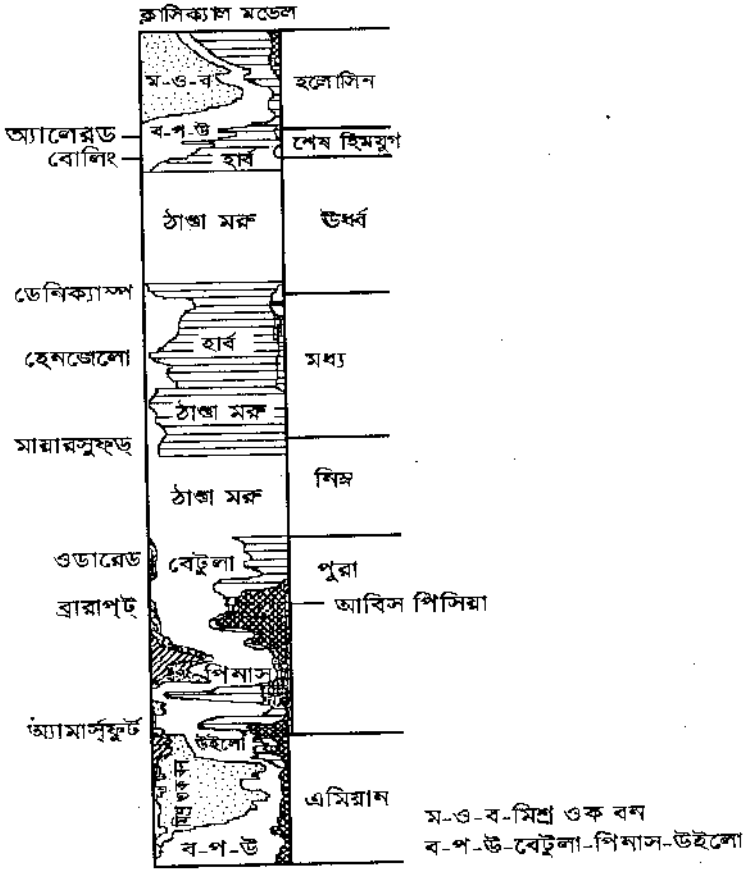

চিত্র ১.৭ : এমিয়ান হিমবিরতি, শেষ হিমযুগ ও হলোসিন সময়ের ইউরোপের বনাঞ্চলের ইতিবৃত্ত (সূত্র : ভ্যানডার হামেন ও অন্যান্য, ১৯৭১)।

পেন্‌ক ও ব্রাকনারের আলপস পর্বতমালা মডেলের মতো ক্ল্যাসিক্যাল উত্তর ইউরোপের মডেলও রচিত হয়েছে ভূরূপ স্তরতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। তাই স্বাভাবিক-ভাবেই মডেলটি ত্রুটিপূর্ণ। মডেলটি তৈরির সময় একটি অপ্রমাণিত ধারণাকে সামনে রাখা হয়েছিল, তাহলো : সবচেয়ে পুরাতন মোরেনগুলো সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত ; আর নবীনগুলো ক্রমানুসারে উত্তরদিকে বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। হয়তো বা কোনো কোনো শেষ মোরেনের শৈলশিরা (ridge) উপরস্থাপিতও থাকতে পারে। বর্তমানে এ নিয়ে বেশ মতবিরোধ রয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আগের অনুসন্ধান কাজের অন্তরায় ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ নির্ভরযোগ্য উপাত্তের স্বল্পতা। বিশেষত গভীরতার অবক্ষেপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। যেমন উত্তর জার্মানিতে কোয়াটারনারি অবক্ষেপের ঘনত্ব প্রায় ৫০০ মিটার। তাই প্রারম্ভিক শ্রেণীবিভাগটি তৈরি করতে ভূপৃষ্ঠের উপর অনাবৃত অবক্ষেপগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে সন্ধানী কূপের উপাত্ত (Bore hole data) মডেলটিকে আরো জটিল করে তুলেছে। যেমন এমিয়ান হিমবিরতিতে উত্তর জার্মানিতে দুটি সমুদ্রের সম্মুখগামিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি সমুদ্রের সম্মুখগামিতা ওয়ার্দে হিমক্রিয়ার আগের এবং অন্যটি পরের সময়ের। এ থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হলো : এমিয়ান হিমবিরতির অবক্ষেপ যেগুলো ড্রেনথের (সায়ালের) শেষ মোরেনের কেটল খাদে আছে, আর যেগুলো ওয়ার্দেও শেষ মোরেনের কেটল খাদে আছে এই দুইটি শ্রেণীর অবক্ষেপগুলো একই বয়সের নয়। এ ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ড্রেনথে ও ওয়ার্দে হিমক্রিয়া দুটির মধ্যবর্তী যে উষ্ণ হিমযুগ (Interstadial in glacial time) তাকে হিমবিরতির পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এখন অনেকেই এ ধারণা পোষণ করেন।

একইভাবে হলস্টেইন সময়েও দুটি হিমবিরতির কথা জানা যায়। নবীনটিকে ওয়াকেন (Wacken) হিমবিরতির আর পুরানোটিকে বলে হকসনিয়ান (Hoxnian) হিমবিরতি। এ দুটি হিমবিরতির মাঝখানের শীতল সময়কে মেলবেক বা ফাহ্নে (Mehlbeck or Fuhne) হিমযুগ বলা হয়। পরাগ বিশ্লেষণমূলক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, দুটি হিমবিরতিতে যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল। দুটিতেই আজোলা ফিলিকুলোইডেস (Filiculoides) দেখা যায় ; তবে ওয়াকেন হিমবিরতিতে আবিস (Abies) দেখা যায় না। যাহোক, ভূরূপ স্তরতত্ত্বের উপর নির্ভর করে প্রারম্ভিক যাত্রা করলেও সময়ের সাথে সাথে মডেলটির আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

(গ) উত্তর সাগর অববাহিকায় ব্যবহৃত কালস্তরতত্ত্ব (Used Chronostratigraphy of North Sea Basin)

উত্তর সাগর অববাহিকায় ব্যবহৃত কালস্তরতত্ত্ব বিন্যস্ত হয়েছে উত্তর ইউরোপীয় মডেলের মতোই। ক্ল্যাসিক্যাল মডেলটিকে নতুন নতুন উপাত্ত দ্বারা বহুলাংশে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। উত্তর সাগর অববাহিকার কালস্তরতত্ত্বে ক্ল্যাসিক্যাল উত্তর ইউরোপীয় মডেলের অনেক স্তরীয় এককের নাম ব্যবহৃত হয়েছে। আবার নতুন নতুন সংযোজনও হয়েছে।

উত্তর ইউরোপের ক্ল্যাসিক্যাল মডেলটি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে এখন কালস্তর তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কালস্তরীয় তালিকায় (Chronostratigraphic table) প্লেইসটোসিন শ্রেণীকে (Pleistocene series) মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : নিম্ন, মধ্য ও উর্ধ্ব। নিম্ন প্লেইসটোসিন শ্রেণীকে আবার মোট ৫টি সোপানে (stage) বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সোপানই এক একটি হিমযুগ বা হিমবিরতি নির্দেশক। সর্বনিম্ন সোপানকে

শ্রেণী	অনু শ্রেণী	সোপান	বয়স মিলিয়ন বছর		অনুসোপান / সভ্য	জলবায়ু	জলবায়ু	পরাগ / জীবাশ্ম
প্লেইসটোসিন	ঊর্ধ্ব	উইচ্‌সেলিয়ান (হিমক্রিয়া)		ঊর্ধ্ব	নবীন ড্রায়াস	ঠাণ্ডা	হিমক্রিয়া	ওকটোপাটালা
					অ্যাল্লেরড	উষ্ণ		
					পুরাড্রায়াস	ঠাণ্ডা		
					বোলিং	উষ্ণ		
						ঠাণ্ডা		
			০.০১৩	মধ্য	ডেনিক্যাম্প	উষ্ণ		
						ঠাণ্ডা		
					হেঞ্জেলো	উষ্ণ		
						ঠাণ্ডা		
					মায়ারশুপ্‌ট	উষ্ণ		
						ঠাণ্ডা		
			০.০৫	নিম্ন	ওডারেট	উষ্ণ		
						ঠাণ্ডা		
					ব্রারাপ্‌ট	উষ্ণ		
						ঠাণ্ডা		
					অ্যামারসফুর্ট	উষ্ণ		
						ঠাণ্ডা		
		এমিয়ান	০.০৭৩				হিমবিরতি	কর্বিকুলা ফ্লুমিনালিস
	মধ্য	(ওয়ার্দে) সায়ালিয়ান (ড্রেন্‌থে)	০.১২৭	ঊর্ধ্ব / মধ্য / নিম্ন	ছজিভেন ও বেক্তেগা এ দুটি উষ্ণ হিমক্রিয়া		হিমক্রিয়া	হিমযুগে পিনাস, বেতুলা, আরটিমিসিয়া, আবিস, করিলাস, ট্যাক্সাস, কার্পিনাস ইত্যাদি গাছপালা দেখা যায়। পক্ষান্তরে হিমবিরতিতে সুগা, টেরোক্যারিয়া, ক্যারিয়া, অস্ট্রিয়া, উকোমিয়া, সেল্টিস, ফেলোড্রেনড্রোন, পার্থেনোসিসাস ইত্যাদি গাছপালা দেখা যায়।
		হল্‌স্টেরিয়ান			ওয়াকেন	উষ্ণ	হিমবিরতি	
					মেলবেক	ঠাণ্ডা		
					হুকসনিয়ান	উষ্ণ		
		এল্‌স্টেরিয়ান					হিমক্রিয়া	
		ক্রোমেরিয়ান			নুজবারগাম	উষ্ণ	হিমবিরতি	
					হিমক্রিয়া-গ	ঠাণ্ডা		
					রোসমালেন	উষ্ণ		
					হিমক্রিয়া-খ	ঠাণ্ডা		
					ওয়েস্টার্‌ হোভেন	উষ্ণ		
					হিমক্রিয়া-ক	ঠাণ্ডা		
					ওয়াজেনবার্গ	উষ্ণ		
	নিম্ন	মেনাপিয়ান	০.৭৩				হিমক্রিয়া	পিনাস ও বেতুলা
		ওয়ালিয়ান	০.৯		টার্নহাউট কাদা		হিমবিরতি	আজোলা ফিলিকুলোইডেস
		এবুরোনিয়ান	১.২		বিয়ার্স বালি		হিমক্রিয়া	পিনাস ও বেতুলা
		টিগ্‌লিয়ান	১.৬		রাইকোভরসেল কাদা		হিমবিরতি	আজোলা ট্যাজিলিয়েনসিস, সুগা, কারিয়া, অস্ট্রিয়া, সেল্টিস,
		প্রিটিগলিয়ান	১.৯		আরেনডঙ্ক লিগনাইট সজ্জা হল প্লায়ো-প্লেইসটোসিন সীমারেখা		হিমক্রিয়া	পিনাস ও বেতুলা
প্লায়োসিন		রুভেরিয়ান	২.৫					

সারণি ১.১ : উত্তর সাগর অববাহিকায় ব্যবহৃত কালস্তরতত্ত্ব।

(সূত্র : ইফাক, ১৯৮৬)।
International Fundamental Applied Quaternary Geology Department, Free University of Brussels, Belgium.

প্রিটিগলিয়ান সোপান বলা হয়। এ সোপান হিমযুগ বলে পরিচিত। এরপরে টিগলিয়ান সোপান (Tiglian Stage)। টিগলিয়ান হিমবিরতির পরে আসে এবুরোনিয়ান হিমযুগের সোপান (Eburonian glacial Stage)। এ হিমযুগের পরে ওয়ালিয়ান হিমবিরতির সোপান (Waalian interglacial Stage)। নিম্ন প্লেইসটোসিন শ্রেণীর সর্ব ঊর্ধ্ব সোপানটি হলো মেনাপিয়ান হিমযুগের সোপান (Menapian glacial Stage)।

মধ্য ও ঊর্ধ্ব প্লেইসটোসিন শ্রেণীর সোপানগুলো সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তাই এখানে শুধু নিম্ন প্লেইসটোসিন শ্রেণীর সোপানগুলো নিয়েই আলোচনা করবো। কালস্তরীয় এ সোপানগুলো হল্যান্ড ও বেলজিয়াম বহুল প্রচারিত। এখানে হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের আলোকে নিম্ন প্লেইসটোসিনের সোপানগুলো আলোচনা করা হয়েছে (সারণি ১.১)।

কোয়াটারনারির হিমযুগে হল্যান্ড ও বেলজিয়াম হিমাবৃত ছিল না। হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের একটি বিরাট অংশ হিমযুগে তুষার ভূমি ছিল। মাটির ভিতরে যে পানি তা ঠাণ্ডায় জমে এরূপ তুষার ভূমির উৎপত্তি হয়। এ সময়ে সমুদ্র থেকে আসতো প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ। হিমযুগে সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নেমে যাওয়ায় বেলজিয়াম ও হল্যান্ড সংলগ্ন উত্তর সাগরের বিরাট অংশ শুকনো ছিল। হিমযুগের এ সময়ে শুকনো সমুদ্রাংশ হতে প্রবল বায়ুপ্রবাহে রাশি রাশি বালুকণা উঠে আসতো স্থলভাগের দিকে। মাটি জমে চির তুষার ভূমি আকারে থাকায় এ সকল বালুকণা বায়ুতাড়িত হয়ে স্থলভাগের অনেক গভীরে চলে যায়। চির তুষার ভূমির উপর এমন বালির ঝড়কে অনেকটা এখনকার উষ্ণ মরুভূমির বালির ঝড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সে কালের ঝড় সংবলিত চির তুষার এলাকাকে **মেরু মরুভূমি** (Polar desert) বলে। বেলজিয়ামের এমন বায়ুবাহিত অবক্ষেপের অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা : (১) আবরণ বালি অঞ্চল, (২) লোমাঞ্চল এবং (৩) লোয়েসাঞ্চল।

এ সকল চির তুষার ভূমির মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। এ সকল ফাটলের অধিকাংশই ছিল বহুভুজী। পরবর্তীতে এ সকল ফাটল বায়ুবাহিত বালিকণা দ্বারা ভর্তি হয়। এ সকল ফাটলের প্রস্থচ্ছেদকে বরফ **গোঁজ বা তুষার গোঁজ** বলে।

প্লায়োসিন উপযুগের শেষ দিকেই পৃথিবী শীতল হতে থাকে। প্লায়োসিন উপযুগের সর্বশেষ অবক্ষেপগুলোকে নেদারল্যান্ডে **রুভার কাদার অবক্ষেপ** (Reuver clay deposit) বলে। রুভার কাদা মাটির উপরেই শুরু হয়েছে কোয়াটারনারি। হল্যান্ড বেলজিয়ামে কালস্তরের এ ভাগকে প্রিটিগলিয়ান (Praetiglian or Pretiglian) বলা হয়। বস্তুত রুভার-প্রিটিগলিয়ানের এ সীমারেখাই (Boundary) হলো **প্লায়ো-প্লেইসটোসিন সীমারেখা**। এই সীমারেখাটি **এলফিডিয়াম ওরিগোনেনস** (Elphidium Oregonense) নামক **ফোরামিনিফেরার** (Foraminifera) সংকীর্ণ জৈবিক অঞ্চলের সাথে মিলে যায়। বেলজিয়ামে **প্লায়ো-প্লেইসটোসিন সীমারেখা** (Plio-Pleistocene Boundary) রয়েছে **মোল বালিসংঘে** (Mol sand Member)। মোল বালিসংঘে **আরেনডঙ্ক লিগনাইট সভ্য** (Arendonk lignite

member) বলে একটি লিগনাইটের স্তর আছে। এই লিগনাইটের স্তরটি মোল বালিসংঘের অভ্যন্তরের উর্ধ্ব ও নিম্ন **কিজেলওলাইট সভ্যের** (Kiesseloolite Member) মাঝখানে অবস্থিত। আরেনডঙ্ক লিগনাইট সভ্যের পরাগ তাত্ত্বিক গবেষণা (পাপ ও ভ্যানহুরনে, ১৯৭৬) এবং উর্ধ্ব কিজেলওলাইট সভ্যের হিমজনিত উপসর্গ এটাই নির্দেশ করে যে, আরেনডঙ্ক লিগনাইট স্তরের উপরের তলই হলো প্লায়োপ্লেইসটোসিন সীমারেখা। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, তা হলো রুভার কাদামাটির মধ্যে পরাগ শ্রেণীর কিছু কিছু প্রজাতি যেমন, **সেকুইয়া** (Sequoia), **ট্যাক্সোডিয়াম** (Taxodium), **সিয়াডোপিটিস** (Sciadopitys), **নীসা** (Nyssa) ইত্যাদি পাওয়া যায়, যেগুলো আবার উপরিস্থিত টেজিলেন কাদামাটিতে (Tegelen clay) পাওয়া যায় না। টেজিলেন কাদামাটিতে **সুগা** (Tsuga), **ক্যারিয়া** (Carya), **টেরোক্যারিয়া** (Pterocarya), **সেল্টিস** (Celtis), **উকোমিয়া** (Eucommia) এবং অন্যান্য কিছু **বিদেশী উদ্ভিদ** (Exotic) যেগুলো সচরাচর টারশিয়ারি দেখা যায় সেগুলোই পাওয়া যায়। এ সকল উদ্ভিদ উষ্ণ জলবায়ু নির্দেশ করে। কিন্তু শীতল জলবায়ু নির্দেশক ট্যাক্সোডিয়াম, সিয়াডোপিটিস ও নীসা টেজিলেন কাদামাটিতে আর দেখা যায় না। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। পরাগ বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হিমযুগের আগমনই হলো উদ্ভিদ জগতের চরম পরিবর্তনের মূল কারণ। অর্থাৎ, হল্যান্ডে রুভার কাদার উপরের হিমযুগ যাকে আমরা উত্তর সাগর অববাহিকার কালস্তরীয় সোপান হিসেবে প্রিটিগলিয়ান বলেছি। এর পরে আসে উষ্ণ চক্রের সোপান টিগলিয়ান। টেজিলেন কাদা এ সোপানেরই অবক্ষেপ।

এ সময়ে বেশ কয়েকবার সমুদ্রের সম্মুখগামিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম সমুদ্রের সম্মুখগামিতার অবক্ষেপগুলোকে বেলজিয়ামের ক্যামপাইন এলাকাতে (Campine area) দেখা যায়। পাপ এবং ভ্যানহুরনে (১৯৭৬) এই এলাকাকে ক্যামপাইন কাদামাটির অঞ্চল বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমুদ্রের সম্মুখগামিতায় উদ্ভূত **মার্কসেম বালির স্তর** (Marksem sand) উত্তর দিকে নত হয়ে গিয়েছে। এর উপরে রয়েছে স্থলীয় প্রতিবেশে পাললিত মোল বালি। আরোও উত্তরে মোল বালির উপরে রয়েছে **ক্যামপাইন কাদা ও বালির সংঘ** (Campine clay and sand Formation, পাপ ও ভ্যানহুরনে, ১৯৭৬)। পাপ ও ভ্যানহুরনে (১৯৭৬) এ সংঘকে মোট তিনটি সভ্যে বিভক্ত করেছেন এবং প্রতিটি সভ্যকে নিম্ন প্লেইসটোসিন উপযুগের এক একটি কালস্তরীয় সোপানের সাথে পারম্পর্য স্থাপন করেছেন। ক্যামপাইন সংঘের সর্বনিম্ন সভ্যকে **রাইকোভরসেল কাদা** (Rijkevorsel Clay) বলে। এই কাদাই হলো প্লেইসটোসিন সময়ের প্রথম সমুদ্রের সম্মুখগামিতায় পাললিত কাদা এবং এ কাদার পুরা প্রতিবেশকে **জোয়ার-ভাটার সোপান** বলে মনে করা হয়। এ অবক্ষেপের **নির্দেশক জীবাশ্ম** (Guide fossil) হলো আজোলো ট্যাজিলিয়েনসিস (Azolla Tegeliensis)। রাইকোভরসেল কাদার মধ্যে চারটি হিউমিক স্তর দেখা যায়। প্রতিটি হিউমিক স্তর হিমবিরতির শীতল চক্রকে নির্দেশ করে (মনসুর, ১৯৯২)। এই হিউমিক স্তরের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে টিগলিয়ান সোপানকে মোট আটটি উষ্ণ ও ঠাণ্ডা চক্রে বিভক্ত করা হয়েছে (মনসুর, ১৯৮৬)।

ক্যামপাইন সংঘের মধ্য সভ্যকে **বিয়ার্স বালি সভ্য** (Beerse sand Memeber) বলে। স্থল প্রতিবেশে এ সভ্যের পললক্ষেপণ হয়েছে। এ সভ্যকে উত্তর সাগর অববাহিকার কালস্তরীয় সোপান এবুরোনিয়ানের সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে। এ সভ্যের স্তরগুলোর অধিকাংশই বায়ুবাহিত অবক্ষেপ। হিমযুগের অবক্ষেপ বলে এর মধ্যে বরফগোঁজ, তুষারগোঁজ, **ঠাণ্ডা উপদ্রুত স্তর** (Cryoturbated layer) ইত্যাদি দেখা যায়।

এর উপরে রয়েছে সমুদ্রের সম্মুখগামিতার জোয়ার-ভাটা সোপানের অবক্ষেপ **টার্নহাউট কাদা সভ্য** (Turnhout clay Member)। নীলাভ এ কাদায় জোয়ার-ভাটা সোপানের নিদর্শনসূচক অনেক **পাললিক গঠন** (Sedimentary Structure) রয়েছে। এ সভ্যকে কালস্তরীয় স্তম্ভের ওয়ালিযান সোপানের সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে।

সোপান	নামকারক	নমুনাস্থান/এলাকা এবং ভিত্তির উৎস
উইসকনসিন (Wisconsin)	চ্যাম্বারলেন, ১৮৮৪, ১৮৯৫ (Chamberlain, 1884, 1895)	শেষ মোরেনের প্রারম্ভিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে । উইসকনসিন রাষ্ট্র । (হিমযুগ)
স্যানগ্যামন (Sangamon)	লেভারেট, ১৮৯৮ (Leverett, 1898)	ইলিনোইসের স্যানগামন এলাকার উইসকনসিন হিমযুগের লোয়েস ও ইলিনোইস হিমযুগের টিলের মধ্যবর্তী স্যানগামন পুরামৃত্তিকার উপর ভিত্তি করে । (হিমবিরতি)
ইলিনোইয়ান (Illinoian)	লেভারেট, ১৮৯৬ (Leverett, 1896)	ইলিনোইস রাষ্ট্র । ইয়ারমাউথ ও স্যানগামন পুরামৃত্তিকাদ্বয়ের মাঝখানের সকল অবক্ষেপ । (হিমযুগ)
ইয়ারমাউথ (Yarmouth)	লেভারেট, ১৮৯৮ (Leverett, 1898)	ক্যানসাস ও ইলিনোইস হিমযুগের অবক্ষেপের মধ্যবর্তী পুরামৃত্তিকা । ইয়ারমাউথ, ইওয়া । (হিমবিরতি)
ক্যানস্যান Kansan	চ্যাম্বারলেন, ১৮৮৪ (Chamberlain, 1884)	আফতন জংশনের উপরের টিল । ইওয়ার ইউনিয়ন এলাকা । (হিমযুগ)
আফটোনিয়ান Aftonian	চ্যাম্বারলেন, ১৮৯৪ (Chamberlain, 1894)	আফতোনিয়ার পুরামৃত্তিকা । প্রথম শ্রেণী বিভাগটি আফতোন জংশনের নুড়িপাথরের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল । ইওয়ার ইউনিয়ন এলাকা । (হিমবিরতি)
নেব্রাস্ক্যান (NebraskOn)	শিমেক, ১৯০৯ (Shimek, 1909)	আফতোন জংশনের নিচের টিলের উপর ভিত্তি করে ইওয়ার ইউনিয়ন এলাকা । (হিমযুগ)

সারণি ১.২ : উত্তর আমেরিকার হিমযুগ ও হিমবিরতির ধারাবাহিকতা। (সূত্র : বোয়েন, ১৯৭৮)।

বেলজিয়ামে নিম্ন প্লেইস্টোসিনের উপরের শেষ **সোপান মেনাপিয়ান** (Menapian Stage)। হিমযুগ বায়ুবাহিত এ অবক্ষেপের ঘনত্ব খুব কম। শুধু বায়ুবাহিত বালুকণার

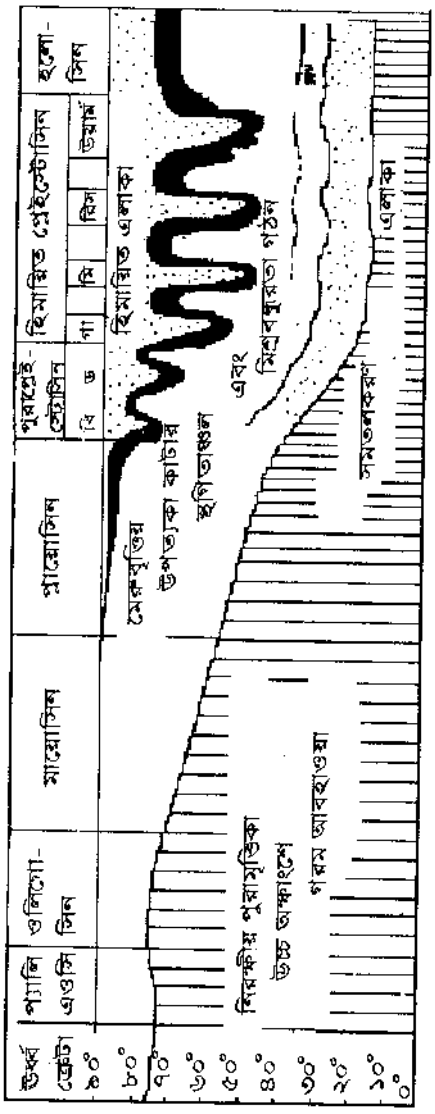

চিত্র ১.৮ : বুডেলের জলবায়ু রেখাচিত্র। ইষৎ পরিবর্তিত (সূত্র : বুডেল, ১৯৪৯)।

একটি পাতলা স্তর দেখা যায়। এ স্তরের উপরেই রয়েছে উষ্ণকালের বিখ্যাত ক্রোমার সোপান (Cromerian Stage) যখন ইউরোপ গাছপালায়, ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এমন বনাঞ্চলের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। এ অধ্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্ল্যাসিক্যাল মডেলের বিস্তারিত আলোচনা না করে উত্তর আমেরিকার মডেলের একটি সারণি সন্নিবেশিত হলো (সারণি ১.২)।

বুডেলের জলবায়ুর রেখাচিত্র (Budel's Climatic Curve)

বুডেলের জলবায়ুর রেখাচিত্র পেন্‌ক ও ব্রাকনারের হিমক্রিয়া ও হিমবিরতির আলোকে অঙ্কিত হয়েছে (চিত্র ১.৮)। কোয়াটারনারি ভূতাত্ত্বিক সময়ে নিরক্ষরেখার দিকে হিমক্রিয়ার আগমন ও প্রত্যাগমনের ঘটনাবলী বুডেল চমৎকারভাবে চিত্রে পরিবেশন করেছেন। উয়ার্ম, রিস, মিন্ডেল ও গাঞ্জ হিমযুগে হিমাঞ্চলের বিস্তৃতি এবং হিমবিরতিতে **উপত্যকা কাটার স্থগিতাঞ্চলের** (Zone of retarded valley cutting) চিত্রটি সময়ের সাথে দেখানো হয়েছে। হিমাঞ্চলের সামনেই থাকে **অপরিমিত উপত্যকা কাটাঞ্চল** (Zone of extensive valley cutting)।

জলবায়ুর রেখাচিত্র এবং ঠাণ্ডা-গরমের চক্রসমূহ (Climatic Curves and Cold and Warm Cycles)

পৃথিবীর তাপমাত্রা সকল ভূতাত্ত্বিক সময়ে একই রকম ছিল না। কোনো কোনো সময়ে পৃথিবী গরম হয়ে উঠেছে এবং কোনো কোনো সময়ে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থান ঢেকে গেছে বরফের বিশাল স্তূপে। আমরা পুরাজীবীয় অধিযুগের হিমাগমনের কথা জানি। টারশিয়ারি যুগের শেষে প্লায়োসিন উপযুগের শেষের দিকেই পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকে। মেরু অঞ্চল বরফে ঢেকে যায়। ঠাণ্ডার তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বরফের বিস্তৃতি ঘটে এবং বরফের স্তর নিরক্ষরেখার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আবার পৃথিবী উষ্ণ হতে থাকলে হিমবাহ মেরু অঞ্চলের দিকে সরে যায়।

কোয়াটারনারি সময়ে সর্বদাই মেরু অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। কোয়াটারনারি সময়ে পৃথিবীর তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে বরফ বিস্তৃতির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। ভূতাত্ত্বিক সময়ে পৃথিবীর দুই মেরুতে বরফের আগমন ও প্রত্যাগমন চক্রাকারে ঘটেছে। কোয়াটারনারি ছাড়াও ভূতাত্ত্বিক অতীতে আরো কয়েকবার হিমযুগের আগমন ঘটেছে। প্রাকক্যামব্রিয়ান মহাযুগে ও পারমিয়ান অধিযুগেও হিমযুগের আগমন ঘটে। এরূপ অতি বড় চক্র (mega cycle) ভূতাত্ত্বিক সময়ে মাত্র কয়েকবারই ঘটেছে। এমন দুটি বড় বড় চক্রের মধ্যবর্তী কাল হয়তো কয়েক শত মিলিয়ন বছর হতে পারে।

. সূর্যের বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তাপমাত্রার হ্রাসের এমন শেষ চক্রটি ঘটলো কোয়াটারনারি সময়ে। পৃথিবীর তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির এ ধরনের চক্রের কথা অনেক আগেই বলে গেছেন **মিলানকোভিচ** (Milankovitch)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার তাঁকে বন্দী করে জেলের ভিতরে রাখেন। মিলান কোভিচের এই জীবনে উদ্ভাবিত হলো পৃথিবীর তাপমাত্রা **হ্রাসবৃদ্ধির রেখাচিত্র** (curve)। তিনি ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ। গাণিতিক সূত্রেই তিনি বের করলেন পৃথিবীর তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির এই অমোঘ নিয়মটি। তিনি প্রমাণসহ দেখলেন যে, চক্রাকারে পৃথিবীর তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। অনেকটা সিনুসইডাল (sinusoidal) রেখাচিত্রের মতো। মিলানকোভিচের এই জলবায়ুর রেখাচিত্র ওপডাইক ও স্যাকলেটনের অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্রের (oxygen isotope curve of Opdyke and Shakleton) সাথে যথেষ্ট মিল আছে। তাই কোয়াটারনারি যুগে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং বরফের আগমন মিলানকোভিচের জলবায়ু পরিবর্তন চক্রেরই অংশবিশেষ (চিত্র ১.৯)।

এ কোয়াটারনারিতে তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কোয়াটারনারির জলবায়ু পরিবর্তনে বড় চক্রগুলিকে **দীর্ঘমেয়াদি চক্র** (Long term cycle) বলা হয়। পাপ ও মারিওলাকাসের (Paepe and Mariolakos) এর মতে এমন দীর্ঘমেয়াদি চক্র ৬০০,০০০ (ছয়শত হাজার) বছর পরে আসে। এই ৬০০,০০০ বছর চক্রকে যথাক্রমে ২৫০,০০০ বছরের চক্রে ভাগ করা হয়েছে। এই ঠাণ্ডা ও উষ্ণ চক্রের প্রতিটিতে আবার

চিত্র ১.৯ : মিলানকোভিচের জলবায়ু পরিবর্তনের রেখাচিত্র।

সারকথা হলো : ক্যালাব্রিয়ানের বিশেষত্ব সূচক জীবাশ্মের (index fossil) উপস্থিতি দিয়ে নয় ; বরং বিশেষ বিশেষ কিছু সংখ্যক জীবাশ্মের উপস্থিতিই মূল বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে ফোরামিনিফেরার গবেষণায় কিছু **ঠাণ্ডা প্রজাতির** (Cold form) আগমন নির্দেশ করে, যেগুলোর মধ্যে **হিয়ালিনা বালথিকা** (Hyalina balthica) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিয়ালিনা বালথিকা গভীর জলের প্রজাতি (তলদেশী প্রাণী)। পক্ষান্তরে, বালুভোজী মলাস্কা সাইপ্রিনা ইসলানন্ডিকা অগভীর জলে বাস করে। তাই অবক্ষেপের মধ্যে এ দুই প্রজাতি একসাথে দেখা যায় না। অধিকন্তু, সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি বাস করে এমন ফোরামিনিফেরা (অতলদেশী প্রাণী, Planktonic foraminifera) গ্লোবোরোতালিয়া ট্রানকাতুলিনইডেস (Globorotalia Truncatulinoides) যেগুলো নিরক্ষীয় অঞ্চলের গভীর সমুদ্রে কূপ খননের মাধ্যমে পাওয়া গেছে সেগুলো ব্লোর (Blow's) ২২নং জৈবিক অঞ্চলের সূচক জীবাশ্ম। এই গ্লোবোরোতালিয়া ট্রানকাতুলিনইডেস ক্যালাব্রিয়ার অবক্ষেপ পাওয়া যায়। তাই অনেকে মনে করেন, ২১ ও ২২ নং জৈবিক অঞ্চলের সীমারেখাকে প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন সীমারেখা ধরা হয়। ১৯৪৮ সনে আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কনগ্রেসের ১৮তম অধিবেশন লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে ক্যালাব্রিয়া সোপানের শুরুকে প্লায়ো-প্লেইসটোসিন সীমারেখা বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শেলীর মতে (১৯৬১) ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ক্যালাব্রিয়ার **সান্তা মারিয়া ডি ক্যাটানজারো** (Santa maria di Catanzaro) নামক স্থানের প্রস্থচ্ছেদকে **নমুনাস্তর** (Type section) হিসেবে ধরা যেতে পারে। সুতরাং ক্যালাব্রিয়া সোপান সমুদ্রোদ্ভূত।

লন্ডনে ১৯৪৮ সনে, আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কনগ্রেসের ১৮তম অধিবেশনে ক্যালাব্রিয়া সোপানের গোরাকে প্লায়ো-প্লেইসটোসিন সীমারেখা স্বীকৃতি দান করেন।

ভিলাফ্রাঙ্কার জীবাশ্মের সমাবেশসমূহ (The Villafranchian Faunal Assemblages)

ভিলাফ্রাঙ্কার স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের খ্যাতি সারা বিশ্ব জুড়ে। আর এই স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের হাড়হাড্ডি পাওয়া যায় ভিলাফ্রাঙ্কা ডিয়াস্টি (Villafranca d'Asti)তে । ভিলাফ্রাঙ্কা ডিয়াস্টি হলো ইতালির উত্তরাঞ্চলের একটি স্থান। সেখানকার একটি অনাবৃত স্তরক্রমকে ১৮৬৫ সনে প্যারেটো (Pareto) ভিলাফ্রাঙ্কার সোপান বলতে একটি স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের অঞ্চল বুঝায় যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হাতি (Elephus), গরু (Lepto Bos), ঘোড়া (Equus) এবং এশিয়া থেকে আগত কিছু অভিবাসীর আবির্ভাব। ১৯১১ সনের গোড়ার দিকে হাউগ (Haug) এমন স্তন্যপায়ী জীবাশ্ম শ্রেণীকে প্লেইসটোসিন আমলের বলে মনে করতেন।

ভিলাফ্রাঙ্কার এ জৈবিক অঞ্চলটি প্লায়ো-প্লেইসটোসিন উপযুগ দুটি জুড়ে বিস্তৃত। প্লায়োসিনে কিছু নতুন অভিবাসী বিশেষ করে তীক্ষ্ণ দাঁতের ইঁদুর (rodent) ইউরোপে আগমন করে। এ সকল ইঁদুরের মধ্যে ট্রিলোফোমিস (Trilophomys) এবং মিমোমিস (Mymomys) উল্লেখযোগ্য। মিমোমিস প্রজাতির বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ইঁদুরের এই

ক্রমবিকাশ শুরু হয় মিমোমিস স্টেহলিনি (Mimomys Stehlini) এবং শেষ হয় মিমোমিস স্যাভিনি (Mimomys Savini) দিয়ে। ইঁদুর বিবর্তনের এ ক্রমধারায় মধ্যবর্তী দুটি প্রজাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে দুটি হলো : মিমোমিস পোলোনিকাস (Mimomys Polonicus) এবং মিমোমিস প্লায়োসায়েনিকাস (Mimomys Pliocaenicus)। ভিলাফ্রাঙ্কার স্তন্যপায়ী জীব শ্রেণীর একটি তালিকা প্রদত্ত হলো (সারণি ১.৩)।

	বয়স (মিলিয়ন বছর বপ.	স্তন্যপায়ী জীবাশ্ম
ঊর্ধ্ব ভিলাফ্রাঙ্ক	১.৮০ - ০.৪০	ফানেতা অঞ্চল (Farneta zone) : হাতি (Archisd. Merid.), ইকুস ষ্টেহ্‌লিনি (Equus stehlini), লেপটোবস এট্রাসকাস (Leptobos etruscus), হোমোথেরিয়াম (Homotherium) । টাসো অঞ্চল (Tasso zone) : ক্যানিস এভারনেনসিস (Canis avernensis), মিমোমিস প্লায়োসায়েনিকাস (Mimomys Pliocaenicus), লেপুস ভ্যালডারনেনসিস (Lepus valdernensis) । ওলিভা অঞ্চল (Oliva Zone) : একুস ষ্টেনোনিস (Eq. stenonis), (লপটোবস এট্রাসকাস (Leptobos ectruscus), প্যানথেরাটোস্‌কানা (Pantheratoscana), ক্যানিস এট্রাসকাস(Canis etruscus) । (চ.ফ. মেজর, ১৮৯০)
মধ্য ভিলাফ্রাঙ্কা	২.৪৩ - ১.৮০	সেন্ট ভ্যালিয়ার অঞ্চল (Saint vallier Zone) : মিমোমিস প্লায়োসায়েনিকাস (Mimomys Pliocaenicus), মিমোমিস পলোনিকাস (Mimomys polonicus), লেপটোবস ষ্টেনোমেটোপন (Lept. stenometopon), অ্যানানকাস এভারনেনসিস (Anancus avernensis), এনানকাস মেরিডিওনালিস (A. Meridionalis) । (জ. ভিরেট, ১৯৫৪)
নিম্ন ভিলাফ্রাঙ্কা	৩.৫০ - ২.৪৩	Montopoli Zone) : অ্যানানকাস এভারনেনসিস (Anancus avernensis), ডি. জিনভিরেতি (D. jeanvireti), সেরাস পার্ডিনেনসিস্ (Ceruus pardinensis), লেপটোবস ষ্টেনোমেটোপন (Lept. stenometopon) । (Triversa Zone) : (Tapirus avernensis), অ্যানানকাস এভারনেনসিস (Anancus avernensis) । (চ.ফ. মেজর, ১৮৯০)

সারণি ১.৩ : ভিলাফ্রাঙ্কার স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের কালক্রমিক তালিকা। (সূত্র : ইফাক, ১৯৮৬)।

অনেকেই ভিলাফ্রাঙ্কার জৈবিক অঞ্চলকে একটি সোপানের মর্যাদা দেন এবং ভিলাফ্রাঙ্কাকে ক্যালাব্রিয়ান সোপানের সমতুল মনে করেন। সত্যিকারার্থে ভিলাফ্রাঙ্কা বলতে অনুস্তরের চেয়ে অবক্ষেপের ভেতর যে জীবাশ্ম আছে তাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া

হয়ে থাকে। ক্যালাব্রিয়া সোপান বলতে একটি নির্দিষ্ট অনুস্তরকে বুঝায়, অন্যদিকে ভিলাফ্রাঙ্কা বলতে স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের অঞ্চলকে বুঝায়। ভিলাফ্রাঙ্কার অবক্ষেপগুলোর প্রতিবেশ ছিল স্থলভাগ। আর ক্যালাব্রিয়া সোপানের প্রতিবেশ ছিল অগভীর সমুদ্র। এমতাবস্থায় সামুদ্রিক প্রতিবেশের ক্যালাব্রিয়া সোপান আর স্থল প্রতিবেশের ভিলাফ্রাঙ্কা সোপান এক নয়। বয়সের দিক দিয়ে ভিলাফ্রাঙ্কার একটি অংশ মাত্র (মধ্য ও উর্ধ্ব ভিলাফ্রাঙ্কা) ক্যালাব্রিয়ানের সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা যেতে পারে, সম্পূর্ণ ভিলাফ্রাঙ্কাকে নয়। তাই দুটি সোপান সমতুল হতে পারে না।

ভিলাফ্রাঙ্কার জীবাশ্মের তালিকা অনুযায়ী ভিলাফ্রাঙ্কাকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা : (১) নিম্ন ভিলাফ্রাঙ্কা (৩.৫–২.৪৩ মি: বছর পূর্বে), (২) মধ্য ভিলাফ্রাঙ্কা (২.৪৩–১.৮ মি: বছর পূর্বে) এবং (৩) উর্ধ্ব ভিলাফ্রাঙ্কা (১.৮–০.৮ মি: বছর পূর্বে) (সারণি ১.৩)।

প্লেইসটোসিন সময়ের স্তন্যপায়ী প্রাণিকুল (Pleistocene Mammalian Fauna)

সূচনাতেই বলা হয়েছে যে, কোয়াটারনারির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাপক স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব। বিশেষ করে গরু, ঘোড়া এবং হাতি। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, উৎকৃষ্ট মেধাসম্পন্ন মানুষের বিস্তৃতি ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ। জীবাশ্মের নথি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পুরা প্লেইস্টোসিন সময়ের জলবায়ু নিম্ন অক্ষাংশের প্রাণিকুলে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে আফ্রিকার প্রাণিকুলে কোনো প্রভাবই পড়েনি। কিন্তু হিমযুগে উচ্চ অক্ষাংশের গাছপালার বিলুপ্তি ও প্রাণিকুলের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

ইতঃপূর্বে আমরা ভিলাফ্রাঙ্কা স্তন্যপায়ী জীবাশ্ম নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। এমন জীবাশ্মের অঞ্চল পৃথিবীতে অনেক আছে। তবে ইতালির ভিলাফ্রাঙ্কা, ভারতের সিবালিক পাহাড়সমূহ (Siwalik foot hills), ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় স্তূপপর্বত (Massif central), মন্টপেলিয়া রুঁসিওঁ (Montpellier Roussillon) , আফ্রিকার ওমো অববাহিকা (Omo Valley) এবং ওলদুভাই গিরিখ্যাত (Olduvai George) উল্লেখযোগ্য।

উচ্চ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলোতে বিপুল পরিমাণ আধুনিক প্রজাতির আগমন ঘটে মধ্য ও উর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন সময়ে। নিম্ন অক্ষাংশে এমন পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। ইউরোপের স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রজাতি এখনও জীবন্ত অবস্থায় আছে। উত্তর আমেরিকায় সবচেয়ে ভাল স্তরক্রম তা হলো : বিশাল কেন্দ্রীয় সমভূমি (central great plain)। সেখানে ব্ল্যানক্যান–ইরভিংটন স্তন্যপায়ীর বয়সের সীমারেখা (Blancan–Irvington mammal Age Boundary) কিছু সংখ্যক ব্ল্যানক্যান প্রজাতির বিলুপ্তির সাথে মিলে যায়। যেমন, তিন ক্ষুরওয়ালা ঘোড়া — নানিপাস (Nannipus) এবং হায়েনার মতো কুকুর — বোরোফাগাস (Borophagus) এর বিলুপ্তি। এতদসহ ম্যামথ (Mammoth) ও

খরগোস-লেপাস (Lepus) এর কিছু নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। হিমযুগে বেরিং প্রণালী শুকিয়ে যায়। ফলে এশিয়া থেকে আমেরিকায় এসব অভিবাসীর আগমন ঘটে।

বর্ষাকাল ও বর্ষাবিরতি (Pluvial and Interpluvial)

পেন্‌ক ও ব্রাকনারের হিমযুগ ও হিমবিরতির অনুকরণে চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে পূর্ব আফ্রিকার কোয়াটারনারি অবক্ষেপগুলোর স্তরতত্ত্ব তৈরির কাজ শুরু হয়। হিমযুগে উচ্চ অক্ষাংশের স্থলভাগ বরফে ঢেকে গেলেও নিরক্ষীয় অঞ্চলে উচ্চ পর্বত ছাড়া বরফের আগমন ঘটে নি। সূর্যের বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর যে জলবায়ুর পরিবর্তন তার প্রভাব সূক্ষ্ম প্রাণী ও জীবজগতে পড়েছে বৈ কি। এটা অবশ্য আগামী দিনের গবেষণার ক্ষেত্রে। হিমাগমনের ফলে অক্ষাংশভেদে সূক্ষ্ম প্রাণী ও জীবজগতের যে পরিবর্তন সে বিষয়ে গবেষণা করে হয়তো বা প্রাচীন জলবায়ুর পরিবর্তন আন্দাজ করা যেতে পারে।

পূর্ব আফ্রিকাতে **বর্ষাকাল** (pluvial) ও **বর্ষাবিরতি** (interpluvial) নামক একটি ধারণার প্রচলন শুরু হয় দ্রুতগতিতে। কোয়াটারনারির কোনো কোনো সময়ে পূর্ব আফ্রিকার (নিম্ন অক্ষাংশের) সরোবরগুলোর পানিপৃষ্ঠ অনেক উঁচুতে উঠে আবার কোনো কোনো সময় সরোবরগুলো শুকিয়ে যায়। কোয়াটারনারির যে সময়ে বৃষ্টির পানিতে আফ্রিকার সরোবর কানায় কানায় ভরে উঠতো সেই সময়কে **বর্ষাকাল** এবং কোয়াটারনারির যে সময়ে আফ্রিকার সরোবরগুলোর পানিপৃষ্ঠ নিচে নেমে যেত বা সরোবর শুকিয়ে সরোবর তল ফেটে যেত সে সময়কে **বর্ষা বিরতি** বলা হতো। বর্ষা বিরতিতে পলির পরিমাণ অত্যন্ত কমে যেত বা মৃত্তিকার স্তরের (soil layer) জন্ম নিত। সে মৃত্তিকা এখন বাদামি রংয়ের পুরামৃত্তিকার স্তর (Palaeosol layer) হিসেবে দেখা যায়। তাই সে সময়ে পূর্ব আফ্রিকায় কোয়াটারনারি অবক্ষেপের স্তরক্রমকে জলবায়ু পরিবর্তনের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতো।

আফ্রিকায় সে সময়ে এমন মনে করা হতো যে, উচ্চ অক্ষাংশে যখন হিমযুগ ছিল, তখন নিম্ন অক্ষাংশে ছিল বর্ষাকাল। বর্ষাকালে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হতো। বৃষ্টির পানিতে নদী ভরে উঠতো এবং সরোবর উপচে উঠতো। পক্ষান্তরে, উচ্চ অক্ষাংশের হিমবিরতির সমকালে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বর্ষাবিরতি। উচ্চ অক্ষাংশে হিমবিরতিতে বায়ুর আর্দ্রতা বেড়ে যেত, বৃষ্টিপাত হতো ; অন্যদিকে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে শুকনো আবহাওয়া বিরাজ করতো। সরোবরের তলদেশ শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যেত। এভাবেই আফ্রিকার কোয়াটারনারির স্তরবিদ্যার স্তরক্রমগুলোকে বর্ষাকালের আর্দ্রচক্র ও বর্ষাবিরতির শুকনোচক্রের ক্রমানুসারে ঢালাওভাবে সাজানো হলো। মোটকথা, কোয়াটারনারি অবক্ষেপগুলোকে আর্দ্র ও শুকনো চক্রে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্তরবিদ্যার শ্রেণীবিভাগ হতে পারে না। উপরন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের উপাত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না।

১৯৪৭ সনে নাইরোবীতে প্রাগৈতিহাসের উপর অনুষ্ঠিত **প্রথম সর্ব আফ্রিকান মহাসভায়** (First Pan African Congress) বর্ষাকাল বর্ষাবিরতি সংবলিত শ্রেণী বিভাগটি প্রাথমিকভাবে অনুমোদন লাভ করে। এর এক বছর পর ১৯৪৮ সনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক মহাসভায় (International Geological Congress) স্বীকৃতি লাভ করে। যাহোক, ১৯৩৯ সনে এই পরিকল্পনাটি উগান্ডায় কর্মরত সলোমন (Solomon) এবং ব্রায়েন (Brien) আফ্রিকার কোয়াটারনারির শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি বলে ধরে নেবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ সেই পরিকল্পনাটিই ১৯৪৮ সনে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠনের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত বেশ কিছু অভূতাত্ত্বিক অঙ্গনে বর্ষাকাল ও বর্ষাবিরতি ধারণার ব্যবহার দীর্ঘায়িত হতে থাকলো, যদিও ফ্লিন্ট (Flint), বিশপ (Bishop) এবং আরো অনেকে চরম সমালোচনার ঝড় তুললেন।

বর্ষাকাল / বর্ষাবিরতি	নমুনাস্থান	প্রমাণাদি
কাগেরান বর্ষাকাল	উগান্ডার কাগেরা নদীর অববাহিকা	জীবাশ্মহীন নদীর কাঁকর
প্রথম বর্ষাবিরতি	খরা নির্দেশক হাড়ের অনুস্তর	উগান্ডার আলবার্ট বেসিনের সরবর
কামাসিয়ান বর্ষাকাল	কেনিয়ার কামাসিয়া মালভূমি	সরবরের অবক্ষেপ (জীবাশ্মহীন)
দ্বিতীয় বর্ষাবিরতি	অলদুভাই গিরিখাত, তাঞ্জানিয়া	লাল মৃত্তিকা (পালজ), অলদুভাই অনুস্তর-৪
কানজেরান বর্ষাকাল	কেনিয়ার কানজেরা অঞ্চল	সরবরের অবক্ষেপ ও সমুদ্রতীর
তৃতীয় বর্ষাবিরতি	উগান্ডার সংশ্লিষ্ট এলাকা অলদুভাই গিরিখাত, তাঞ্জানিয়া	পুরামৃত্তিকা (লাল) এবং অবশিষ্ট (পলিজ) কাঁকর অলদুভাইয়ের ৪নং অনুস্তরের উপরে আসংগতি
গ্যাম্বলিয়ান বর্ষাকাল	গেম্বল গুহা এবং গেম্বল স্তূপ, কেনিয়া	সরোবরের অবক্ষেপ ও সমুদ্রতীর
প্রথম বর্ষা পরবর্তীকালের শুষ্কাবর্ত (বর্ষাবিরতি)	গেম্বল গুহা এবং মাকালিয়া নদীর অববাহিকা	লাল মৃত্তিকা ও খয়েরি বালি
মাকালিয়ান বর্ষাকাল	মাকালিয়া নদীর অববাহিকা, কেনিয়া	সরোবরের অবক্ষেপ ও সমুদ্রতীর
শুষ্কাবর্ত (বর্ষাবিরতি)	গেম্বল গুহা, কেনিয়া	গেম্বল গুহার খয়েরি রংয়ের বালি
নাকুরিয়ান বর্ষাকাল	নাকুরু সরবর, কেনিয়া	সরোবরের অবক্ষেপ ও সমুদ্রতীর

সারণি ১.৪ : পূর্ব আফ্রিকার বর্ষাকাল ও বর্ষাবিরতির ধারাবাহিকতা।
(সূত্র : বোয়েন, ১৯৭৮)।

১.৪ সারণিতে প্রধান জলবায়ু স্বীকৃত চক্রগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। প্রকৃতপক্ষে এ পরিকল্পনাটি কোয়াটারনারি অবক্ষেপের স্তরবিদ্যার স্তরক্রমের উপর ভিত্তি করে ছিল না। স্তরক্রমগুলোও ভালভাবে বর্ণনা দেয়া ও পারম্পর্য নির্ণয় করা ছিল না। বর্ষাকাল ও বর্ষাবিরতির ধারণাটি জলবায়ুর চক্রসমূহকেও ইঙ্গিত করে এবং এ সকল চক্র অবক্ষেপের মাধ্যমে তালিকায় সাজালে চমৎকার স্তরতত্ত্ব বলে মনে হয়। বস্তুত বিভিন্ন সময়ে যে সকল একক শনাক্ত করা হয়েছিল সেগুলোকে স্তরীয় একক বা জলবায়ুর স্তরীয় একক হিসেবে ব্যবহার করা হতো (বয়েন, ১৯৭৮)। যেমন ক্লার্ক **গ্যামব্লিয়ান** (Gamblian) শব্দটি তিনটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করতেন : (১) গ্যামব্লিয়ান অবক্ষেপ, (২) গ্যামব্লিয়ান বর্ষাকাল এবং (৩) গ্যামব্লিয়ান সময়। এ সকল নামের শ্রেণীবিভাগটি স্তরবিদ্যার সংজ্ঞাকে অনুসরণ করতো না বরং জলবায়ুর চক্রগুলোর ধারণাকেই ইঙ্গিত করতো।

কেনিয়ার এলমেনটিইরার (Elmenteira) নিকটে গেমবলস (Gambles) স্তর এবং ন্যাকারু (Nakaru) সরোবরের ১৫৫ মিটার উপরে সৈকত রেখার (shore line) উপর ভিত্তি করে **গ্যামব্লিয়ান বর্ষাকাল**-এর নামকরণ হয়। তাঞ্জানিয়ার ওলদুভাই গিরিখাতে (Olduvai Gorge) বর্ষাকালকে শনাক্ত করা হয় প্রশস্ত এবং পরিপক্ব অববাহিকা দেখে। অবক্ষেপের পরিমাণও ছিল অনেক বেশি। কিন্তু ভূপ্রকৃতি দেখে পুরাকালের জলবায়ু নির্ধারণের এ পদ্ধতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেনিয়ার কামাস মালভূমি থেকে **কামাস বর্ষাকাল** (Kamasian pluvial) নামকরণ করা হয়েছে। টুফ (tuff) যুক্ত বালি, সিল্ট (silt) ও নুড়িপাথর এর পূর্বদিকের স্রস্ত উপত্যকার (Rift valley) তলায় ডায়াটমাইটই (Diatomite) হলো কামাস বর্ষাকালের ভিত্তি।

কাগেরা নদী থেকে প্রায় ৮২ মিটার উপরে একটি নদীর টেরাসের উপর ভিত্তি করে **কাগেরা বর্ষাকাল** (Kageran pluvial) নামকরণ করা হয়েছে। ধারণা করা যায় নদীর স্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অবক্ষেপগুলো পাললিত হয়েছিল। বর্ষাবিরতির ভাগগুলোর ভিত্তিও অত্যন্ত দুর্বল ছিল। প্রথম বর্ষাবিরতির ভাগটি ছিল আলবার্ট সরোবর অববাহিকায় 'হাড়ের অনুস্তরের' (Bone bed) উপর ভিত্তি করে। ধারণা করা হয়েছিল যে, সরোবরে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় শুকনো তলা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল।

বর্ষাকাল ও বর্ষাবিরতি শ্রেণীবিভাগের পেছনে যে যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছিল তা মোটেই অকাট্য যুক্তি ছিল না। সরোবরের পানিপৃষ্ঠ উঠানামাই জলবায়ু পরিবর্তনের মাপকাঠি নয়। ভূগাঠনিক (tectonic) কারণেই সরোবর পৃষ্ঠ উঠানামা করতে পারে। ওমো-রুডলফ বেসিনের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৮৯৬ সালে সরোবর পৃষ্ঠ এখনকার সরোবর পৃষ্ঠ অপেক্ষা ১৫ মিটার উপরে ছিল, আবার ১৯৫৫ সালে ৫ মিটার নিচে ছিল। বিগত ২০০০ বছরে বেসিনটির পানিপৃষ্ঠ প্রায় ৪০ মিটার উঠানামা করেছে।

পরাগতত্ত্বসহ অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে আগের বর্ষাকাল ও বর্ষাবিরতির ধারণাটি এখনকার ধারণার একেবারেই উল্টা। এখনকার গবেষণায় দেখা গেছে , উচ্চ অক্ষাংশে যখন

হিমযুগ ছিল তখন নিরক্ষীয় অঞ্চল ছিল শুকনো (dry), আবার উচ্চ অক্ষাংশের হিমবিরতির যুগে নিরক্ষীয় অঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল।

মানবের বিবর্তন (Evolution of Man)

নবজীবীয় অধিযুগের (Cenozoic Era) আকর্ষণীয় ঘটনা হলো মানুষ জাতির আবির্ভাব। ঊর্ধ্ব টারশিয়ারি যুগে বানর ছিল মানুষের মতো । প্রকৃতপক্ষে, মানুষের আবির্ভাব ঘটে প্লেইস্টোসিন হিমযুগের গোড়াতে (সর্বাধিকারী, ১৯৭৪)। সেই প্রাচীনতম মানব জাতির নিদর্শন পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ রাশিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক; ভারতবর্ষ, বার্মা, জাভা, চীন পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় পাওয়া গেছে। মানবের দেহাবশেষ নয়, কিন্তু তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতিয়ারগুলো ভারতীয় অঞ্চলে কিছু কিছু বর্তমান। তিমির রঞ্জন সর্বাধিকারী (১৯৭৪) অবলম্বনে মানব জাতি ও তার সংস্কৃতির বিবর্তনের পর্যায়গুলোর সাথে হিমপর্যায়ের সম্পর্ক এবং তাদের বয়সকাল ১.৫ সারণিতে দেয়া হলো। ১.১০ ও ১.১১ চিত্রে পৃথিবীতে মানুষের বিস্তৃতি কালানুসারে দেখানো হয়েছে।

কালক্রম	হিমক্রম	সভ্যতাক্রম	
হলোসিন	হিমোত্তর পর্যায়	২,০০০ খ্রীঃপূঃ ৩,৫০০ খ্রীঃপূঃ ৮,০০০ খ্রীঃপূ ২০,০০০ খ্রীঃপূঃ	লৌহযুগ ব্রোঞ্জ যুগ নব প্রস্তর যুগ মধ্য প্রস্তর যুগ
ঊর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন	চতুর্থ হিমপর্যায় তৃতীয় হিমবিরতি		ঊর্ধ্ব প্রত্নপ্রস্তর যুগ মধ্য প্রত্নপ্রস্তর যুগ
মধ্য প্লেইস্টোসিন	তৃতীয় হিমপর্যায় দ্বিতীয় হিমবিরতি দ্বিতীয় হিমপর্যায়		নিম্ন প্রত্নপ্রস্তর যুগ
নিম্ন প্লেইস্টোসিন	প্রথম হিমবিরতি প্রথম হিমপর্যায়		প্রাক্ প্রত্নপ্রস্তর যুগ

সারণি ১.৫ : সিবালিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (সূত্র : সর্বাধিকারী, ১৯৭৪)।

রামাপিথেকাস (Ramapithecus) আদিম মনুষ্য পরিবারের (Hominidae) সদস্য কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রামাপিথেকাস ভারত, পাকিস্তান, চীন, গ্রীস ও কেনিয়াতে বাস করতো। আগ্নেয়গিরির লাভাঞ্চলে বিস্তৃত পূর্ব আফ্রিকার রামাপিথেকাসের বয়স

পটাশিয়াম-আরগন (K/Ar) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করে দেখা গেছে যে, এ সকল প্রাণী প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে বিস্তৃত ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অস্ট্রালোপিথেসাইনগুলো (Australopithecines) মনুষ্য প্রজাতি বা হোমিনিড (Hominid) ছিল। প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে মায়োসিন যুগের শেষে তাদের আবির্ভাব

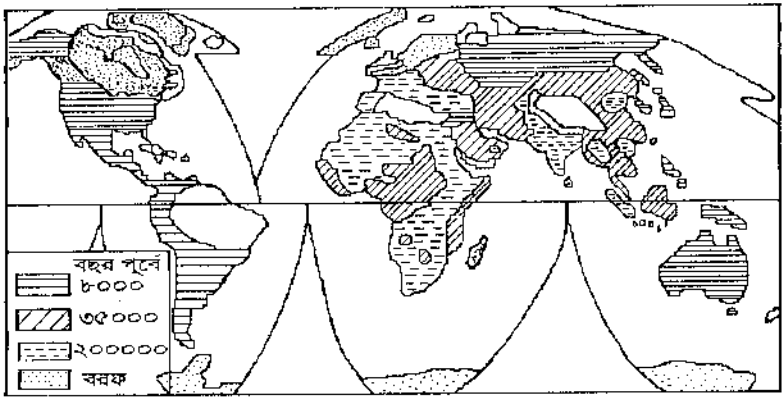

চিত্র ১.১০ : প্লেইস্টোসিন মানুষের বিস্তৃতি (সূত্র : বাটজার, ১৯৭৭)।

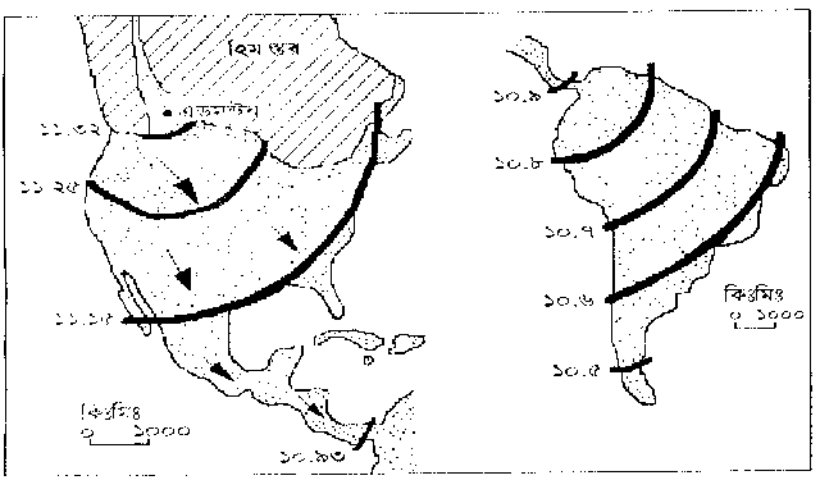

চিত্র ১.১১ : আমেরিকার জনসংখ্যা এবং বৃহৎ জীবাশ্মের বিলুপ্তির সম্মুখ রেখা। বয়স বর্তমান থেকে হাজার বছরে (সূত্র : মার্টিন, ১৯৭৩)।

ঘটে এবং সে সময়ে সেগুলোর বিস্তৃতি শুধু আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পুরা প্লেইস্টোসিনের আগে (১.৯-১.৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে) অস্ট্রালোপিথেসাইনদের আফ্রিকা ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় নি। সম্ভবত অস্ট্রালোপিথেসাইনদের কয়েকটি প্রধান জীব শ্রেণী

(Taxonomic Categories) ছিল, যেমন : অ. আফ্রিকানাস (A. Africanus), অ. রবাসটাস (A. Robustus) এবং অ. বইসেই (A. Voisei)। কিন্তু তারা এক থেকে দেড় মিলিয়ন বছর পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। অলদুভাই গিরিখাতে (Olduvai Gorge) ১৮ লক্ষ বছর আগের অ. রবাসটাস এবং মনুষ্যের আদি প্রজাতি হোমো হাবিলিস (Homo habilis) পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে পূর্ব রুডলফ সরোবরে (Lake Rudolf) যে হোমো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো আরো প্রাচীনকালের, প্রায় ২৬ লক্ষ বছর পূর্বের। কুবি ফোরাতে (Kobi fora) যে বিখ্যাত মনুষ্য মাথার খুলি পাওয়া গেছে তারও এই বয়স। আদিম যুগের হোমো জীবাশ্মের মস্তিষ্কের আকার অস্ট্রালোপিথেসাইনদের চেয়ে বড় এবং নিম্ন প্রত্যঙ্গের হাড় প্রায় আধুনিক মানুষের মতোই। হোমো ইরেকটাস (Homo errectus) জীবশ্রেণীর বিকাশ ঘটে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর আগে। এগুলোর জীবাশ্ম জাভা, চীন, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মস্তিষ্কের আধারের আকার আধুনিক মানুষের তুলনায় বড় ছিল। তাদের মুখ এবং দাঁতগুলোর আকার ছোট ছিল প্রায় আধুনিক মানুষের কাছাকাছি। মধ্য প্লেইস্টোসিনে প্রায় ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ বছর আগে হোমো ইরেকটাস হোমো স্যাপিয়েনস (Homo Sapiens) এ বিবর্তিত হলো। জীবাশ্মগুলোর মুখ এবং দাঁত সঙ্কুচিত কিন্তু বড় মস্তিষ্কসম্পন্ন। দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে আধুনিক মনুষ্যের আগমন ঘটে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার বছর আগে।

আচিউল সভ্যতার (The Acheulian Culture) বিকাশ মধ্য প্লেইস্টোসিন সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে সভ্যতায় আদিম মানুষেরা দুদিকে ধারওয়ালা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতো। এই হাতিয়ার তারা কুঠার বা ছুরির মতো ব্যবহার করতো। অলদুভাই গিরিখাতে হোমিনিডদের (আদিম মনুষ্যের) এই গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা ১৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ বছর আগের। আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে ২ লক্ষ বছর পূর্বে তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে এক লক্ষ বছরের আগ পর্যন্ত চলতে থাকে (মাইসটার সভ্যতা)।

ইউরোপে প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে ক্রোম্যাগনোন (Cro-Magnon) অধিবাসীদের সভ্যতা নীনদারথেলার (Neanderthalers) এবং সাউসটার সভ্যতাকে ছেড়ে যায়। ক্রোম্যাগনোনেরা পূর্ব দিক দিয়ে ইউরোপে আসে এবং তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা ও সামাজিক নৈপুণ্য অনেক উন্নত ছিল। ১৮ হাজার বছর আগে হিমযুগের সর্বোচ্চ চূড়ায় এ সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে।

সিবালিক জীবাশ্মের সমাবেশ (Siwalik Faunal Assemblages)

সিবালিক গোষ্ঠী এবং তার মধ্যে স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের সমাবেশ সারাবিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে। এ গোষ্ঠীর বিরাট একটা অংশ নিওজিন এবং শুধু ওপরের অংশই কেবল কোয়াটারনারি অবক্ষেপ। সর্বাধিকারীর (১৯৭৪) আলোকে সিবালিক গোষ্ঠীর স্তরতত্ত্বসহ জীবাশ্মের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বর্ণনা এখানে পরিবেশিত হলো।

সিবালিক গোষ্ঠীর নাম এসেছে সিবালিক পর্বত হতে। সিবালিক পর্বত হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বারের নিকট অবস্থিত। মায়োসিন উপযুগের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে হিমালয়

গিরিজনির তৃতীয় পর্বে একটি বিরাট ভূসংক্ষোভ (Cannyon) দেখা দেয়। এর ফলে হিমালয় পর্বত প্রায় তার বর্তমান আকার ধারণ করে। এর দক্ষিণেই একটা লম্বা সংকীর্ণ খাদের সৃষ্টি হয়। হিমালয়ের প্রায় সমগ্র দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত এই অববাহিকাটিতে উত্তরের উন্নীয়মান নবজাত পর্বতমালার খরস্রোতা নদীগুলো কর্করীয় পললের অবক্ষেপ শুরু করে। অবক্ষেপণের সাথে সাথে অববাহিকার বক্ষও ক্রমাগত নমিত হতে থাকে। এভাবেই মধ্য মায়োসিন হতে নিম্ন প্লেইস্টোসিন সময়কালে ১৬ থেকে ১৮ হাজার ফুট পুরু অবক্ষেপ স্তরীভূত হতে থাকে। নবজীবীয় কালের শেষের দিকে কয়েকটি ভূসংক্ষোভের দ্বারা এ অবক্ষেপগুলো পর্বতাকারে উন্নীত হয়। সিবালিক গোষ্ঠী সাধারণত মোটা, মাঝারি ও মিহি দানার কর্করীয় অবক্ষেপ (বেলে পাথর, গ্রীট, কংগ্লোমারেট, ছদ্ম–কংগ্লোমারেট–Pseudo-conglomerate, পলিপাথর এবং ক্লে–শিলা)। সিবালিক স্তরের সাথে প্রাক–সিবালিক স্তরের সংযোগ–তল অনেক সময় একটি সংঘট্ট দ্বারা চিহ্নিত। তাকে সাধারণত প্রধান

	অনু গোষ্ঠি	সোপান	অনু-উপযুগ	স্তন্যপায়ী জীবাশ্ম
সিবালিক গোষ্ঠি	ঊর্ধ্ব সিবালিক (৬০০০-৮০০০ ফিট)	তাবি সোপান (বোল্ডার-কংগ্লোমারেট) অসংগতি ট্যাট্রট-পিঞ্জর সোপান অসংগতি	মধ্য-ঊর্ধ্ব প্লেইসটোসিন	
			নিম্ন-প্লেইসটোসিন	প্রাইমেট: পেভি, সিমিয়া, সেমনোপিথেকাস; রডেনশিয়া: নেকোসিয়া; কার্নিভোরা: ক্যেনিস, ফেলিস, ভিভেরা; হস্তি: পেন্টালফোডন ইত্যাদি; বস, বাইসন, কিরাস, ক্যামেলাস ইত্যাদি
	মধ্য সিবালিক (৬০০০-৮০০০ ফিট)	ধোক পাঠান সোপান	মধ্য-প্লায়োসিন	প্রাইমেট: ম্যাকাকাস, শিবপিথেকাস; রডেনশিয়া: রাইজোমিস; কার্নিভোরা: অ্যাগ্রিওথেরিয়াম, ক্রকিউটা ইত্যাদি; হস্তি: ট্রাইলফোডন, স্টেগোডন ইত্যাদি; হিপারিয়ন, রাইনোশিরাস, সার্ভাস, জিরাফা, বসিল্যাফাস,
		নাগ্রি সোপান	নিম্ন প্লায়োসিন	হিপারিয়ন, জিরাফোকেরিক্স, লিস্ট্রিওডন, অ্যাশেরাথেরিয়াম
	নিম্ন-সিবালিক (৫০০০ ফিট)	চিঞ্জি সোপান	নিম্নতম-প্লায়োসিন	প্রাইমেট: শিবপিথেকাস, ড্রায়োপিথেকাস,ব্রমপিথেকাস ইত্যাদি: কার্নিভোরা: ডিসপসালিস, মার্টিস, সিভালিকটিস; হস্তি: ডাইনোথেরিয়াম, ট্রাইলফোডন ইত্যাদি; হিপারিয়ন, জিরাফা,
		কামলিয়াল সোপান	মধ্য-উর্ধ মায়োসিন	হস্তি : ডাইনোথেরিয়াম, ট্রাইলফোডন কার্নিভোরা: অ্যামফিশাওন; আর্টিওড্যাকটাইলা: প্যালিওকিরাস ।
মুরী শ্রেণী (নিম্ন হতে মধ্য মায়োসিন)				

সারণি ১.৬ : সিবালিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ।
(সূত্র : সর্বাধিকারী, ১৯৭৪)।

সীমারেখা চ্যুতি (main boundary fault) বলা হয়। সিবালিক বলয়টি পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হতে একটানা পশ্চিমে জম্মু (পোটওয়ার) পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বপ্রান্তে আসাম ও বার্মাতে এবং পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানেও দেখতে পাওয়া যায়। যেসব নদী দ্বারা সিবালিক গোষ্ঠীর পললক্ষেপণ হতো সেগুলো প্রধানত উত্তরের হিমালয় পর্বত হতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল।

সিবালিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Siwalik Group)

সিবালিক স্তরের আদর্শ অঞ্চল (type area) জম্মু অঞ্চলের পোটওয়ার মালভূমি। পোটওয়ার মালভূমির দক্ষিণে লবণ পর্বত ও উত্তরে মুরী পর্বত দ্বারা সীমায়িত। সিবালিক গোষ্ঠীকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : উর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন। প্রতিটি শ্রেণী আবার দুটি সোপানে বিভক্ত। ১.৬ সারণিতে শ্রেণীবিভাগটি প্রদত্ত হলো।

সিবালিকের শ্রেণীবিভাগ প্রধানত শৈল উপাদানের উপর ভিত্তি করে শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী ও সোপানের শৈল উপাদানের পার্শ্বিক রূপভেদ একটি অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়। পরবর্তীতে শ্রেণী ও সোপানগুলোকে (stages) আঞ্চলিক স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের দ্বারা চিহ্নিত করায় উক্ত শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হয়েছে।

কামলিয়াল সোপান (Kamlial Stage)

সিবালিকের সোপানগুলোর নামকরণ করা হয়েছে পেটওয়ার অঞ্চলের স্থানীয় নাম হতে। খাউর তৈলখনি অঞ্চলের কামলিয়াল নামক স্থান থেকে কামলিয়াল সোপানের নামকরণ হয়েছে। শক্ত লালচে রঙ্গের বেলে পাথর, ক্লে–গোলক সংবলিত ছদ্ম–কংগ্লোমাটে এবং লালাভ শেল শিলায় কামলিয়াল সোপান প্রধানত গঠিত। ঊর্ধ্বস্থ চিঞ্জি স্তরের তুলনায় কামলিয়াল সোপানের শেল অধিকতর লাল। কামলিয়াল সোপানের কয়েকটি মেরুদণ্ডী জীবাশ্ম : (হাতি) - ডাইনোথেরিয়াম (Dinotherium), ট্রাইলোফোডন (Trilophodon) ; (কার্নিভোরা) – অ্যামফিশাওন (Amphicyon)। এ সোপানের পুরুত্ব প্রায় ৫৫০। কামলিয়াল সোপানের বয়স মধ্য হতে ঊর্ধ্ব মায়োসিন।

চিঞ্জি সোপান (Chinji Stage)

পর্যায়িত ধূসর বর্ণ বেলে পাথর ও উজ্জ্বল লাল শেল দ্বারা এই সোপান গঠিত। এর গভীরতা ১৫০০ হতে ৫৫০০ ফুট হতে পারে। কিছু সরীসৃপ এবং একটি অমেরুদণ্ডী (ইউনিও, *Unio*) প্রাণীসমেত বহু গুরুত্বপূর্ণ স্তন্যপায়ী জীবাশ্ম এ সোপানে পাওয়া যায়। প্রাইমেট–শিবপিথেকাস (Sivapithecus), ড্রায়োপিথেকাস (Dryopithecus), ব্রমপিথেকাস

(Bramapithecus) ইত্যাদি ; কার্নিভোরা ডিসপসালিস (Dissopsalis), মার্টিস (Martes), সিভালিকটিস (Sivalictes) ইত্যাদি ; হাতি-ডাইনোথেরিয়াম (Dinotherium), ট্রাইলফোডন (Trollophodon), সেরিডেন্টিনাস (Seridentinus) ইত্যাদি ; পেরিসোড্যাকটাইলা-হিপারিয়ান (Hipparion), ম্যাক্রোথেরিয়াম (Macrotherium) ইত্যাদি ; জিরাফা (Giraffa) ইত্যাদি। চিঙ্গি সোপানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নতুন জীবাশ্ম দেখা যায় ; যেমন : প্রাইমেট, স্টেগোলফোডন (Stegolophodon), জিরাফা ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবাশ্ম অশ্বদলভুক্ত হিপারিয়ন (Hipparion)। এসব প্রাণী উত্তর আমেরিকা থেকে বিচরণ করে ভারতে এসেছিল। এসব জীবাশ্মের উপর ভিত্তি করে চিঙ্গি সোরানের বয়স নিম্নতম প্লায়োসিন বলে স্থির করা হয়েছে।

নাগ্রি সোপান (Nagri Stage)

চিঙ্গি ও নাগ্রি সোপানের মধ্যে কোনো অসংগতি (unconformity) নেই। নাগ্রি সোপান নিম্ন প্লায়োসিন বলে ধরা হয়। হলদেটে রংয়ের শক্ত বেলে পাথর এবং অল্প ক্লে ও সেল দিয়ে এ সোপান গঠিত। নাগ্রি সোপান তুলনামূলকভাবে জীবাশ্ম বিরল। চিঙ্গি সোপানের অনেক জীবাশ্মই নাগ্রি সোপানে পাওয়া যায়। হিপারিয়ন, অ্যাশেরাথেরিয়াম (Aceratherium) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ধোক পাঠান সোপান (Dhak Pathan Stage)

এ সোপান নাগ্রি সোপানের উপর সংগতিপূর্ণভাবে বিন্যস্ত। লালচে বেলে পাথর, শেল, ক্লে পলি পাথর এবং কিছু কাঁকর স্তরের (gracel) দ্বারা এ সোপান গঠিত। অন্যান্য সোপানের তুলনায় এ সোপানে প্রচুর জীবাশ্ম আছে। পূর্বে এ সোপানকে গ্রীসের পিকার্মি সোপানের সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হতো। হিপারিয়ন জীবাশ্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে এ সোপানের বয়স নিম্ন প্লায়োসিন রূপে সংশোধিত হওয়ায় এবং ধোক পাঠানের অশ্ব ও জিরাফকুল পিকার্মির সঙ্গিকুল অপেক্ষা উন্নত এবং অগ্রসর প্রকাশ পাওয়ায় এ সোপানের বয়স মধ্য প্লায়োসিন স্থির করা হয়েছে। ধোক-পাঠানের শীর্ষে পাওয়ায় এ সোপানের বয়স মধ্য প্লায়োসিন স্থির করা হয়েছে। ধোক-পাঠানের শীর্ষে ক্ষয়জাত অসংগতি (erosional unconformity) বর্তমান। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধোক পাঠান জীবাশ্ম : (প্রাইমেট) - ম্যাকাকাস (Macacus), সিবপিথেকাস (Sivapithecus) ; রেডনশিয়া-রাইজোমিস (Rhizomys), হিসট্রিক্স (Hystrix) ; (কোর্নিভোয়া)-অ্যাগ্রিওথেরিয়াম (Agriotherium) ; (হাতি)-ডাইনোথেরিয়াম (Dinotherium), ট্রাইলফোডন, স্টেগোলফোডন ইত্যাদি। এছাড়াও হিপারিয়ন, জিরাফা ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী পাওয়া যায়।

ট্যাট্রট-পিঞ্জর সোপান (Tatrot-Pinjohr Stage)

ট্যাট্রট ও পিঞ্জরকে আগে দুটি সোপান বলে মনে করা হতো। এখন এই দুটি সোপানকে একই সোপানভুক্ত করা হয়েছে। ট্যাট্রট স্তরটি কংগ্লোমারেট, বেলে পাথর এবং ক্লে শিলায় গঠিত। ভূমি স্তরে প্রায় সর্বত্রই মোটা দানার কংগ্লোমারেট দেখতে পাওয়া যায়। প্লায়োসিনের শেষে অনেক বলিজাত (originating from fold) অববাহিকার সৃষ্টি হয়। ট্যাট্রট এরূপ অববাহিকার অবক্ষেপ। ট্যাট্রট নিম্ন প্লেইস্টোসিন। পিঞ্জর ট্যাট্রট অপেক্ষা নবীনতর। নুড়ি স্তর ও মোটা বেলে পাথর অবক্ষেপ গঠিত। এ সোপানের বয়স নিম্ন প্লেইস্টোসিন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবাশ্ম : (প্রাইমেট)–পেপিও (Papio), সিমিয়া (Simia), সেমনোপিথেকাস (Semnopithecus) ; (রডেনশিয়া)–নেসোকিয়া (Nesokia), রাইজোমিস (Rhyzomys) ইত্যাদি ; (কার্নিভোরা)–কানিস (Canis), ফেলিস (Felis), ভিভেরা (Viverra), লুত্রা (Lutra) ইত্যাদি ; (হাতি)–পেন্টালফোডন (Pentalophodon), হিপসেলিফাস (Hypselephas), স্টেগাডন (Stegadon) ইত্যাদি ; (আর্টিওড্যাকটাইলা)–ক্যামেলাস (Camelus), শিবথেরিয়াম (Sivatherium) ; বস (Bos), বাইসন (Bison) ইত্যাদি।

তাবি বা বোল্ডার কংগ্লোমারেট সোপান (Tawi or Boulder Conglomarate Stage)

পিঞ্জর ও বোলডার কংগ্লোমারেট সোপানের মধ্যে অসংগতি বিদ্যমান। স্তরের গভীরতা ৩০০ ফুট। এই সোপান মোটা কর্করীয় অবক্ষেপ দ্বারা গঠিত। কংগ্লোমারেট ছাড়া কিছু পলিপাথর স্তর এবং বায়ুবাহিত অবক্ষেপও এ সোপানে বর্তমান। কংগ্লোমারেটের মধ্যে হিমঘর্ষিত গঞ্জশিলা (boulder) এবং মসৃণ পার্শ্ববিশিষ্ট উপল নুড়ির (pebble) উপস্থিতি হিমক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে। এ সোপানটি হিমযুগের অবক্ষেপ। এজন্য এ সোপানের অবক্ষেপের মধ্যে বিশেষ জীবাশ্ম পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী কালের প্রাণিকুল হিম শৈতের প্রভাবে বিলুপ্ত হয় অথবা দেশ ত্যাগ করে। অবশ্য এ সোপানে প্রাগৈতিহাসিক মানবের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ সোপানটিকে মধ্য প্লেইসটোসিন হিমযুগের বলে ধরা হয়। ঊর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন কালের পোটওয়ার পলিপাথর ও লোয়েস (Potwar Silt and Loess State) উল্লেখযোগ্য। ঊর্ধ্ব সিবালিক শ্রেণীর ঊর্ধ্ব সোপান তাবির সমসাময়িক অবক্ষেপ হলো ক্যারেবা সংঘ (Karewa formation)। ক্যারেবা সংঘ কাশ্মীর অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য শিলাস্তর। ক্যারেবা সংঘের বয়স মধ্য প্লেইস্টোসিন।

প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন সীমারেখা (Plio-Pleistocene Boundary)

কোয়াটারনারির সূচনাকাল কোথা থেকে? প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। কোয়াটারনারির শ্রেণীবিভাগগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে হওয়ায় বিষয়টি আরো জটিল করে তুলেছে। যেমন ৫০° অক্ষাংশে যখন হিমযুগ শেষ হয়ে হিমবিরতি শুরু হয়েছিল

তখনই ৬৫° অক্ষাংশে হিমযুগই অব্যাহত ছিল। তাই এ দুটি অক্ষাংশে একই সময়ে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু। হিমক্রিয়া মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে এসেছে। মেরু অঞ্চলের মতো হিমক্রিয়ার তীব্রতা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পৌঁছতে হয়তোবা কয়েক হাজার বছর পাড় হয়ে গেছে। তাই সকল অক্ষাংশে হিমক্রিয়া একই সময়ে সংঘটিত হয় নি।

ঐতিহ্যগতভাবে সূচক জীবাশ্ম বা নির্দেশক জীবাশ্ম দিয়ে সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। অমেরুদণ্ডী জীবের (invertebrate) মধ্যে এমন কোনো নির্দেশক জীবাশ্ম যায় না। হিমক্রিয়ার মোরেন, টিল বা টেরাস দিয়ে, প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন উপযুগের সীমারেখা নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সামুদ্রিক অবক্ষেপ এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে কারণ সমুদ্রে বিরতিহীনভাবে পলি পাললিত হয়।

বাংলাদেশের প্রবীণ ভূতত্ত্ববিদরা বলেন (অবশ্য ধারণাপ্রসূত, গবেষণামূলক উপাত্ত তাঁদের নেই) কোয়াটারনারি যুগ ১.৬ মিলিয়ন বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে, বেলজিয়ামে ১.৮ মিটার এবং হল্যান্ডে ২.৫ মিটার বছর পূর্বে থেকে কোয়াটারনারির যুগের যাত্রা। তাহলে কোনটি ঠিক? পুরাজীবীয় বা মধ্যজীবীয় মহাযুগের যুগগুলোর স্থিতিকাল এত লম্বা যে সীমারেখার অবস্থান এক বা দেড় মিলিয়ন বছর কমবেশি হলেও চোখে ধরা পড়ে না। সেক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে বয়স নির্ণয় করলে ব্যবধান অনেকই হতে পারে। কিন্তু কোয়াটারনারির বয়সই যখন দুই আড়াই মিলিয়ন বছর তখন এক মিলিয়ন বছর ব্যবধান গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হতে পারে না। তাহলে কোয়াটারনারির বয়স কত?

ইতঃপূর্বে আমরা আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক মহাসম্মেলনের (International Geological Congress) সিদ্ধান্তের কথা বলেছি। ইতালির সান্তা মারিয়া ডিকাটেনজারোকে ক্যালাব্রিয়ান সোপানের নমুনাস্তর (type section) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সেখানে মলাস্কা সাইপ্রিনা ইসলান্ডিকা এবং ফোরামিনিফেরা হিয়ালিনা বালথিকার উপস্থিতিকে কোয়াটারনারির আগমন বললেও এ দুটি জীবাশ্ম নির্দেশক জীবাশ্ম নয়। পৃথিবীর সকল স্থানে এ দুটি জীবাশ্ম সংবলিত স্তরকে নিম্ন প্লেইস্টোসিন বলা যায় না। এমতাবস্থায় সূক্ষ্ম জীবাশ্মের গোষ্ঠী থেকে এমন জীবাশ্ম খুঁজে বের করা দরকার যার **'প্রথম আগমনের তারিখ** (First appearance datum-FAD) কোয়াটারনারি যুগ শুরু কালীন সময়ের সাথে মিলে যায়। অথবা এমন জীবাশ্ম খুঁজে বের করা দরকার যার **শেষ আগমনের তারিখ** (Last appearance datum-LAD) কোয়াটারনারির ভিত্তি রচনা করে। প্রথম আগমনের তারিখের অর্থ হচ্ছে শৈলস্তরতত্ত্বের যে স্তরে ঐ জীবাশ্ম প্রথম দেখা যায়। শেষ আগমনের তারিখও তেমনি ; যেমন কোনো স্তরে ঐ জীবাশ্ম পাওয়ার পরে উপরের স্তরগুলোতে ঐ জীবাশ্মটি আর দেখা যায় না।

কিছু সূক্ষ্ম সামুদ্রিক জীবাশ্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্লায়ো-প্লেইস্টোসিনের সীমারেখা ১.৬ মিলিয়ন বছর বপ (বপ-বর্তমান থেকে পূর্বে BP-Before Present) বলার সপক্ষে যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। এ সময় রেখা কোনো জীবাশ্মের আগমন বা প্রস্থান নির্দেশ করে না। সুতরাং এ সীমারেখা পুরাজীবতত্ত্বের (Paleontologic) উপর ভিত্তি করে নয় তবে এই সময় রেখা অলদুভাই সিরা মেরু ঘটনার (Olduvai normal polarity event) উপরের সময়কে নির্দেশ করে।

প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন সীমারেখা ১.৮ মিলিয়ন বছর বপ রাখার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ১.৮ মিলিয়ন বছর বপ সময়রেখা অনেক সূক্ষ্ম জীবাশ্মের আঞ্চলিক সীমারেখা নির্দেশ করে (চিত্র ১.১২)। যেমন ব্লোর জীবাশ্ম অঞ্চল নং ২১ ও ২২ এর সংযোগ স্থল ১.৮ মিলিয়ন বছর বপ সময়রেখা। জীবাশ্ম অঞ্চল নং ২১ এর প্রতিনিধিত্বকারী

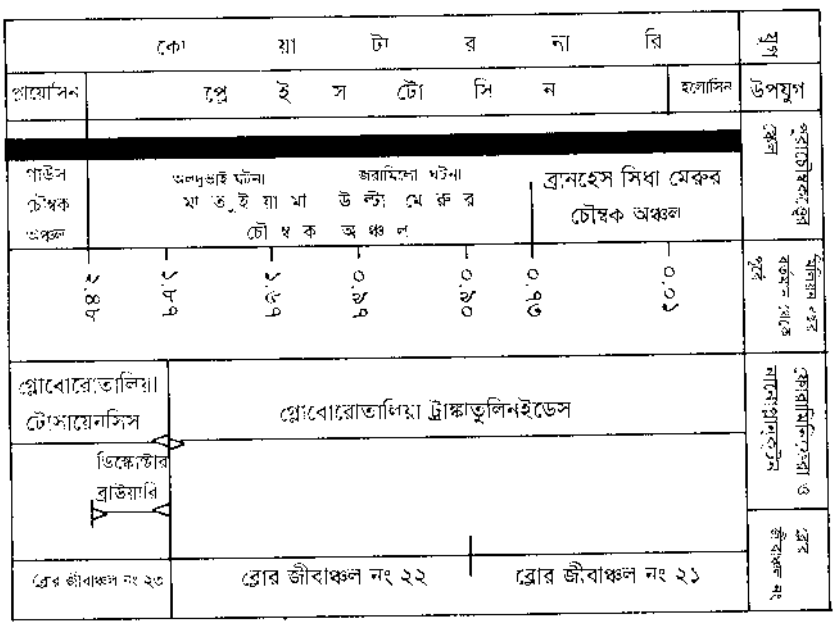

চিত্র ১.১২ : চৌম্বক স্তরায় সময় মাপনী ও জীবাশ্মাঞ্চলের মধ্যে পারস্পর্য।

ফোরামিনিফেরা জীবাশ্ম গ্লোবোরোটালিয়া টোসায়েনসিস (Globorotalia Tosaensos) এর শেষ আবির্ভাবের তারিখ ১.৮ মিটার বছর বপ। অন্যদিকে ফোরামিনিফেরা গ্লোবোরোটালিয়া ট্রানকাতুলিনইডেস (Globorotalia Trancatulinoides) এর প্রথম আবির্ভাবের তারিখ ১.৮ মিঃ বছর বপ। আবার ন্যানোপ্লাঙ্কটন (Nannoplankton)

ডিস্কোস্টার ব্রাউরি (Discoaster Brouweri) ও সুডো এমিলিয়ানিয়া ল্যাকানোসা (Pseudoemiliania Lacunosa) এর যথাক্রমে শেষ ও প্রথম (LAD and FAD) আবির্ভাবের সময়রেখাও ১.৮ মিটার বছর বপ।

এই সময়রেখাটির সাথে আবার পৃথিবীর পুরাচৌম্বকত্বের একটা সম্পর্ক আছে। অলদুভাই সিদা মেরু ঘটনাটির নিম্ন সময়রেখা হলো ১.৮ মিটার বছর বপ। সুতরাং প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন উপযুগের সীমারেখা ১.৮ মিলিয়ন বছর বর্তমান থেকে পূর্বে রাখার যুক্তি জোরালো বটে।

নেদারল্যান্ডের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জাকভেন (Zagwijn) প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন সীমারেখা ১.৮ মিটার বপ রাখার সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। টিবার সীমারেখা তার এ যুক্তির সাক্ষ্য বহন করে। ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি যে, প্লায়োসিনের শেষে একটি ঠাণ্ডা চক্রের আগমনে নেদারল্যান্ডের সেকুইয়া, নিসা, ট্যাক্লোডিয়াম, সিয়াডোপিটিস ইত্যাদি গাছপালার প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। সামুদ্রিক স্তরক্রমে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা থেকে এলফিডিয়াম হানই (Elphudium Hannoi) নামক ফোরামিনিফেরার একটি প্রজাতির সংখ্যা উপরের দিকে বেড়ে যায়। ইতঃপূর্বে প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন সীমারেখা এখানে রাখারই প্রস্তাব ছিল। এই সীমারেখাটি এলফিডিয়েল্লা হানই-ক্রিবোনোনিয়ান এসকাভাটাম (Elphidiella Hannoi-Cribrononian Excavatum) জীবাশ্ম অঞ্চলের সাথে মিলে যায়। বর্তমানে প্রয়োটিগনিয়ানের নিচের অংশ এলফিডিয়াম ওরিগোনেনস (Elphidium Origonense) নামক সংকীর্ণ জীব অঞ্চলের গোড়ার সাথে মিলে যায়। এলফিডিয়াম ওবিগোনেনস মেরু প্রজাতি যেগুলো এখন বেরিং প্রণালীতে পাওয়া যায়। প্লায়ো-প্লেইসটোসিন সীমারেখাটি অ্যামোনিয়া কুইনকুয়েলোকুলিনা (Ammonia Quincueloculina) নামক প্রজাতির প্রথম আগমনের তারিখের সাথে মিলে যায় (সারণি ১.৭)। এই সীমারেখাটি আবার দুটি প্রজাতির উপ-অঞ্চলের শেষ আগমনের সময়রেখার সাথে মিলে যায়। সংকীর্ণ উপ-অঞ্চল দুটি হলো : বুসেল্লা-ক্রিব্রনোনিয়াম (Bucella Cribrononian) এবং ক্যাসিডুলিনা-বুলিমিনা (Cassidulian Bulimina)।

প্লায়োসিন	প্লেইসটোসিন
এলফিডিয়েল্লা হানাই - ক্রিব্রোনোনিয়ান এক্সকাভাটাম	
বুসেল্লা - ক্রিব্রোনোনিয়ান	অ্যামোনিয়া - কুইনকুয়েলোকুলিনা
ক্যাসিডুলিনা - বুলিমিনা	

সারণি ১.৭ : ফোরামিনিফেরার উত্তর ভিত্তি করে প্লায়ো-প্লেইস্টোসিন সীমারেখা। (সূত্র : বোখেন, ১৯৭৮)।

হৈমিক ও হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলের ভূতত্ত্ব (Geology of the Glacial and Periglacial Area)

অনেকেই কোয়াটারনারি ভূতত্ত্বকে হৈমিক ভূতত্ত্ব বলে অভিহিত করে থাকেন। তাঁদের এ যুক্তিটি ফেলে দেবার নয়। কোয়াটারনারির প্রধান বৈশিষ্ট্যই তো হিমক্রিয়া। আর এ বৈশিষ্ট্য প্রথমেই পরিলক্ষিত হয় উচ্চাক্ষাংশে। সেখানে হিমক্রিয়াজনিত ভূরূপ বা ভূস্তরের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষণীয়।

কোনো এলাকার কোয়াটারনারির ভূতত্ত্ব জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে এলাকাটি বরফে ঢাকা ছিল কিনা বা এলাকাটিতে হিমক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা। হিমক্রিয়ার প্রভাবে ভূস্তরে যে পরিবর্তন হয় তা থেকেই বলা যায় এলাকাটি হিমাবৃতাঞ্চল (Glacial) কিংবা হিমানাবৃতাঞ্চল (Nonglacial) অথবা হিমসান্নিগ্ধাঞ্চল (Periglacial) ছিল। আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক হলেও খুব সংক্ষিপ্ত আকারে অতি প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পরিবেশিত হলো।

হিমাবৃতাঞ্চল (Glacial Area)

প্রথমেই আমরা হিমাবৃতাঞ্চলের পলি ও ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করছি।

পলি : (ক) অস্তরীভূত (unstratified)। উদাহরণ : হিমকর্দ (Till)।

(খ) স্তরীভূত (stratified) :

১। হিমসংলগ্ন অবক্ষেপ (Ice-contact deposits),

২। হিমবাহমুখী অবক্ষেপ (Proglacial deposits) উদাহরণ : হিমান্ত পলিভূমির বালি ও কাঁকর (Outwash sand and gravel) এবং ভার্বকদর্ম (Varve clay)।

ভূমিরূপ : ১। মোরেন : ভূমোরেন (Ground moraine), শেষ মোরেন (End moraine), পার্শ্ব মোরেন (Lateral moraine) ইত্যাদি।

২। হিমসান্নিগ্ধের মুখাবয়বসমূহ (Ice-contact features)।

৩। হিমবাহমুখী মুখাবয়বসমূহ, হিমান্ত পলিভূমি (Outwash plain), উপত্যকা খাদ (Valley trains)।

পলি : (ক) অস্তরীভূত

হিমকর্দ : হিমবাহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবক্ষেপ হলো হিমকর্দ। হিমকর্দের আকার ও আয়তন বিভিন্ন প্রকার। সূক্ষ্মতম কাদামাটি থেকে বড় বড় বোলডার পর্যন্ত হিমকর্দে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই হিমকর্দের অবক্ষেপগুলো অস্তরীভূত ও অবাছাইকৃত (unsorted)। চলমান হিমবাহ মূল শিলাস্তর (bed rock) থেকে সকল প্রকার এবং সকল আয়তনের শিলাখণ্ড বা শিলাচূর্ণ (rock flour) নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অনেক

সময়েই হিমবাহিত শিলাখণ্ড (erratic block) রেখাঙ্কিত (striated)। হিমকর্দ নানা প্রকার হতে পারে (চিত্র ১.১৩)। অস্থায়ী জমাট হিমকর্দের (lodgement till) জঞ্জালে (debris) ভরপুর বরফ যখন গলতে থাকে তখন হিমবাহের নিচে অস্থায়ী জমাট হিমকর্দ জমা হতে থাকে। সম্মুখে অগ্রসরমান হিমবাহে জঞ্জালের আধিক্যে চাপজনিত কারণে চাপ-গলনের (pressure melting) ঘটনা ঘটে এবং হিমকর্দ হিমবাহের নিচে প্রতিস্থাপিত হতে থাকে।

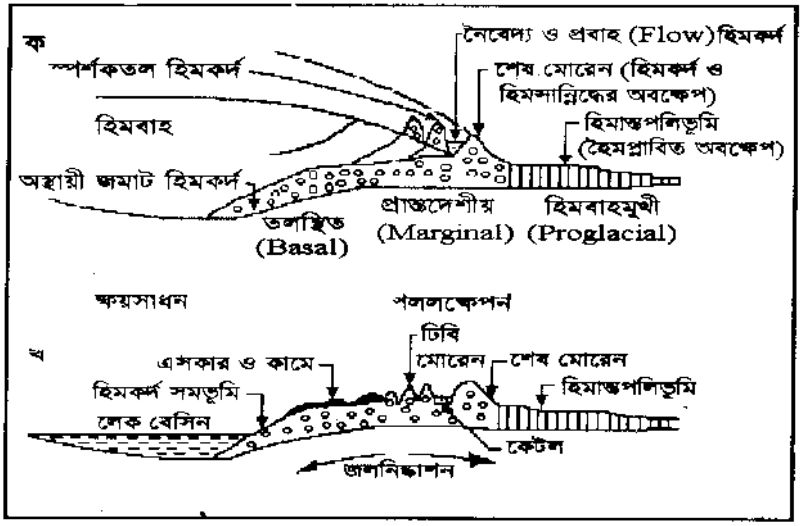

চিত্র ১.১৩ : হিমাবস্থানকালীন এবং হিমবাহের পশ্চাদমুখীতার সাথে সম্পর্কযুক্ত মুখাবয়ব।

আর এক প্রকার হিমকর্দ দেখা যায় যাকে নৈবেদ্য হিমকর্দ (oblation till, চিত্র ১.১৩) বলা হয়। এগুলো হিমবাহের উপরে বা সামান্য ভিতরে জমা হয়। উপত্যকা হিমবাহের (valley glacier) উপরে সাধারণত পার্শ্ববর্তী ভূপৃষ্ঠ থেকে শিলাখণ্ড জমা হতে থাকে। কোনো কোনো নৈবেদ্য হিমকর্দে সূক্ষ্ম পলিকণা থাকে না, কারণ সেগুলো হিমবাহপৃষ্ঠে প্রবাহিত স্রোত ধারা অপসারিত হয়ে যায়। স্পর্শকাতর হিমকর্দ (shearplane till) হিমবাহের স্পর্শকতল বরাবর ঢিবি আকারে দেখা যায়।

হিমকর্দে যে সকল হিমবাহিত শিলাখণ্ড পাওয়া যায় তা থেকে সহজেই শিলাখণ্ডের উৎস বা হিমবাহ চলার দিক সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অবশ্য যে সকল স্থান বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার হিমাবৃত ছিল সে সকল স্থানের হিমবাহিত শিলাখণ্ড বা হিমকর্দ দিয়ে শিলার উৎস নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ পূর্ববর্তী হিমবাহিত শিলাখণ্ড পরবর্তী হিমবাহে অন্যদিকে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিলাখণ্ডের রেখাঙ্কন হিমবাহের দিক নির্ণয় করে। হিমবাহিত শিলাখণ্ডের বিলেখন (striation) সাধারণত শিলাখণ্ডের লম্বাক্ষ বরাবর

সমান্তরাল থাকে। আর এই হিমবাহিত শিলাখণ্ডের বিলেখন বা লম্বাক্ষই হিমবাহের গতির দিক নির্দেশ করে। ভূতাত্ত্বিক কম্পাসের মাধ্যমে ২ সে. মি. চেয়ে বড় আকারের প্রায় ১০০ হিমবাহিত শিলাখণ্ডের লম্বাক্ষের দিক মেপে হিমবাহের গতির দিক নির্ণয় করা সম্ভব। হিমবাহিত শিলাখণ্ডের নতি (dip) মেপে দেখতে হবে অবক্ষেপগুলো মৃত্তিকাবাহিত (solifluction) বা ঠাণ্ডায় উলোটপালট (cryoturbation) কিনা। যদি সকল শিলাখণ্ডে নির্দিষ্ট নতি পরিলক্ষিত হয় তবে হিমকর্দের সূক্ষ্মচ্ছেদে ছোট ছোট কণাগুলো নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করে। খালি চোখে হিমকর্দ অগাঠনিক (structureless) দেখা গেলেও সূক্ষ্মডোরা (band), ফলায়ন (lamination) বা তীব্র মোচড় (contortion) সূক্ষ্মচ্ছেদে লক্ষণীয়।

(খ) স্তরীভূত অবক্ষেপ (Stratified Deposits)

১। **হিমসংলগ্ন অবক্ষেপ :** এ অবক্ষেপগুলোর অবস্থান অবাছাইকৃত হিমকর্দ ও সুন্দর বাছাই ও ভাল স্তরীভূত হিমান্ত পলিভূমির অবক্ষেপের মাঝামাঝি। এ সকল অবক্ষেপের আয়তন ও বাছাইতে মাঝে মাঝে আকস্মিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

২। **হিমবাহমুখী অবক্ষেপ** (Proglacial Deposits) : হিমবাহ হিমরেখা বরাবর গলতে থাকে। হিমাগ্রভাগের বরফ গলা পানি হিমান্ত পলিগুলোকে বয়ে নিয়ে যায় সুদূর ঢালে (distal slope) (চিত্র ১.১৪)। হিমবাহমুখী অঞ্চলের ভূরূপ ও পললক্ষেপণের

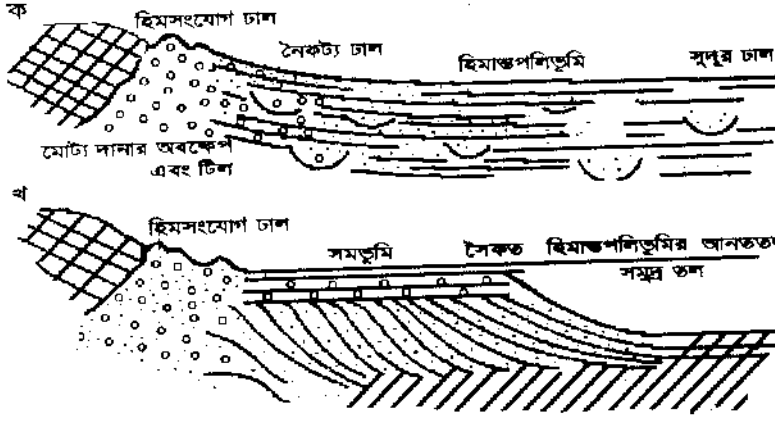

চিত্র ১.১৪ : হিমবাহমুখী ভূমিরূপ ও অবক্ষেপ ।
(ক) একটি হিমান্ত সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রস্থচ্ছেদ,
(খ) একটি সুদূর বদ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রস্থচ্ছেদ।

ধারাবাহিকতা সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। হিমবাহের সামনে হিমরেখার কাছে থাকে বড় বড় হিমবাহিত শিলাখণ্ড। শিলাখণ্ডের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা ভর্তি হয় ছোট কণার বালি বা কাদা দ্বারা। এ সকল অবক্ষেপ জমে ঢিবি আকারে জমা হয়, যাকে বলা হয় হিম সংলগ্ন ঢাল। তারপর অপেক্ষাকৃত ছোট কণার অবক্ষেপ দেখা যায়, যাকে নৈকট্য (proximal) ঢাল বলে। তারপর আসে হিমান্ত সমভূমি। স্তরীভূত বালি ও কাদার সংমিশ্রণ এ অংশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঠাণ্ডা পানির স্রোতধারা হিমান্ত সমভূমির উপর দিয়ে কুলুকুলু রবে বয়ে যায়। দিবারাত্রের তাপমাত্রার তারতম্যে প্রায়ই নদীর পানি জমে যায় এবং সহসা ছোট্ট নদী দিক পরিবর্তন করে বা এঁকে-বেঁকে যায়। এমন হিমান্ত সমভূমিকে অনেক সময় স্যান্ডার (Sandur) বলা হয়। ধীর ঢালু এলাকায় অনেক সময় স্থানীয় পানিতল থেকে অবক্ষেপগুলো উপরেই পাললিত হয়। এগুলোকে হৈমপ্লাবিত অবক্ষেপ বলে (Glaciofluvial deposits)। হিমান্ত পলিকণা যদি সরোবরে বা সমুদ্রে পাললিত হয় তবে তাদের যথাক্রমে হৈমহ্রদ (Glacio-lacustrine) বা হৈমসামুদ্রিক (Glaciomarine) অবক্ষেপ বলে। কোথায় কি আয়তনের পলি জমা হবে তা প্রথমত, নির্ভর করে পলি কি দিয়ে ভরপুর : যথা : নুড়িপাথর, বালি বা কাদা। দ্বিতীয়ত, নির্ভর করে হিমরেখা থেকে কতদূরে অবক্ষেপিত হচ্ছে। তাই মোটা দানার উৎস হিমরেখার কাছাকাছি এবং সূক্ষ্মকণা পাললিত হবে স্রোতের নিম্নাঞ্চলে (চিত্র ১.১৪)। হিমবাহমুখী অঞ্চলে যেখানে বরফ গলা পানি হ্রদে প্রবাহিত হয় সেখানে পাতলা স্তরীভূত কাদা দেখা যায় যাকে ভার্ব কাদা (Varve clay) বলে। গ্রীষ্মকালের বরফ গলা পানির পরিমাণ বেশি। তাই গ্রীষ্মকালের বরফ গলা পানির খরস্রোতে কিছুটা মোটা কণার পলি নিকটস্থ হ্রদে পাললিত হয়। পলল ক্ষেপনের সাধারণ নিয়ম (মোটা দানা প্রথমে বা নিচে ও শেষে সূক্ষ্ম দানা বা উপরে) অনুসারেই পাললিত হতে থাকে। গ্রীষ্মকাল শেষে শীতকাল আসে। বরফ গলা পানির পরিমাণ কমে যায়। আর জলবাহিত পলির আকারও ছোট হয়। শীতকালের পলির এ সকল সূক্ষ্মকণার আরো একটি স্তর হ্রদে গ্রীষ্মকালের স্তরের উপরে প্রতিস্থাপিত হয়। আবার গ্রীষ্মকালের মোটা পলির স্তর শীতকালের সূক্ষ্ম পলির উপর স্তরীভূত হতে থাকে। এভাবে শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকালের পলিস্তরের তীক্ষ্ম ব্যবধান এবং গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকালের পলির স্বাভাবিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পলিস্তর পার্থক্যের তীক্ষ্ণ রেখা এক বছর ইঙ্গিত করে। এভাবেই হিমবাহমুখী অঞ্চলের হৈমহ্রদ অবক্ষেপের পলিস্তরের তীক্ষ্ণরেখা গণনা করে মাটির বয়স নির্ণয় করা হয়। স্বাদুপানির ভার্ব কাদার শীত ও গ্রীষ্মকালীন স্তরীয় পার্থক্য রেখা যত প্রকট, লবণ পানির বেলায় সূক্ষ্ম কণার আকর্ষণজনিত (Flocculation)কারণে পার্থক্যটা এতটা প্রকট নয়।

ভূমিরূপ (Landform)

মোরেনের ভূমিরূপ : হিমবাহ যে সকল মোরেন বয়ে নিয়ে আসে সেগুলো বরফ গলে যাওয়ার পর স্তূপাকারে জমা হতে থাকে। মোরেন দ্বারা গঠিত ভূপৃষ্ঠকে অনেক সময়

হিমকর্দ পৃষ্ঠ বা ভূমোরেন পৃষ্ঠ বলা হয়। একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিরূপ হলো ড্রামলিন (Drumlin)। ড্রামলিন হলো শেষ মোরেনের পেছনে অনেকটা স্রোতরেখার মত অপ্রতিসম (asymmetrical) টিলা। ড্রামলিনের আকার আয়তন বিভিন্ন রকম : ১০০ থেকে ২০০০ মিটার লম্বা এবং ৫০ থেকে ৫০০ মিটার চওড়া। আর এগুলোর উচ্চতা ৫ থেকে ৬০ মিটার। ড্রামলিন অস্থায়ী জমাট হিমকর্দ দিয়ে গঠিত। হামোকি (Hummocky) বা ঢিবি হলো শেষ মোরেনের আর একটি ভূমিরূপ। হিমবাহের কিনারা যদি অনেকদিন একই অবস্থানে থাকে তবে সেখানে হিমকর্দ ও নানা প্রকার হিম সংলগ্ন পলি জমা হতে থাকে। হিমবাহ যদি কোনো হ্রদে বা সাগরে পতিত হয় তবে তার শেষ মোরেনের পলিগুলো স্তরীভূত হয়ে অনেকটা বদ্বীপের রূপ নেয়।

হিম সংলগ্ন ভূমিরূপ : হিম সংলগ্ন ভূমিরূপের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো ১.১৫ চিত্রে দেখানো হলো। হিমবাহ দ্বারা গঠিত স্তরীভূত পলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ হচ্ছে :

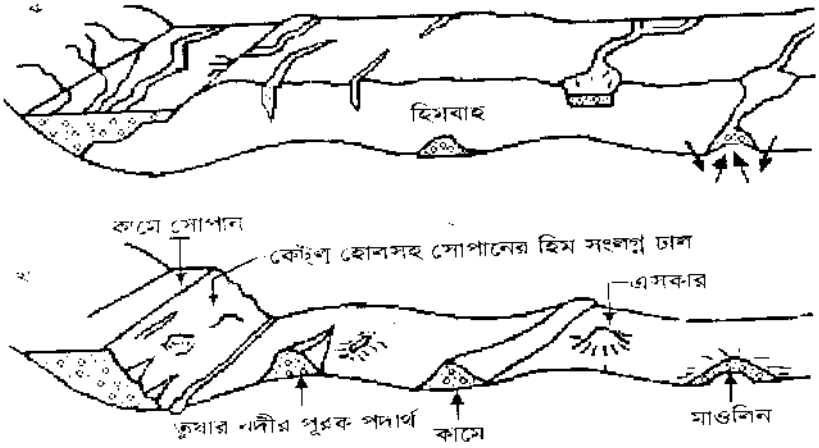

চিত্র ১.১৫ : হিম-সংলগ্ন স্তরীভূত অবক্ষেপের বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ।

এসকার (Esker) বা কাঁকর গঠিত শৈলশিরা, কামে (kame) বা নিম্ন শৈলশিরা, কামে সোপান (Kame terrace) বা হিম সংলগ্ন ঢালু সোপান। হিমবাহের উপরে প্রবাহিত গলাজলের (Meltwater) ছোট্ট নদীর অবক্ষেপগুলো দিয়েই এসকার গঠিত হয়। বরফ গলে যাবার পর এ সকল অবক্ষেপ লম্বা শৈলশিরা (ridge) আকারে রয়ে যায়। এ সকল শৈলশিরাকেই এসকার বলা হয়। এগুলোর উচ্চতা প্রায় ১ থেকে ৩০ মিটার এবং ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রায় কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। স্থানীয়ভাবে এসকার সাধারণত হৈমস্রোত বরাবর সমান্তরাল থাকে। আর উপত্যকায় এসকারগুলো সাধারণত উপত্যকা

বরাবর থাকে। এসকারের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হিমবাহ বিস্তৃতিকালীন সময়ে এগুলো তৈরি হয় না। বরফের স্থিতাবস্থা বা হিমবাহ গলে পাতলা হওয়ার সময়কালকেই এসকার নির্দেশ করে।

কামে সোপান সাধারণত বরফের পার্শ্বে প্রবাহিত ছোট্ট নদী দ্বারা তৈরি হয়। বরফ গলে গেলে অবক্ষেপগুলো হিমসংলগ্ন ঢাল তৈরি করে যা হিমবাহের পূর্বাবস্থান নির্দেশ করে। কামেগুলো সাধারণত বিচ্ছিন্ন টিলা, পার্শ্ব খুবই খাড়া। হিম সংলগ্ন স্তূপের অবক্ষেপ দিয়েই কামে তৈরি। অনেক সময় কামে ক্রীভাস (Crevasse) বা তুষার ফাটলে জমাকৃত অবক্ষেপ দ্বারা গঠিত। বরফ গলে গেলে সেগুলো অনতিদীর্ঘ শৈলশিরা আকারে দেখা যায়।

হিমসান্নিগ্ধাঞ্চল (The Periglacial Zone)

বর্তমানে উচ্চাক্ষাংশে বা নিম্নাক্ষাংশের উঁচু পার্বত্য এলাকায় হিমক্রিয়াজনিত মৃত্তিকা বা মৃত্তিকাবাহ পরিলক্ষিত হয়। হিমযুগেও এমন ঘটনা ঘটেছে মধ্যম অক্ষাংশের বিশাল এলাকায়। হিমস্তরের আগমন ও প্রস্থানের প্রান্তিক এলাকার মৃত্তিকায় পরিলক্ষিত হয় বিশেষ বিশেষ দৃশ্যাবলী। হিমযুগে প্রান্তিক এলাকার মাটিতে যে জল কণা থাকে তা জমে যায়। ফলে মৃত্তিকার আসল বৈশিষ্ট্য বদলাতে থাকে। হিম প্রান্তিক এলাকায় বায়ুপ্রবাহ বা ধূলিঝড়ে অবক্ষেপণ হয় লোয়েস বা বিশেষ ধরনের বালিকণা। প্লেইসটোসিন উপযুগের মধ্যমাক্ষাংশের হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলের এ সকল মুখাবয়ব এখন মৃত হলেও বর্তমানের উচ্চাক্ষাংশের হৈম প্রান্তিক এলাকা বা হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলে এখনও বিদ্যমান। হিম সান্নিগ্ধাঞ্চল বলতে ঐ এলাকাকে বুঝায় যে এলাকা হিমাকৃত নয় অথচ হিমবাহ বা হিমস্তর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। হিমবাহ বা হিমস্তরের সামনে বিশাল একটি এলাকা থাকে যে এলাকার তাপমাত্রা খুবই কম থাকে। গাছপালা থাকে না বা থাকলেও ক্ষুদ্রাকৃতির দু'একটি। অতি ঠাণ্ডায় মাটির ভেতরে পানির কণা জমে বরফ হয়ে থাকে। সে এলাকাকে চিরতুষার ভূমি (Permafrost) এলাকা বলা হয়। সাইবেরিয়ার বিশাল একটি অংশ এখন চিরতুষার ভূমি। হিমযুগে ইউরোপের বিশাল একটা অংশ যখন বরফে ঢাকা ছিল তখন বেলজিয়ামের বিশাল এক এলাকা ছিল হিমসান্নিগ্ধাঞ্চল। মৃত্তিকা ছিল চির তুষার ভূমি আকারে। হিমসান্নিগ্ধের দু'ধরনের প্রভাব হতে পারে, (১) তাপমাত্রার তারতম্যে মাটির ভেতরে পানির কণা জমে মাটি বরফে পরিণত হয় এবং তাপমাত্রা বাড়লে তা আবার গলে যায়। তাপমাত্রার এ তারতম্যের হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলে মৃত্তিকাবাহ মৃত্তিকার গঠন এবং ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়।

হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলের অবক্ষেপগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : (১) অবাছাইকৃত এবং (২) বাছাইকৃত।

(১) অবাছাইকৃত অবক্ষেপ : মৃত্তিকাবাহ হলো অবাছাইকৃত অবক্ষেপের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মৃত্তিকাবাহ শুধু হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলেই দেখা যায় না ; নিরক্ষীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও দেখা যায়। তবে ব্যাপকভাবে হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলেই দেখা যায়। মাটির ভিতরে

পানির কণা জমে মাটির সান্দ্রতা (viscosity) বেড়ে যায় এবং তা কিছুটা ঢালু জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ঢালের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলে উপরের মাটি সাধারণতে অজমাট (unconsolidated) থাকে। শীতকালে মাটি জমে বরফাকারে থাকে। বসন্তকালে মাটি যখন উপর থেকে গলতে থাকে তখন নিচের মাটি বরফাবস্থাতেই থাকায় উপরে সদ্য গলিত মাটির পানি চুয়ায়ে নিচে যেতে পারে না। ফলে পানিকণা দ্বারা উপরের নরম মাটির সান্দ্রতা বাড়তে থাকে এবং ঢালু জায়গা হলে (এমনকি ২° থেকে ৫° হলেও) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ঢালের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। মাটির এ ধরনের প্রবাহকে মৃত্তিকাবাহ (solifluction) বলে। মৃত্তিকাবাহে শিলার লম্বাক্ষ মৃত্তিকাবাহের গতির দিকের সাথে সমান্তরাল থাকে এবং লম্বাক্ষের নতি ঢালের পরিমাণ নির্দেশ করে।

পুরাকালীয় হিমকর্দ থেকে মৃত্তিকাবাহের অবক্ষেপের পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন। মৃত্তিকাবাহের অবক্ষেপ সাধারণত ঢালের উপরে পাতাকারে (sheet), খণ্ডাকারে (as lobe), পাখাকারে (as fan) বা প্রস্তর স্রোতাকারে দেখা যায়। এ ছাড়াও শিলার লম্বাক্ষ ঢালের দিকে নত থাকে। আর এগুলোর উৎসস্থল খুব কাছাকাছি থাকে।

মৃত্তিকাবাহ দু'ধরনের : (১) আলোড়িত প্রবাহ (turbulent flow) যার পুরুত্ব অনেক বেশি এবং সবকিছুই বিশৃঙ্খল ; এবং (২) স্তরীত প্রবাহ (laminar flow), ক্ষুদ্রাকৃতির ; যেগুলো ঢালের দিকে পাতলা সুতার মতো রেখাকৃতির। মৃত্তিকাবাহের তীব্রতা সাধারণত ঢালের নতি, শিলার প্রকৃতি, ঠাণ্ডা-গরমে জমে যাওয়া এবং গলনের চক্রকালের উপর নির্ভর করে। দিবারাত্রির তাপমাত্রার তারতম্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির মৃত্তিকা প্রবাহের সৃষ্টি করে।

বাছাইকৃত অবক্ষেপ (Sorted deposits) : (ক) বায়ুবাহিত অবক্ষেপ (Aeolian deposits) : হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবক্ষেপ হলো বায়ুবাহিত অবক্ষেপ। ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও জার্মানির একটি বিরাট এলাকা জুড়ে আছে কোয়াটারনারির হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলের বায়ুবাহিত অবক্ষেপ। চীনের বায়ুবাহিত অবক্ষেপ সমৃদ্ধ 'লোয়েস মালভূমির' কথা অনেকেই জানে। সে লোয়েস মালভূমিতে বায়ুবাহিত অবক্ষেপের পুরুত্ব প্রায় ১০০ মিটার। হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলের বায়ুবাহিত অবক্ষেপের প্রধান প্রধান উৎসস্থল হলো : হিমযুগে সদ্য উন্মুক্ত নদী, উপত্যকা, হিমান্ত পলিভূমি, শুষ্ক হ্রদ বা সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নামায় সমুদ্র তীরবর্তী জেগে উঠা বিশাল এলাকা। হিমযুগে সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নামায় অগভীর উত্তর সাগরের (North Sea) বিরাট অংশ শুকিয়ে যেত। তখন উত্তরের ঝড়ো হাওয়ায় উন্মুক্ত শুষ্ক সাগর থেকে বালিকণা বায়ু তাড়িত হয়ে উঠে আসত ইউরোপের বর্তমান স্থলভাগে। কোনো কোনো সময় হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলের মাটি চির তুষারাবস্থায় থাকতো। আর উপরে বইতে থাকতো প্রচণ্ড ধূলিঝড় (এখন যেমনটি দেখা যায় মরু অঞ্চলে)। হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলের এমন এলাকাকে বলা হয় 'মেরু মরুভূমি' (polar desert)। হিমবিরতির বিশাল প্রশস্ত নদী হিমযুগে হয়ে যেত শীর্ষকায়। নদী উপত্যকার বিশাল এলাকা শুকিয়ে চৌচির হয়ে যেত। আর সামান্য বায়ু প্রবাহেই শুরু হতো ধূলিঝড়। স্থলভাগের গভীরের দেশগুলোতে এ ঘটনাই ঘটতো।

পলির আকার অনুসারে সাধারণত তিন ধরনের বায়ুবাহিত অবক্ষেপ দেখা যায়। যথা : (১) লোয়েস (Loess), (২) লোম (Loam, সারমাটি) এবং (৩) আবরণ বালি (cover sand)। লোয়েস প্রধানত সিল্ট (silt বা পলি)। পক্ষান্তরে আবরণ বালি মিহি (fine) থেকে মোটা (coarse) বালিকণা। কাদা, সিল্ট ও বালির সমন্বয়ে গঠিত হয় লোম।

অবভূমি (depression) বা জলাশয় ছাড়া অন্য কোথাও স্তরীভূত লোয়েস দেখা যায় না। লোয়েসের কণাগুলো সাধারণত কোয়ার্টিজের। কণাগুলোর আকার অনেকটা উৎসস্থলের উপর নির্ভর করে। উৎসের নিকটে বড় এবং দূরে ছোট কণা স্তরীভূত হয়। তেমনি উৎসের নিকটে লোয়েসের পুরুত্ব বেশি থাকে। যতই উৎস থেকে দূরে যাওয়া যায় ততই কমতে থাকে।

আবহাওয়াজনিত কারণে যে সকল স্তর অবিকৃত থাকে সে সকল স্তরের লোয়েসে কার্বনেট থাকে এবং এসিড সংযোগে বিক্রিয়া করে। কোথাও বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট সঞ্চিত হয়ে (segregation) গুটি বা অর্বদ (nodule) তৈরি করে। লোয়েস অবক্ষেপণ যদি অনেকদিন বন্ধ থাকে এবং আর্দ্র আবহাওয়া যদি বিরাজ করে তবে লোয়েস পৃষ্ঠ ক্ষয়সাধন (weathered) হয়। এতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। লোয়েস পৃষ্ঠে গাছপালা জন্মে। পরবর্তী আবহাওয়ার চক্রে ঐ মৃত্তিকা লোয়েসের পরবর্তী স্তরে চাপা পড়ে যায়। এমনি পুরামৃত্তিকার স্তরের উপস্থিতি কোয়াটারনারির লোয়েস ছেদনে (section) খুবই সাধারণ ঘটনা। ইউরোপের লোয়েস এলাকায় পুরামৃত্তিকার প্রচুর স্তর দেখা যায়। বেলজিয়ামের রুকোর ও ওয়ানেটেন পুরামৃত্তিকাদ্বয় উল্লেখযোগ্য। চীনের লোয়েস মালভূমিতে প্রচুর পুরামৃত্তিকাদ্বয় উল্লেখযোগ্য। চীনের লোয়েস মালভূমিতে প্রচুর পুরামৃত্তিকার স্তর দেখা যায়। কোয়াটারনারির লোয়েস অবক্ষেপের মধ্যে প্রচুর জীবাশ্ম বিশেষ করে স্তন্যপায়ী স্থলজন্তুর হাড়হাড্ডি পাওয়া যায়।

লোয়েস গঠনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আবহাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে গ্রীষ্মকালের শুষ্ক ও ঝড়ো হাওয়া অবশ্যই দরকার। হিমান্ত পলিভূমি থাকতে হবে স্বাভাবিক অবস্থায় ; তা বরফে জমে গেলে চলবে না। তাহলে ঝড়ো হাওয়ায় হিমান্ত পলিভূমি থেকে সহজেই বালিকণা উড়ে যেতে পারে।

নেদারল্যান্ডেই প্রথমে লোয়েস নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। নেদারল্যান্ডে লোয়েসের পুরুত্ব বেশ কয়েক মিটার। আবরণ বালির আকার ১০৫ থেকে ২১০ মাইক্রোন, অবশ্য এর চেয়ে মোটা ও মিহিও দেখা যায়। লোয়েস লোম ও আবরণ বালির মধ্যে লোম সবচেয়ে অবাছাইকৃত এবং আবরণ বালি কিছুটা বাছাইকৃত, লোয়েসের অবস্থান মাঝামাঝি।

আবরণ বালিতে পর্যায়িত (alternated) লোম ও বালির স্তরকে অনেকে নিভিও-বায়ুবাহিত (Niveo-colian) অবক্ষেপ বলে থাকেন। লোম বরফগলা পানিবাহিত এবং বালি বায়ুবাহিত অবক্ষেপ।

(খ) প্লাবনাবক্ষেপ (Fluviatile deposits) : প্লাবনের মাধ্যমে হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলে বাছাইকৃত অবক্ষেপ পাওয়া যায়। বরফ গলা পানি সাধারণত হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলে এমন অবক্ষেপণ করে। এ প্রক্রিয়াকে অনেকে নিভিও-প্লাবনাবক্ষেপ (Niveo-fluvial) বলে।

চিরতুষার ভূমি (Permafrost), **কালিয় হিম জমাট ভূমি** (Seasonal frozen Ground) **এবং সক্রিয় স্তর** (Active layer)

চিরতুষার ভূমি বলতে আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠের এমন একটি স্তরকে বুঝাবো যা সর্বদাই হিম জমাট অবস্থায় থাকে। বছরের পর বছর ধরে কোনো এলাকায় মাটির তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির (০° সেলসিয়াস) নিচে থাকলে সে এলাকার মাটি জমে বরফের আকারে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মাটির ভিতরে যে জলকণা থাকে সেটাই জমে বরফে রূপান্তরিত হয়। ফলে মাটি পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায় এবং কোদাল দ্বারা আঘাত করলে কোদাল মাটির নিচে প্রবেশ করে না। উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ চিরতুষার ভূমি। বর্তমানে সাইবেরিয়া ও আলাস্কাতে চিরতুষার ভূমির গভীরতা প্রায় ৩০০ মিটার। ১.১৬ চিত্রে অক্ষাংশ ভেদে বর্তমান তুষার ভূমির একটি খসড়া ছেদচিত্র দেয়া হলো। হিমযুগে মধ্য অক্ষাংশেও হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলে এমন চিরতুষার ভূমি দেখা যেত।

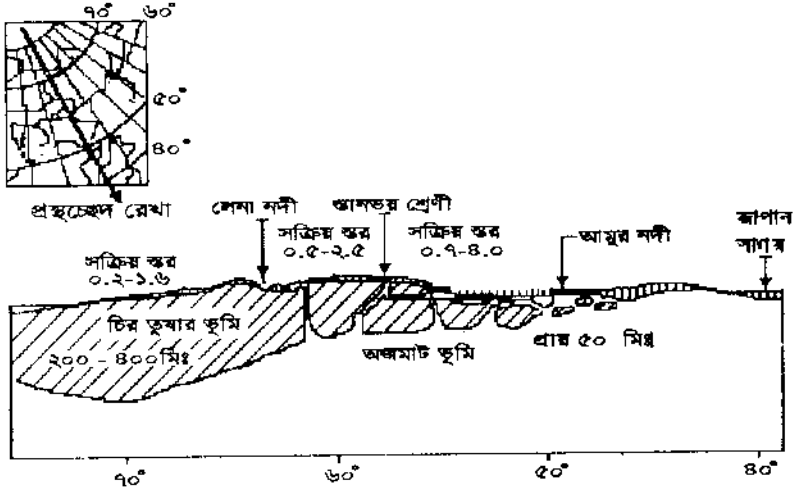

চিত্র ১.১৬ : সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে খসড়া প্রস্থচ্ছেদ। চিরতুষার ভূমি ও সক্রিয় স্তরের আনুপাতিক পুরুত্ব দেখানো হয়েছে (সূত্র : মুলার, ১৯৪৭)।

চিরতুষার ভূমি এলাকার পরেই পাওয়া যায় **কালিয় হিম জমাট ভূমি**। এই কালিয় হিম জমাট ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো শীতকালে মাটির ভিতরের পানি জমে মাটি হিম জমাট হয়

এবং গ্রীষ্মকালে তা গলে আবার নরম হয়। মাটির স্তরের যে অংশটি এমনি শীতকালে জমে যায় এবং গ্রীষ্মকালে গলে যায় সেই অংশটি বা স্তরকে বলা হয় **সক্রিয় স্তর**। ১.১৬ চিত্রে সক্রিয় স্তর দেখানো হয়েছে।

হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুখাবয়ব (Some important Features of Periglacial Zone)

আমরা আগেই বলেছি হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলের মাটি অত্যন্ত ঠাণ্ডায় বরফাকারে থাকে যাকে চিরতুষার ভূমি বলা হয়। মাটির ভিতরে যে পানির কণা থাকে তা জমে বরফাকারে থাকে। এই জমে যাওয়া বরফ হওয়া এবং পুনরায় বরফ গলে যাওয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ফলে মাটির গাঠনিক পরিবর্তন দেখা যায়। লোয়েস, লোম বা আবরণ বালিতে পানির কণা কম থাকে এবং বালি বা শিলার কণা বেশি থাকে। অন্যদিকে কাদাজাতীয় মাটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। ঠাণ্ডায় পানি জমে বরফ হলে বরফের আয়তন বেড়ে যায়, পক্ষান্তরে বালিকণা সঙ্কুচিত হয় এবং আয়তন কমে যায়। এভাবে মাটির বিভিন্ন স্তর (যেমন বালিস্তর বা কাদাস্তর) হিমের প্রভাবে একটি অন্যটির তুলনায় বেশি বা কম সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। ফলে প্রচণ্ড চাপে স্তরটিতে ভাঁজ পড়ে বা আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। হিমের প্রভাবে মাটির এমন গঠনকে ঠাণ্ডা উপদ্রুত বা ক্রাইয়োটারবেশন (Cryoturbation) বলে।

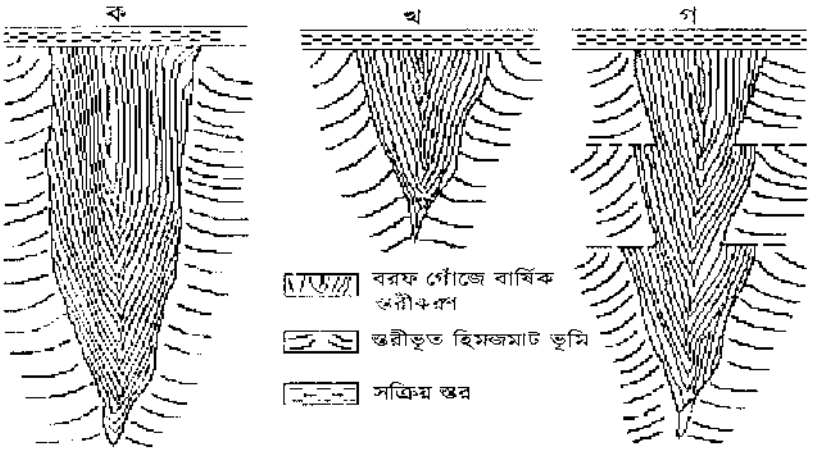

চিত্র ১.১৭ : খাড়া প্রস্থচ্ছেদে বরফ গোঁজের প্রকারভেদ (ক) সিনজেনেটিক গোঁজ, (খ) ইপিজেনেটিক গোঁজ, (গ) ইপিজেনেটিক গোঁজ, নতুন বৃদ্ধি দেখানো আছে।

হিম প্রভাবে হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলের মাটি চিরতুষার ভূমিতে রূপান্তরিত হলে মাটিতে ফাটল দেখা যায়। চৈত্র মাসে যেমন খালবিল, ডোবা, নালার কাদামাটি ফেটে চৌচির হয় তেমনটি ঘটে হিমসান্নিগ্ধাঞ্চলে। চিরতুষার ভূমি বহুভুজ আকারে (polygonal shape) ফেটে যায়। কোদাল দিয়ে লোয়েস বা আবরণ বালি যদি ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল করে ছেঁটে নেওয়া যায় তবে এমন বহুভুজাকৃতির ফাটল লোয়েস এলাকাতে দেখা যাবে। এমন দৃশ্য হিমযুগের আগমনের সাক্ষ্য বহন করে। এমন ফাটলের প্রস্থচ্ছেদকে বরফ গোঁজ বা তুষার গোঁজ (Ice-wedge or Frost wedge) বলা হয় (চিত্র ১.১৭)। বরফ গোঁজ বা তুষার গোঁজ হলো হিমযুগের নির্ণায়ক দৃষ্টান্ত (diagnostic feature)। কোনো মাটির স্তরে বরফ গোঁজ দেখলেই বুঝতে হবে এলাকাটি হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলে অথবা হিমাবৃত ছিল। হিম প্রভাবে মাটিতে যে গাঠনিক মুখাবয়ব (features) দেখা যায় তা ১.১৮ চিত্রে দেখানো হলো।

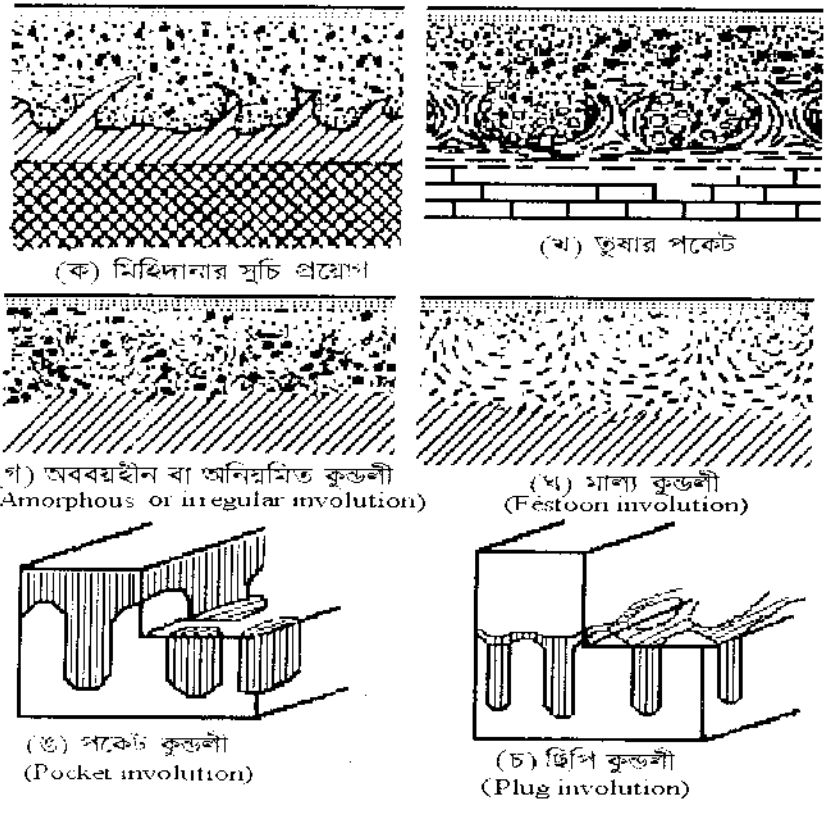

চিত্র ১.১৮ : বিভিন্ন প্রকার কুণ্ডলী।

১। **বরফ গোঁজ** (Ice-wedge) : তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বরফ যখন গলে যায় তখন মাটিও গলে যায়। তখন বরফ গোঁজের উপরের মাটি প্রথমে গলে ধসে নিচের ফাটলে পড়ে (চিত্র ১.১৭)। ফলে ফাটলটির চারপাশের স্তর সমান্তরাল স্তরের মধ্যেই দেখা যায় গোঁজ আকারে মিশ্রিত মাটির খাড়া বা তির্যক স্তর। সুতরাং বরফ গোঁজে গোঁজ হিসেবে খাড়া বা হেলানো স্তরবিশিষ্ট যে পলল দেখা যায় তা চারপাশের সমান্তরাল স্তরবিশিষ্ট পললের চেয়ে কমবয়সী বৈকি। গোঁজ দু'ধরনের হতে পারে :

(ক) সমজাত (syngenetic) (চিত্র ১.১৭ক) : এ গোঁজ ঠাণ্ডা ও উষ্ণ চক্রভেদে পলল ক্ষেপণের সাথে সাথে ঊর্ধ্বমুখে বড় হতে থাকে। প্রতি হিমচক্রে একই স্থানে ফাটল দেখা যায়। (খ) অসমজাত (epigenetic) (চিত্র ১.১৭খ)। এ ধরনের বরফ গোঁজে শুধু ফাটলটি পলল দ্বারা পূর্ণ হয়ে গোঁজ আকারে দেখা যায়।

২। **মিহিদানার সুচিপ্রয়োগ** (Injection of fine ediments) : উপরে মোটা দানার বালি এবং নিচে মিহিদানার পলি বা কাদার স্তর থাকলে হিম প্রভাবে জমে পলি বা কাদার স্তরের আয়তন বেড়ে যায়। ফলে মিহিদানার স্তর মোটা দানার স্তরের মধ্যে ঢুকে যায় (চিত্র ১.১৮ক)।

৩। **তুষার পকেট** (Frost pocket) : উপরে মোটাদানার বালিসহ কাঁকর স্তর এবং নিচে মিহিদানার স্তর থাকলে হিম প্রভাবে অনেক সময় কাঁকরের চারপাশে মিহিদানার স্তরের আবরণ দেখা যায়। তাকেই তুষার পকেট বলে (চিত্র ১.১৮খ)।

৪। **পকেট কুণ্ডলী** (Pocket involution) : হিমপ্রভাবে অনেক সময় বালির মধ্যে মিহিদানার কাদার জট বা কুণ্ডলী দেখা যায়। এটাকেই পকেট কুণ্ডলী বলে (চিত্র ১.১৮গ)।

এতদ্ব্যতীত হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলে কিছু বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলী দেখা যায়। তারমধ্যে পিঙ্গো (Pingo) এবং তুষার স্তূপ বা হামোক (Hummock) প্রধান। মাটির মধ্যে কোনো কারণে পানির স্তর থাকলে হিম প্রভাবে তা' জমে বরফ হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং মাটির উপরের স্তরকে ফুলিয়ে ফেলে। ফলে কোথাও কোথাও হিম সান্নিগ্ধাঞ্চলে এমন তুষার স্তূপ বা টিলা দেখা যায়। মাটির নিচে বিশুদ্ধ বরফের স্তরের ঢিবিকে পিংগো (চিত্র ১.১৯ ক ও খ) এবং বালি মিশ্রিত বরফের ঢিবিকে হামোক (তুষার স্তূপ, চিত্র ১.২০ক) বা মাউণ্ড (টিপি, চিত্র ১.২০খ) বলে। পিঙ্গো দুই প্রকার : গ্রীনল্যান্ডের নমুনা (চিত্র ১.১৯ক) ও ম্যাকেঞ্জির (চিত্র ১.১৯খ) নমুনা। চিত্র ১.১৯খ এর ১ থেকে ৪ পর্যন্ত, ম্যাকেঞ্জি নমুনার পিঙ্গো গঠনের ধারাবাহিক ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। অজমাট জলে সংপৃক্ত পলি কেমনে চারদিকের চিরতুষার ভূমি দিয়ে ধীরে ধীরে ঢেকে যায় তাই চিত্রে দেখানো হয়েছে। চিত্র ১.১৯খ-১ : হ্রদ এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নিম্নের হিমে অজমাট ভূমি। চিত্র ১.১৯খ-২ : চিরতুষার ভূমির বিস্তৃতি, ফলশ্রুতিতে হ্রদের গভীরতা হ্রাস পাওয়া এবং হ্রদে পতিত পলি হিমে জমে যাওয়া ; চিত্র ১.১৯খ-৩ : মাটির গভীরে অজমাট জলে সংপৃক্ত পলি প্রচণ্ড তরল পদার্থের চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ভূমি স্ফীত হয়ে উঠে। সংপৃক্ত পলি থেকে পানি

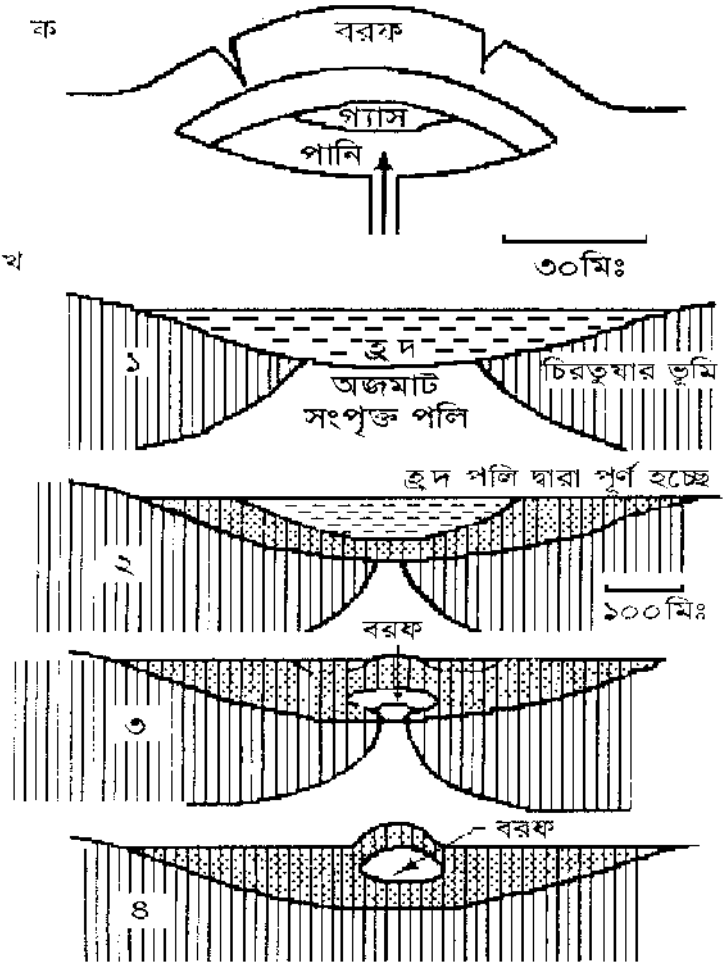

চিত্র ১.১৯ : (ক) গ্রীনল্যান্ড নমুনার পিঙ্গো, (খ) ম্যাকেঞ্জি নমুনার পিঙ্গো।
খ-১-৪ : ম্যাকেঞ্জি নমুনার পিঙ্গো উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ।

বের হয়ে এসে ঠাণ্ডায় বরফে রূপান্তরিত হতে থাকে। চিত্র ১.১৯খ-৪ : তারপর বরফ সম্পূর্ণভাবে চিরতুষার ভূমি দ্বারা ঢেকে যায় এবং ভূপৃষ্ঠ স্ফীত হয়ে উঠে। চিত্র ১.২০ক তে হামোক দেখানো হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে মাটির নিচে ঠাণ্ডায় বরফের খণ্ড থেকে স্থানীয়ভাবে হামোকের উৎপত্তি হয়। চিত্র ১.২০খ তে কিভাবে মাউণ্ড বা টিপি উৎপত্তি হয় তা দেখানো হয়েছে। একটি অজমাট জলে সংপৃক্ত বালির স্তরের নিচে যদি আর একটি অপ্রবেশ্য স্তর

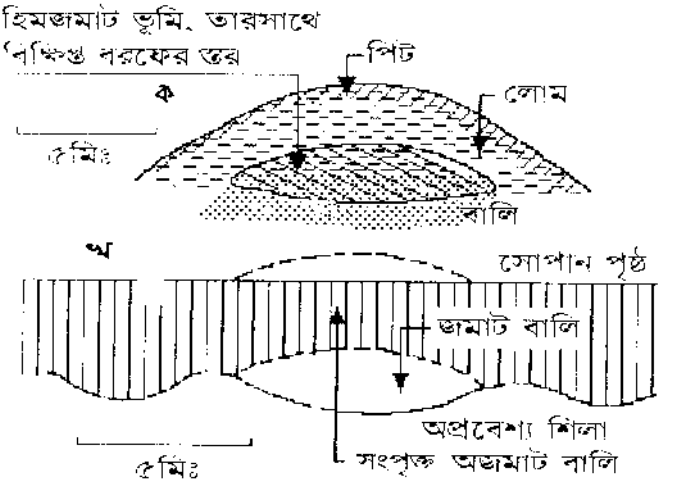

চিত্র ১.২০ : ক – হামোক ; খ – মাউন্ড বা ঢিবি।

থাকে তবেই বালিস্তর জমে এ ধরনের মাউণ্ড তৈরি হয়। ধীরে ধীরে চিরতুষার ভূমির বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং বালিস্তরের নিচের অংশে জমাকৃত পানি (সংপৃক্ত বালি) বরফে রূপান্তরিত হয়ে প্রবল বেগে উপরের দিকে চাপ দেয়। ফলে মাটি স্ফীত হয়ে মাউণ্ডের উৎপত্তি হয়।

BAMBOOG Library Dhaka

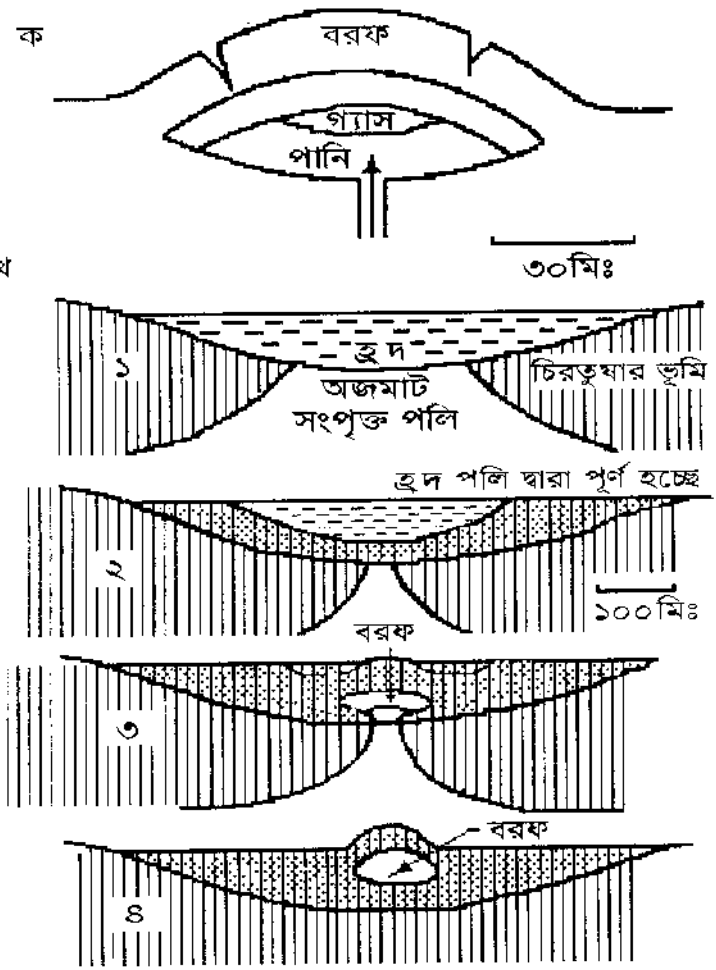

চিত্র ১.১৯ : (ক) গ্রীনল্যান্ড নমুনার পিঙ্গো, (খ) ম্যাকেঞ্জি নমুনার পিঙ্গো।
খ ১-৪ : ম্যাকেঞ্জি নমুনার পিঙ্গো উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ।

বের হয়ে এসে ঠাণ্ডায় বরফে রূপান্তরিত হতে থাকে। চিত্র ১.১৯খ-৪ : তারপর বরফ সম্পূর্ণভাবে চিরতুষার ভূমি দ্বারা ঢেকে যায় এবং ভূপৃষ্ঠ স্ফীত হয়ে উঠে। চিত্র ১.২০ক তে হামোক দেখানো হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে মাটির নিচে ঠাণ্ডায় বরফের খণ্ড থেকে স্থানীয়ভাবে হামোকের উৎপত্তি হয়। চিত্র ১.২০খ তে কিভাবে মাউণ্ড বা টিপি উৎপত্তি হয় তা দেখানো হয়েছে। একটি অজমাট জলে সংপৃক্ত বালির স্তরের নিচে যদি আর একটি অপ্রবেশ্য স্তর

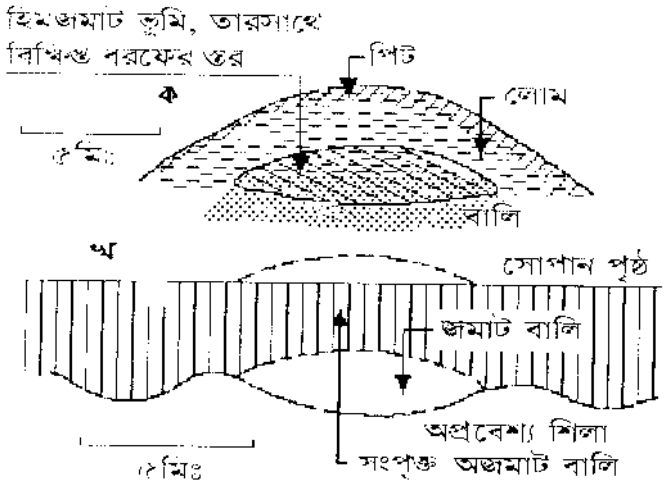

চিত্র ১.২০ : ক – হামোক ; খ – মাউন্ড বা টিবি।

থাকে তবেই বালিস্তর জমে এ ধরনের মাউণ্ড তৈরি হয়। ধীরে ধীরে চিরতুষার ভূমির বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং বালিস্তরের নিচের অংশে জমাকৃত পানি (সংপৃক্ত বালি) বরফে রূপান্তরিত হয়ে প্রবল বেগে উপরের দিকে চাপ দেয়। ফলে মাটি স্ফীত হয়ে মাউণ্ডের উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের কোয়াটারনারির স্তরতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ

(Stratigraphic Classification of the Quaternaries of Bangladesh)

ভূমিকা

বাংলা বেসিনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে বাংলাদেশ। আর বাংলা বেসিন হলো পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বিশাল অববাহিকা যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদ্বীপগুলোর মধ্যে একটি। এ অববাহিকায় প্রবাহিত অসংখ্য বিশাল নদী ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা বিধৌত করে কালাকাল ধরে ঢেলে দিচ্ছে উর্বর পলি ; বিন্যস্ত হচ্ছে নব নব পলিস্তর। উড্ডীয়মান হিমালয় থেকে ক্ষিপ্র জলস্রোতে বাহিত ভাসমান এ পলিকণা শুধু বাংলাদেশের গায়েই উর্বর পলিস্তরের প্রলেপ মেখে দিচ্ছে না, ভরে তুলেছে দক্ষিণের গভীর সমুদ্রগর্ভ। থেমে থেমে স্থলভাগের সাগরাভিমুখী এ অগ্রযাত্রায় সাগর ভরে উঠছে। ধাপে ধাপে বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠছে নব নব দ্বীপ, গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতি।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়িয়া এলাকা বাদে সম্পূর্ণ অংশই কোয়াটারনারি অবক্ষেপে ঢেকে আছে। লালচে রংয়ের কাদামাটি ভাওয়াল ও মধুপুরের গড় এলাকায় এবং বরেন্দ্রভূমির বিস্তৃত এলাকায় ঢেকে আছে। এছাড়া লালমাই পাহাড়িয়া এলাকায় পাহাড়ের চূড়াগুলো ঢেকে আছে সেই লালমাটি দ্বারা। ভাওয়াল ও মধুপুর এলাকা এবং বরেন্দ্রভূমি, চারদিকের প্লাবনভূমি অপেক্ষা একটু উঁচু। তাই সচরাচর এ সমস্ত এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় না। মধুপুর, বরেন্দ্র এবং লালমাই এলাকা বাদে অবশিষ্ট এলাকা (পাহাড়িয়া এলাকা বাদে) প্রতি বছরই বন্যার পানিতে ডুবে যায়। ফলে কিছু না কিছু পলিমাটি জমা হয়।

মধুপুরের ও বরেন্দ্র এলাকার লালমাটি সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই কিছু আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেরিকার লুসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মরগান ও ম্যাকিন্টার ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিস্তৃত লালমাটি নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে মাঠ কার্য সম্পাদন করেন। তাঁদের গবেষণায় মধুপুর, বরেন্দ্রভূমি ও লালমাই পাহাড়িয়া এলাকার লালমাটিকে একটি সংঘ হিসেবে বিবেচনা করে এবং এই লালমাটিকে মধুপুর কাদা সংঘ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর প্রায় ১৮ বছর পরে রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আজিজুল ইসলাম ১৯৭৩–১৯৭৪ সালে এ লালমাটির উপর একটি গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন। লালমাই এলাকার লালমাটির উপরে কিছু বিস্তারিত গবেষণা সম্পাদন করেন আবু বকর (১৯৭৭)। তারই ধারাবাহিকতায় আলম এবং খান (১৯৮০) মধুপুর সংঘের উপর একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

মধুপুর এলাকার লালমাটির উপরে বিস্তারিত গবেষণা কাজ শুরু হয় আশির দশকের পর। বেলজিয়ামে কোয়াটারনারির ভূতত্ত্ব বিভাগে এসব গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়। ১৯৮৬ সনে মোঃ হাসান লালমাই পাহাড়িয়া এলাকা এবং মধুপুর এলাকার লালমাটির পলিতত্ত্ব, ভারি ও কাদা মণিকের উপর গবেষণা সমাপ্ত করেন। বর্তমান লেখকেরও যথেষ্ট গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ববিদ্যার উপর ইংরেজিতে একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। মূলত এ অধ্যায়টি এ গ্রন্থের লেখকের কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ববিদ্যার গবেষণার উপর ভিত্তি করে লেখা হলো।

মধুপুর ও বরেন্দ্র এলাকার লালমাটি প্রায় একই রকম হলেও ভূপ্রাকৃতিক (geographic) দিক থেকে এলাকা দুটি আলাদা এবং লালমাটির স্তরগুলোর ধারাবাহিকতা নেই। স্তরগুলো বিচ্ছিন্ন। টেকটনিক কাঠামো (Tectonic framework) হিসেবে এলাকা দুটি আলাদা। একই নদীর শাখা–প্রশাখা দ্বারা লালমাটি অবক্ষেপণ হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে বলা কঠিন তবে তারা সমকালীন অবক্ষেপ বলে ধারণা করা যায়। বর্তমান লেখক তাঁর গবেষণায় বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের কোয়াটারনারি অবক্ষেপগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে বিন্যস্ত করে স্তরতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এ অধ্যায়ে মধুপুর, লালমাই, বরেন্দ্রভূমি, চলনবিল ও পঞ্চগড় এলাকার কোয়াটারনারি স্তরবিদ্যা ও তাদের অবক্ষেপণের প্রতিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) মধুপুর এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম (Quaternary Stratigraphy of the Madhupur Area)

ঢাকার ভাওয়াল ও ময়মনসিংহের মধুপুর গড় এলাকার অন্তর্ভুক্ত (চিত্র ২.১ ও ২.২)। মধুপুর এলাকার আদর্শ ভূমি (type locality) **মধুপুর** টাঙ্গাইল জেলার একটি থানা সদর। এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বানসি নদী। এলাকাটি লালমাটি দ্বারা আচ্ছাদিত। এই লালমাটিকে মধুপুর সংঘ বলা হয়। মরগান ও ম্যাকিন্টার আদর্শ ভূমি হিসেবে মধুপুর থানার কথা উল্লেখ করেন। সেখানে টেকটনিক আলোড়নের ফলে কিছু স্থান ব্লকের মত উত্তোলিত (block uplift) হয়েছে। তার গায়ে প্রস্থচ্ছেদে মধুপুর সংঘের পূর্ণ স্তরবিন্যাস (stratification) দেখা যায়। বর্তমান লেখক তার বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করেন ঢাকা মহানগরীর মিরপুর ১২ নং সেকশনে অবস্থিত কালসি সিরামিক ইটখোলায়, যেখানে লালমাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের সিরামিট ইট। লালমাটি সংগ্রহের জন্য গভীর খাদে খনন করা হচ্ছে। এ গভীর খাদে লালমাটির সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ দেখা যায়। ঢাকা ও তার

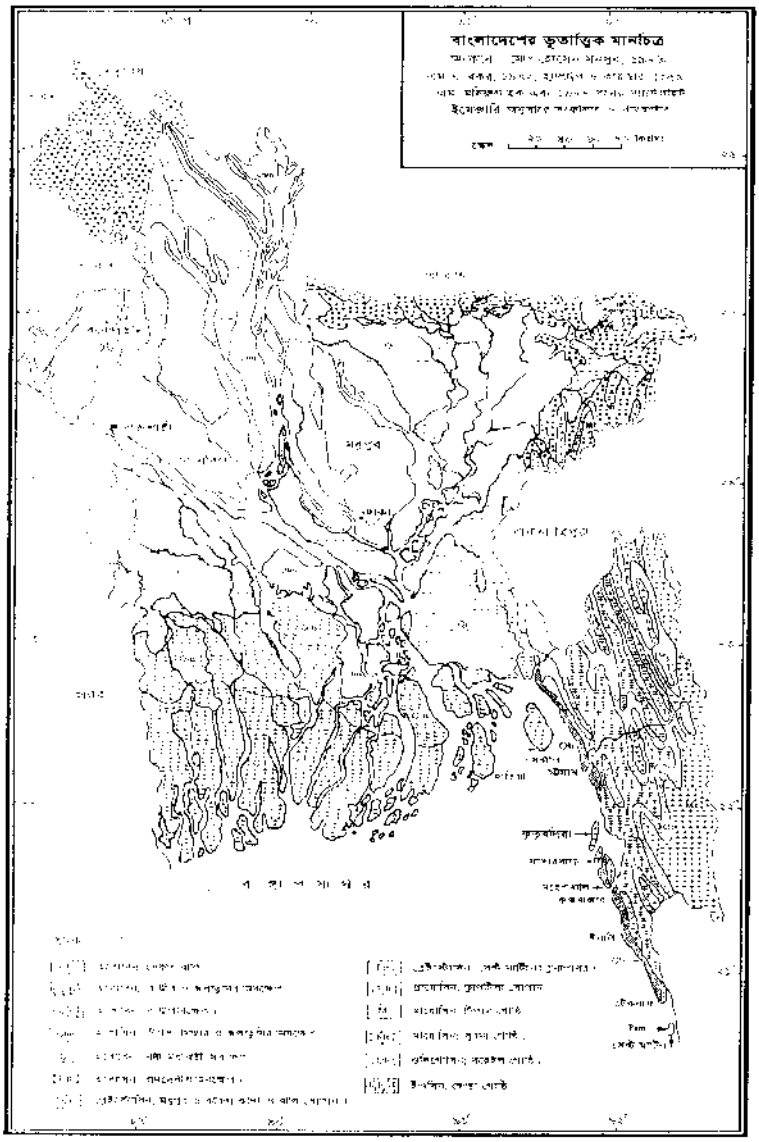

চিত্র ২.১ : বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র।

পার্শ্ববর্তী এলাকার কোয়াটারনারির অবক্ষেপগুলোকে মোট দুটি সংঘে বিভক্ত করা হয়েছে ; (ক) নিচের **মধুপুর কাদা ও বালি সংঘ** ও (খ) উপরের **বাসাবো সংঘ** (চিত্র ২.৩ ও ২.৪)।

(ক) মধুপুর সংঘ : মধুপুর এলাকার লালমাটিই হলো মধুপুর সংঘ। মধুপুর সংঘকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (ক) নিচের লাল বা হলদে তামাটে ক্ষয়প্রাপ্ত কাদা বা বালির অবক্ষেপ এবং (খ) উপরের ধূসর বর্ণের আঠালো কাদা (সারণি ২.১)। লালমাটি বলতে নিচের অবক্ষেপগুলোকেই বুঝায়। মধুপুর সংঘের নিচের অংশকে তিনটি সভ্যে ভাগ করা হয়েছে : নিম্ন, মধ্য ও উপরে সভ্য। মধুপুর সংঘের নিচের সভ্যতে **ভালুকা বালি সভ্য** নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সভ্যের নিচে রয়েছে নুড়িপাথরের স্তর আর উপরে রয়েছে একটি পুরামৃত্তিকা (মৃ-৭)। মিরপুর ইটখোলাতে এই পুরামৃত্তিকা কালরেখা হিসেবে (ম্যাঙ্গানিজের দাগ) দেখা গেলেও অন্যান্য স্থানে দৃশ্যগোচর হয় না, যদিও পুরা মৃত্তিকার রেখাটি স্থানে থাকার কথা। নিচের সভ্যের উপরের সীমারেখা খুব তীক্ষ্ণ নয়। সীমারেখাটি তলানির কণাগুলোর আকারের পরিবর্তনের জন্য ক্রমিক পরিবর্তন (gradational)। এ সভ্যের মাঝারি ও মিহি দানার হলুদ তামাটে বালিতে প্রচুর পরিমাণে অভ্র দেখা যায়। এ সভ্যের বালির স্তরগুলো প্রাথমিক পাললিক গঠন এখনও ধারণ করে আছে। সমান্তরাল স্তরের মাঝে মাঝে ক্রস স্তরীভূত বালিস্তর দেখা যায়। লোহার আয়নসমৃদ্ধ এ বালি মরিচা ধরা। সভ্যের পুরুত্ব প্রায় ৪ মিটার।

নিচের সভ্যের উপরে অবস্থান করেছে হালকা তামাটে বালি কাদা বা কাদা বালি। এ বালি লালচে, তামাটে দাগযুক্ত। বালির মধ্যে আছে লৌহ কংকর, লোহার গুঁড়ি, ঘাসের মূল ও ম্যাঙ্গানিজের দাগ। এ সভ্যে অক্সিডেশন ও রিডাকশনের বা জারণ-বিজারণের দাগগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। এ সভ্যের উপরে রয়েছে আর একটি পুরামৃত্তিকা (মৃ-৬)। মৃত্তিকার এ স্তরও মিরপুর ছাড়া অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এ সভ্যের নামকরণ করা হয়েছে **মিরপুর সিল্ট কাদা সভ্য** হিসেবে।

মধুপুর সংঘের তিনটি সভ্যের উপরের সভ্যের নাম **ঢাকা কাদা সভ্য**। অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত এ সভ্যের রং লাল। দেখতে অনেকটা পাউডারের মতো। এর মধ্যে রয়েছে লৌহ কংকর, লোহার গুঁড়ি, ঘাসের মূল ও ম্যাঙ্গানিজের কাল দাগ। অভ্র সংবলিত এ সভ্যের বায়োটাইটের অধিকাংশই জারিত। সভ্যের পুরুত্ব এক রকম নয় : ২ থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত পুরুত্ব দেখা যায়। মধুপুর সংঘের এই তিনটি সভ্য অবক্ষেপণের পর একটি লম্বা সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন এর উপরে অবক্ষেপ জমা না হয়ে ক্ষয়সাধনের ঘটনাই ঘটেছে। কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়, বিশেষ করে, মিরপুরে উপরের সভ্যের পুরাপুরিই এবং মধ্য সভ্যের কিয়দংশ ক্ষয়সাধন করে অসংগতি নিয়ে দুটি স্তর জমা হয়েছে। এ স্তর দুটোকে **কালসি স্তর** বলা হয়। কালসি স্তর দুটোর উপরেরটি সাদা বা হলদে-তামাটে, অনেকটা শিলাচূর্ণের মতো এবং নিচেরটি ফ্যাকাশে হলুদ। এই দুটি স্তরের সীমারেখা ব্রানহেস মাতুইয়ামা সীমারেখা নির্দেশ করে। পুরাচৌম্বকত্বের ফলাফল অনুযায়ী লালমাটির নিচের তিনটি সভ্য এবং কালসি স্তরদ্বয়ের নিচের স্তরটি নিম্ন প্লেইস্টোসিন

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপরের কালসিঁ স্তরটি অনেকে টোবা ধূলিকণা সংবলিত বলে মনে করেছেন (গবেষণা চলছে)। স্তরটি উর্ধ্ব প্লেইস্টোসিনের অন্তর্ভুক্ত।

মধুপুর সংঘের উপরে অসংগতি নিয়ে অবস্থান করছে হলোসিন শ্রেণী। একটি প্রবল স্রোতে মধুপুর সংঘের উপরের পৃষ্ঠভূমি ক্ষয়সাধিত হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে মধুপুর সংঘ পুরোটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়িত তল ডুপিটিলা সংঘ পর্যন্ত গিয়েছে। আবার কোনো কোনো স্থানে আংশিকভাবে ক্ষয়িত হয়েছে মধুপুর সংঘ। এই ক্ষয়িত তলের উপরে অসংগতি নিয়ে জমা হয়েছে হলোসিন শ্রেণী। ঢাকা মহানগরীর পূর্ব দিকে বাসাবো এলাকায় মধুপুর সংঘের উপরের অবক্ষেপগুলোকে একটি সংঘে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং **বাসাবো সিল্ট-কাদা সংঘ** নামকরণ করা হয়েছে (সারণি ২.১)। বাসাবো সংঘটিকে

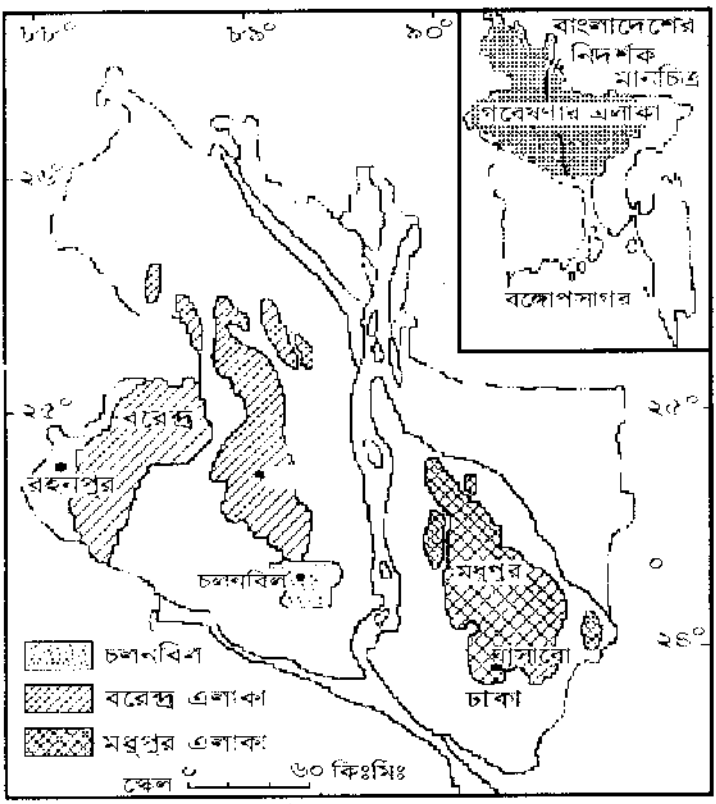

চিত্র ২.২ : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল। মধুপুর, বরেন্দ্র ও চলনবিল এলাকাসমূহ দেখানো হয়েছে।

পুনরায় দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিচের অংশটি বালি প্রধান। মোটা, মাঝারি ও মিহিদানার হলদে ও নীলাভ বালি। এই বালির মধ্যে পাওয়া যায় লৌহ কংকরের স্তর যে কংকরগুলো মধুপুর কাদাবিধৌত বলে সহজেই অনুমেয়। বালির মধ্যে আরো পাওয়া যায় বড় বড় আস্ত গাছ, গাছের খণ্ড, ঘাসের মূল ও ঘাসজাতীয় আবর্জনা। গুলশান লেক মৃত নদীর (Ox-bow-lake বা ক্ষুরাকৃতি সরোবর) সাক্ষ্য বহন করে। এ সভ্যকে **গুলশান বালি সভ্য** বলা হয়। এর উপরের ফ্যাকাশে বাদামি বা হালকা হলুদ রঙের খুব আঠালো কাদা প্রধান সভ্যকে **মাতুয়াইল সিল্ট-কাদা সভ্য** বলা হয়। সংঘের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত কাষ্ঠখণ্ডের তেজস্ক্রিয় কার্বনের মাধ্যমে নির্ণেয় বয়স অনুযায়ী সংঘকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ঐ স্তরগুলোকে হলোসিনের পাঁচটি কালস্তরীয় অনুশ্রেণীর সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে। গুলশান সভ্যে তিনটি এবং মাতুয়াইল সভ্যে দুটি স্তর রয়েছে।

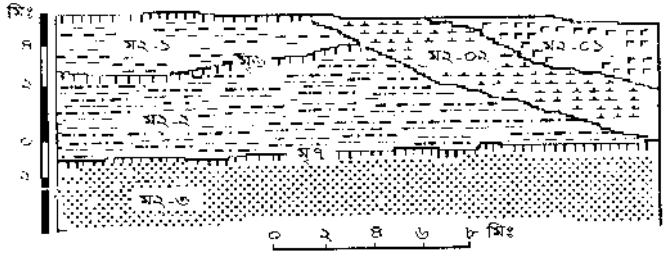

চিত্র ২.৩ : কালসি (মিরপুর, ঢাকা) ইটখোলার স্তরতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ।

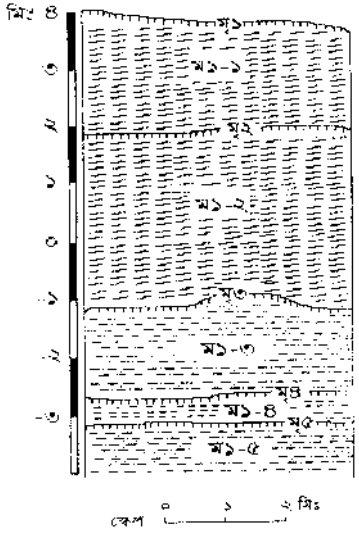

চিত্র ২.৪ : ঢাকা মহানগরীর পূর্ব বাসাবোয় কালিবাড়ি পুকুরের স্তরতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ।

কালস্তরতত্ত্ব		সংঘ	স্তর	অনুস্তর	শিলার বর্ণনা	পুরুত্ব (মিঃ)
সোপান	অনুসোপান					
হলোসিন	অনু-আটলান্টি	বাসাবো সংঘ	মাতুয়াইল কাদা	সিল্টকাদা	ফেকাশে বাদামি রংয়ের খুব আঠালো সিল্ট-কাদা, উপরিভাগে নবমৃত্তিকা অসংগতি	৫
	অনু-বোরিল			কাদাসিল্ট	হালকা হলদে-তামাটে খুব আঠালো কাদা-সিল্ট, সঙ্গে প্রচুর পরিমানে ঘাসের মূল ও লোহার কংকর। অসংগতি	
	আটলান্টি		ডেমরা বালি	সিল্টকাদা	হলদেটে লাল সিল্ট-কাদা অসংগতি	পুরুত্বে তারতম্য দেখা যায়
	বোরিল			কাদাসিল্ট	ফেকাশে হলুদ কাদ-সিল্ট, সাথে কাঠের গুড়া, ঘাসের মূল এবং লোহার কংকর। অসংগতি	
	পূর্ব-বোরিল			বালি	হালকা নীলাভ বাদামী বালি-সিল্ট-কাদা হতে বালি। সাথে থাকে কাঠের গুঁড়া, ঘাসের মূল এবং লোহার কংকর অসংগতি	
প্লেইসটোসিন	মধ্য	মধুপুর কাদা ও বালি	কালাটি অনস্তর	ঊর্ধ্ব	হলুদ-তামাটে খুব আঠালো সিল্ট-কাদা, সাথে লোহার কংকর। অসংগতি	২
	নিম্ন			নিম্ন	ফেকাশে হলুদ-তামাটে বালি-কাদা, হালকা তামাটে দাগযুক্ত অসংগতি	৪
			ঊর্ধ্ব		লালচে হলুদ দাগযুক্ত লালমাটি, অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত, দেখতে পাউডারের মত। এর মধ্যে পাওয়া যায় লোহার কঙ্কর, লোহার গুঁড়ি, কারবোনেট কঙ্কর, ঘাসের মূল, অভ্র (মাইকা) এবং ম্যাঙ্গানিজের কাল দাগ। অসংগতি	৫
			মধ্য		হালকা তামাটে বালি-কাদা থেকে কাদা বালি, লালচে তামাটে দাগযুক্ত, সাথে লোহার কঙ্কর, লোহার গুঁড়ি, ঘাসের মূল, অভ্র (মাইকা) এবং ম্যাঙ্গানিজের কাল দাগ। অসংগতি	৪
			নিম্ন		ফেকাশে হলুদ-তামাটে সিল্ট বালি থেকে বালি, অভ্র সমৃদ্ধ ক্রস স্তরিভূত, ম্যাঙ্গানিজের দাগযুক্ত। অভ্রগুলো বাইয়োটাইটিক এবং মরিচা ধরা। বালিতে কিছু পাতলা কাদা স্তর দেখা যায়। অসংগতি	৪
প্লায়োসিন		ডুপিটিলা			কুমিল্লা নুড়িপাথরের স্তর মরিচা পড়া বালি, সাথে কাদার পাতলা স্তর। এর মধ্যে অশ্রের হার পাওয়া যায়।	

সারণি ২.১ : মধুপুর এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম (সূত্র : মনসুর, ১৯৯৪)।

এ সকল স্তরের মধ্যে জৈব পদার্থসমৃদ্ধ কালচে ধূসর দাগ সংবলিত চারটি রেখা দেখা যায় (সারণি ২.১)। এ সকল কালচে রেখাগুলোকে আচ্ছাদিত মৃত্তিকা ধারণা করা হয়েছে। আর এ আচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপরই ভিত্তি করে বাসাবো সংঘকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। হলোসিন শ্রেণীর এমন শ্রেণীবিভাগ বরেন্দ্রভূমি ও পঞ্চগড় এলাকাতেও করা হয়েছে।

(খ) বরেন্দ্র এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম (Quaternary Straigraphy of the Barind Area)

বরেন্দ্রভূমি কোয়াটারনারি অবক্ষেপ মধুপুর এলাকারই মতো। মধুপুর সংঘের অনুরূপই বরেন্দ্রভূমি লালমাটি। জারণ-বিজারণের দাগগুলো অবিকল মধুপুর সংঘের মতো। প্রস্থচ্ছেদে জারণের স্থানগুলো সিঁদুরের মতো টকটকে লাল। বিজারণের স্থানগুলো অনেকটা হলদে বা ধোঁয়াটে সাদা। বরেন্দ্র এলাকার প্লেইস্টোসিন শ্রেণীর অবক্ষেপগুলোকে একটি সংঘে আনা হয়েছে এবং **বরেন্দ্র কাদা ও বালি সংঘ** নামকরণ করা হয়েছে (চিত্র ২.৫ ; সারণি ২.২)। বরেন্দ্র সংঘকেও তিনটি সভ্য ও একটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। তিনটি

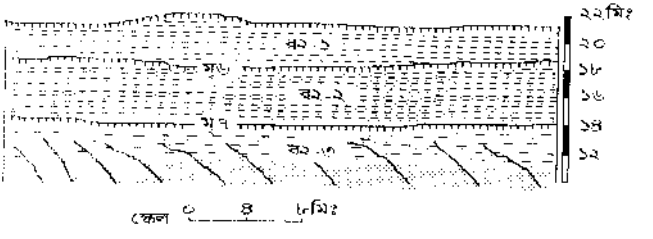

চিত্র ২.৫ : ঢাকা মহানগরীর মিরপুরস্থিত কালসি সিরামিক ইটখোলার স্তরতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ।

সভ্যের সর্বনিম্ন **গুজরঘাট বালি সভ্যের** গুণাগুণ একেবারেই মধুপুর সংঘের নিম্ন সভ্যের মতো; অভ্র প্রধান তামাটে, জারিত, মাঝারি ও মিহিদানার বালি, প্রাথমিক পাললিক গঠন দৃশ্যমান, কোনো কোনো জায়গায় স্তরগুলো ক্রস স্তরায়ন সংবলিত। মধ্য সভ্যের নাম **নাচোল সিল্ট-কাদা সভ্য**। জারণ-বিজারণযুক্ত এ সভ্যের জারিত স্থানগুলো অনেকটা সিঁদুরের মতো টকটকে লাল। ঘাসের মূল, লৌহ গুঁড়ি ও ম্যাঙ্গানিজের কালো কালো দাগ লক্ষণীয়। উপরের সভ্যের নাম **শেরপুর কাদা সভ্য**। ঢাকা কাদার মতোই অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত পাউডারের মতো। সভ্যের রং লাল বা গাঢ় তামাটে। সভ্যগুলোর মধ্যকার সীমারেখাগুলো তীক্ষ্ণ নয়, অনেকটা ক্রম পরিবর্তনশীল (gradational), বরেন্দ্র সংঘের উপরের স্তরকে **গৌরীপুর স্তর** বলা হয়। দিনাজপুর শহরের অদূরে গৌরীপুরের লালমাটিয়া নামক স্থানে লালচে রংয়ের বালি-সিল্ট-কাদার এই স্তর পাওয়া যায়। বরেন্দ্র সংঘের এই স্তরটি উল্টা মেরু প্রবণতা দেখায়। বরেন্দ্র সংঘের সভ্যদের উপরে আমুবার দিকে আর একটি স্তর

দেখা যায়। এই স্তরটি কার্বনেট কংকরসমৃদ্ধ। পুরাচৌম্বকত্বের ফলাফল অনুযায়ী কার্বনেট কংকর সংবলিত স্তরটিকে ঊর্ধ্ব বা মধ্য প্লেইস্টোসিন এবং গৌরীপুর স্তরসহ বরেন্দ্র সংঘের নিচের সভ্যদের নিম্ন প্লেইস্টোসিন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

কালস্তরতত্ত্ব		সংঘ	সভ্য	অনুস্তর	শিলার বর্ণনা	পুরুত্ব (মিঃ)
শ্রেণি	অনুশ্রেণী					
হলোসিন	অনু-আটলান্টি	রহনপুর সিল্ট-কাদা		১	ফেকাশে বাদামি রংয়ের সিল্ট, সাথে লৌহ ও কার্বোনেটের কঙ্কর এবং অভ্র। অসংগতি	৪ থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত
	অনু-বোরিল			২	ধূসর তামাটে বর্ণের কাদা সিল্ট, সাথে অভ্র ও ম্যাঙ্গানিজের দাগ। অসংগতি	
	আটলান্টি			৩	বাদামী তামাটে কাদা সিল্ট, প্রচুর অভ্রযুক্ত। অসংগতি	
	বোরিল			৪	হলদেটে লাল সিল্ট-কাদা অসংগতি	
	পূর্ব-বোরিল			৫	বাদাম তামাটে সিল্ট-কাদা, অভ্র ও লৌহ কঙ্কর সংবলিত। অসংগতি	
প্লেইস্টোসিন	মধ্য	বরেন্দ্র কাদা ও বালি		গৌরীপুর	হালকা বাদাম তামাটে বর্ণের সিল্ট কাদা থেকে বালি-সিল্ট-কাদা, সাথে লৌহ কঙ্কর। অসংগতি	৪
	নিম্ন		শেরপুর কাদা		গাঢ় তামাটে কাদা-সিল্টের উপরে হালকা তামাটে দাগ। লৌহ ও কার্বোনেট কঙ্কর, লোহার গুঁড়ি, ঘাসের মূল, অভ্র ও ম্যাঙ্গানিজের দাগ সংবলিত অবক্ষেপ। অসংগতি	৩
			নাচোল সিল্ট কাদা		তামাটে হলুদ বালি-সিল্ট-কাদার উপর হালকা তামাটে দাগ। লৌহ কঙ্কর, লোহার গুঁড়ি, ঘাসের মূল, অভ্র ও ম্যাঙ্গানিজের দাগ সম্বলিত অবক্ষেপ। অসংগতি	৫
			গুজরঘাট বালি		হলুদ তামাটে সিল্ট বালি থেকে বালি। প্রচুর মরিচা ধরা অভ্র পাওয়া যায়। অধিকাংশ অভ্রই বায়োটাইটিক। ৫ ম্যাঙ্গানিজের দাগ সম্বলিত ক্রস স্তর অবক্ষেপ। অসংগতি	৪
প্লায়োসিন		ডুপিটিলা			কুমিল্লা নুড়িপাথরের স্তর। মরিচা পড়া বালি, সাথে কাদার পাতলা স্তর। এর মধ্যে অশ্মের হার পাওয়া যায়।	

সারণি ২.২ : বরেন্দ্র এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম (সূত্র : মনসুর, ১৯৯২)।

বরেন্দ্র সংঘের উপরের অবক্ষেপগুলোকে **রহনপুর সিল্ট-কাদা সংঘ** বলা হয়। রহনপুর বাজারের পূর্বদিকের ভাগলপুর নামক একটি অত্যন্ত ছোট আঁকাবাঁকা নদী (Tightly meandering stream) প্রবাহিত হয়েছে। এই নদী পারের প্রস্থচ্ছেদে উক্ত সংঘ

BANSDOC Library
Accession No. 178/3

পুরাটাই দেখা যায়। বরেন্দ্র সংঘের ক্ষয়িত তলে হলদে বা ফ্যাকাশে বাদামি বা ধূসর রংয়ের এই সংঘ অবক্ষেপিত হয়েছে। এ সংঘের নিচের অংশ বালি প্রধান এবং তার মধ্যে বড় গাছের খণ্ড পাওয়া যায়। উপরের অংশ সিল্ট বা কাদা প্রধান। এ সংঘের মধ্যেও কাল রংয়ের জৈব পদার্থ প্রধান আচ্ছাদিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই আচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপর ভিত্তি করে সংঘকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। (চিত্র ২.৬, সারণি ২.২)।

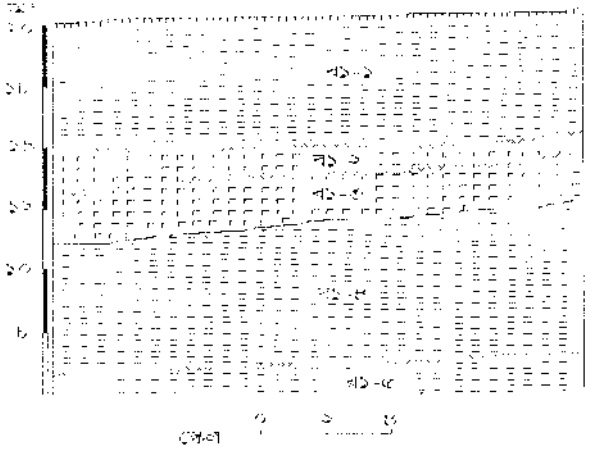

চিত্র ২.৬ : চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুরের পূর্বে ভাগলপুর নদী তীরের ভূতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ।

(গ) চলনবিল এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম (Quaternary Stratigraphy of the Chalanbil Area)

পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলার বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে বিখ্যাত চলনবিল। বর্ষাকালে এই এলাকার উপর দিয়ে নদীর মতো স্রোতাকারে পানি প্রবাহিত হয় বলেই নাম হয়েছে চলনবিল। চলনবিলের উপর দিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবাহিত নদী হচ্ছে আত্রাই (উপরের ধারা) বা গুমানি (মধ্যধারা) বা বড়াল (নিম্নধারা) নদী। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তরাঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হয় তাতে নদীসমূহ কানায় কানায় ভরে উঠে। উপচে পড়া পানি প্রবলবেগে চলনবিলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে নিম্নাঞ্চল যমুনার দিকে। তাই বর্ষাকালে চলনবিলের কোনো কোনো সময় ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। চলনবিলের আয়তন ...০০ বর্গ কিলোমিটার। চলনবিল মোটামুটি পশ্চিমে সিংড়া থেকে পূর্বে নওগাঁ এবং ...াহর থেকে উত্তরে বস্তুল পর্যন্ত বিস্তৃত।

...টি জমা হয়ে চলনবিল ক্রমেই ভরাট হচ্ছে। এইতো মাত্র ৪০/৫০ বছর আগে ... কোনো কোনো স্থানে সারা বছরই পানি থাকতো। প্রায় ২০... আগে ছিল বন্য মহিষের লীলাভূমি (বৃদ্ধ লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা... জ্ঞাত)।

চৈত্রের দাবদাহে বন্য মহিষ গা ডুবিয়ে থাকতো চলনবিলের কাদা পানিতে। আর বন্য মহিষের গড়াগড়িতে সৃষ্টি হতো বড় বড় গর্ত বা ডোবা। স্থানীয় লোকেরা বন্য মহিষ তাড়াবার জন্য তীর ধুনক ও মাটির গুলি ব্যবহার করতো।

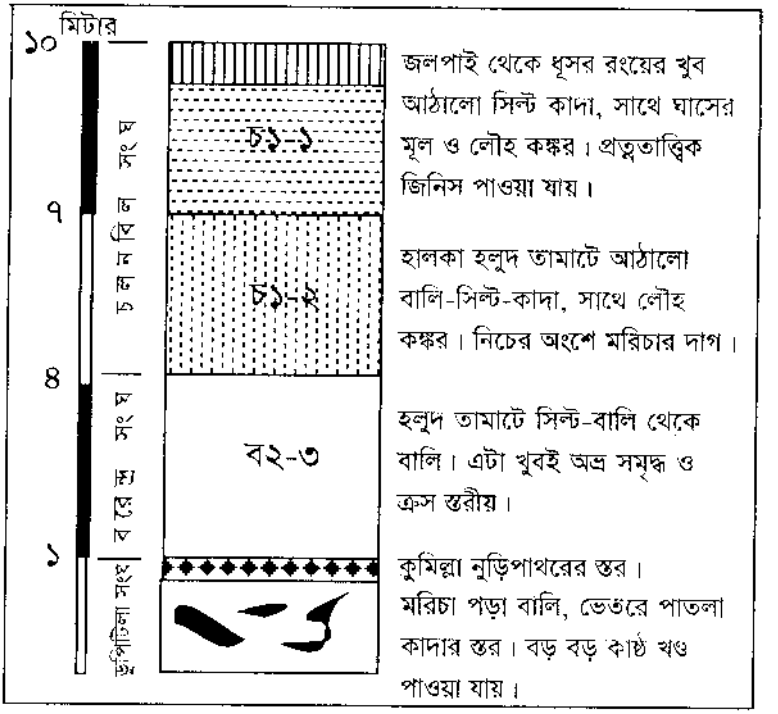

চিত্র ২.৭ : সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার কুশাবাড়ীর সাইড খালের ভূতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ।

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছে মহাস্থানগড়ের গোকুল মোড়ের বিরাট দালানটি। ঐ স্থানটিকে লক্ষীন্দারের ভিটা বলা হয়। লক্ষীন্দারের বাসর ঘরের কথা অনেকেই শুনেছেন (পৌরাণিক কথা)। সেই গোকুল মোড়ের বিরাট দালান থেকে চলনবিল দেখা যেত। কথিত পৌরাণিকের চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষীন্দারের স্ত্রী বেহুলার বাবার বাড়ি ছিল তারাশ থানার উত্তরে বিনসাড়া গ্রামে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক নিদর্শনই সে গ্রামে বিদ্যমান। কথিত কাহিনী অনুযায়ী বিনসাড়া গ্রামের পার্শ্বে একটি বাজার ও তার পার্শ্বে একটি নদী থাকার কথা। হয়তোবা কুসুম্বি গ্রামের পার্শ্বে মাঠের মধ্যে একটি ভিটা আছে

যাকে নিচনগর বলা হয় এবং সেখানকার খাঁড়িই (মৃতপ্রায় নদী) ঐ সাক্ষ্য বহন করে। বেহুলার বাড়ি বলে খ্যাত স্থানে ১৯৬০ সনে খননকার্যের মাধ্যমে একটি কূপ পাওয়া গেছে যা প্রত্নতাত্ত্বিক কূপ বটে। চলনবিলের পূর্বে নিমগাছিতে বিখ্যাত জয়সাগর পুকুর আছে। সেখানে সপ্তম ও দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিদ্যমান। মূল ঘটনাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক খননের উপর নির্ভর করছে।

চলনবিল এলাকা হলোসিন সময়ের প্লাবনাবক্ষেপ দ্বারা আবৃত। বরেন্দ্র সংঘ দ্বারা এককালে ঢাকা ছিল চলনবিল। প্লেইস্টোসিনের শেষে এবং হলোসিনের গোড়ার দিকে প্রবল বর্ষণে যে মহাপ্লাবন হতে থাকে তার প্রচণ্ড স্রোতে ধুয়ে মুছে গেছে বরেন্দ্র সংঘের উপরের দুটি সভ্য। আনুমানিক প্রায় ৫০০০ বছর আগে অবস্থার পরিবর্তন হয়। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে খরস্রোতা নদী ধীর গতিসম্পন্ন হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত চলনবিলের তলে জমে উঠে হলোসিন শ্রেণীর উর্বর পলিমাটি। চলনবিল এলাকায় বিস্তৃত এই নতুন অবক্ষেপগুলোকে **চলনবিল সংঘ** নামকরণ করা হয়েছে (চিত্র ২.৭, সারণি ২.৩)। এই চলনবিল সংঘকেও দুটি অনু–এককে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) উপরের অনু–এককটি কালচে বা বাদামি রংয়ের খুব আঠালো সিল্ট–কাদা এবং (২) নিচের অনু–এককটি হলুদ তামাটে এবং বালি প্রধান। এই নিম্ন অনু–এককের নিচে বরেন্দ্র সংঘের নিম্ন সভ্য এবং তার নিচে কুমিল্লা নুড়িপাথরের বালির স্তর।]

কালস্তর তত্ত্ব						
সোপান	অনু-সোপান	সংঘ	সভ্য	স্তর	শিলার বর্ণনা	পুরুত্ব
হলোসিন	অনু-অ্যাটলান্টিক	চলনবিল		বালি-সিল্ট-কাদা	বাদামি ও ধূসর সিল্ট-কাদা থেকে বালি-সিল্ট-কাদা। লোহার কংকর ও ঘাসের মূল সংবলিত আঠালো কাদা।	১-৫
					অসংগতি	
	অনু-বোরিয়াল			সিল্ট-কাদা	হালকা হলদে বাদামি সিল্ট-কাদা। ঘাসের মূল ও লোহার কংকর সম্বলিত। নিচের অংশ মরিচাযুক্ত।	৩
					অসংগতি	
প্লেইস্টোসিন	নিম্ন	বরেন্দ্র	গুজরঘাট বালি		হালকা হলদে বাদামি সিল্ট-বালি থেকে বালি। অত্যন্ত অভ্র সংবলিত এবং ক্রস স্তরযুক্ত। ম্যাঙ্গানিজের দাগ আছে। অভ্রগুলোর অধিকাংশই বায়োটাইট এবং মরিচাধরা।	৩
					অসংগতি	
প্লায়োসিন		ডুপিটিলা			কুমিল্লা নুড়িপাথরের স্তর মরিচা ধরা বালি। বালি স্তরের ভিতরে ভিতরে কাদা স্তর দেখা যায়। বড় বড় পাথুরে কাঠের খণ্ড পাওয়া যায়।	

সারণি ২.৩ : চলনবিল এলাকার কোয়াটারনারির স্তরক্রম (সূত্র : মনসুর ও রহমান, ১৯৯৩)।

(ঘ) দহগ্রাম পঞ্চগড় এলাকার কোয়াটারনারি অবক্ষেপের স্তরক্রম (Quaternary Stratigraphy of the Dahagram-Panchagahr Area)

দহগ্রাম পঞ্চগড় এলাকা বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে অবস্থিত (চিত্র ২.৮)। হিমালয়ের পাদদেশের তেরাই এলাকা থেকে উদ্ভূত হয়েছে অনেক নদী। এ সকল নদী এই এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হিমালয়ের সন্নিকটে হওয়ায় প্রবাহিত নদীগুলো বৃষ্টিপাতের তারতম্যের সাথে সাথে প্রায়ই বেশ খরস্রোতা হয়ে উঠে এবং নদীবাহিত মোটা পলি বিস্তৃত পাখাকৃতি প্লাবনভূমিতে (alluvial fan) অবক্ষেপণ করে। তাই এই এলাকার অবক্ষেপগুলোকে পাদদেশীয় অবক্ষেপ (Piedmont deposits) বলা হয়। আর এই এলাকাটিকে পাদদেশীয় পলিজ সমভূমি (Piedmont alluvial plain) বলা হয়।

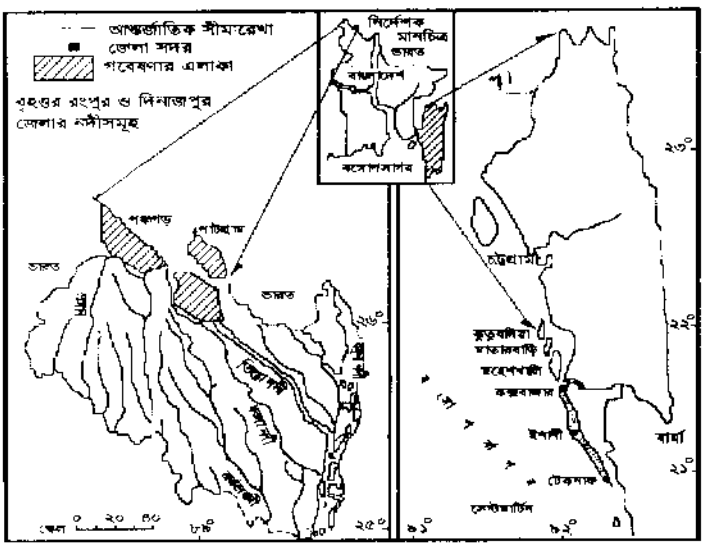

চিত্র ২.৮ : উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান নদীসমূহ। বৃহত্তর রংপুর ও পঞ্চগড় জেলার নুড়িপাথর সমৃদ্ধ এলাকা।

পাটগ্রাম, দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, ডালিয়া, চাপানি, খড়িবাড়ি, কালিগঞ্জ, পঞ্চগড়ের ভোজনপুর, তেতুলিয়া, বোয়ালমারি ইত্যাদি এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে নুড়িপাথরের স্তর পাওয়া যায়। মোটা বালির স্তরের মাঝে মাঝে নুড়িপাথরের এ সকল স্তরের পুরুত্ব অনেক, কোনো কোনো স্থানে ২০ মিটার পর্যন্ত। নুড়িপাথর সংবলিত বালির স্তরে বড় বড় গাছপালার খণ্ড পাওয়া যায়। এ সকল নুড়িপাথর খুবই সতেজ,

গোলাকার নুড়িপাথরের গা অত্যন্ত মসৃণ, উচ্চ স্ফেরিসিটি (sphericity) এবং উচ্চ রাউণ্ডনেস (roundness) মানসম্পন্ন। অধিকাংশ নুড়িপাথরই গ্রানাইট (Granite) কোয়ার্টজাইট (Quartzite), নিস (Gneiss) ও সিস্ট (Schist) সমৃদ্ধ। পঞ্চগড় এলাকার এ সকল মোটাবালি ও নুড়িপাথরের পর্যায়িত স্তরসমূহকে **পঞ্চগড় নুড়িপাথরের স্তর** বলা হয়। পঞ্চগড় স্তরের উপরে বেশ কয়েকটি বালি বা সিল্ট বালি স্তর দেখা যায়। এ স্তরগুলোকে **বোয়ালমারি বালি সংঘ** বলা হয় (চিত্র ২.৯)। বোয়ালমারি বালি সংঘের মধ্যে চারটি কালচে

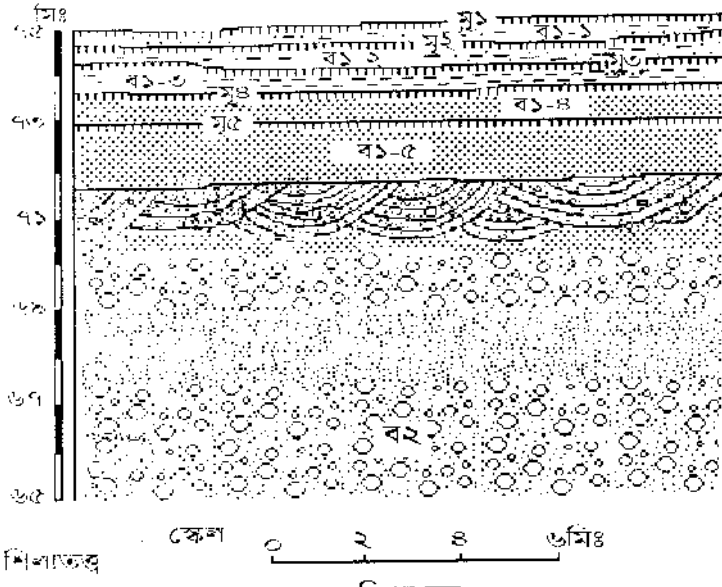

চিত্র ২.৯ : পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া থানার বোয়ালমারির নুড়িপাথর খাদের ভূতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদ।

জৈব পদার্থসমৃদ্ধ আচ্ছাদিত মৃত্তিকা দেখা যায়। এই আচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপর ভিত্তি করে বোয়ালমারি সংঘকে পাঁচটি অনু-এককে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই পাঁচটি অনু-এককে হলোসিনের পাঁচটি অনু-শ্রেণীর সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে। পাথরগড় নুড়িপাথরের স্তরটি ঊর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন বলে মনে করা হয়।

চিত্র ২.১০ : জৈন্তাপুর এলাকার মানচিত্র।

(ঙ) জৈন্তপুর এলাকার কোয়াটারনারি অবক্ষেপের স্তরক্রম (Quaternary Straigraphy of the Jaintiapur Area)

আসাম মেঘালয় পাহাড় শ্রেণীর বর্ধিতাংশই হচ্ছে জৈন্তাপুর পাহাড় শ্রেণী (চিত্র ২.১০)। জৈন্তাপুর এলাকার উত্তরে বিখ্যাত দুটি পাহাড় খাসিয়া ও জৈন্তা। গোলাকৃতি পাহাড়গুলোতে প্রচুর গালি (gully), স্পার (spur) ও ক্লিফ (খাড়া পাহাড়) আছে। পাহাড়গুলোর মধ্যে মোটা বা খাড়া উপত্যকা আছে।

জৈন্তাপুর সদর, মোকামবাড়ি, সোনাটিলা, মুসলিম নগর ইত্যাদি পাহাড়ের চূড়াগুলো অত্যন্ত ক্ষয়িত নুড়িপাথরের দ্বারা আবৃত। এ সকল নুড়িপাথর সাধারণত গ্রানাইট, কোয়ার্টজাইট, বেলেপাথর ও সেল দ্বারা সমৃদ্ধ। বেলেপাথর ও শেলের নুড়িপাথরগুলো বলতে গেলে পুরোটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। আর অন্যান্য নুড়িপাথরেরর শুধু উপরের পৃষ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ইভান্স (১৯৩২) এ সকল নুড়িপাথরকে প্লায়োপ্লেইস্টোসিন উপযুগের বলে ধারণা করেছেন। ধারণা করা যায়, এ সকল নুড়িপাথর ডিহিং সংঘের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল নুড়িপাথর সুরমা সংঘ দলের শেলকে ক্ষয়সাধন করে ক্ষয়িত তলে অবক্ষেপিত হয়েছে। অবক্ষেপণের পর টেকটনিক আন্দোলনের ফলে এগুলো উপরে ওঠে এবং পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে। এই নুড়িপাথর পাহাড়ের মাথাগুলোকে টুপির মতো ঢেকে রেখেছে। এগুলোকে **উচ্চ টেরাস নুড়িপাথর** বলা হয়। পক্ষান্তরে, দাউকী ও শ্রীপুরে আরো কিছু নুড়িপাথরের স্তর উপত্যকার গায়ে বা বর্তমান নদী উপত্যকায় দেখা যায় যেগুলোকে **নিম্ন টেরাস নুড়িপাথর** বলা। ভোলাগঞ্জ এলাকাতেও বিন্দাটিলার নুড়িপাথর, উচ্চ টেরাসের নুড়িপাথর এবং ঐ এলাকার বর্তমান নদীসমূহের নুড়িপাথরকে নিম্ন টেরাসের নুড়িপাথর বলা হয়। জৈন্তাপুর এলাকার উচ্চ টেরাসের নুড়িপাথরকে **সোনাটিলা নুড়িপাথরের স্তর** এবং ভোলাগঞ্জ এলাকার উচ্চ টেরাসের নুড়িপাথরের স্তরকে **ভোলাগঞ্জ নুড়িপাথরের স্তর** বলা হয়।

সোনাটিলা ও ভোলাগঞ্জ নুড়িপাথরের স্তরগুলো ডিহিং সংঘের অন্তর্ভুক্ত। এই নুড়িপাথরের ক্ষয়প্রাপ্তের পরিমাণ দেখে এগুলো নিম্ন প্লেইস্টোসিন কালের বলে অনুমান করা হয়েছে। সে হিসেবে এগুলো মধুপুর সংঘের সমকালীন অবক্ষেপ। তাই লালমাই পাহাড়ের উপরের লালমাটি বা মধুপুর সংঘও নিম্ন প্লেইস্টোসিন কালের। অর্থাৎ এ দুটি পাহাড় শ্রেণী (লালমাই ও জৈন্তাপুর) নিম্ন প্লেইস্টোসিনের পরবর্তী সময়ে ভূ-আন্দোলনের ফলে উপরে উত্তোলিত হয়েছে। মধ্য প্লেইস্টোসিনের টেকটনিক আন্দোলনের কথা অনেকেরই জানা। হয়তোবা এ সকল পাহাড় শ্রেণী মধ্য প্লেইস্টোসিনকালে টেকটনিক আন্দোলনের ফলে উপরে উত্তোলিত হয়েছে। উর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন কালের অনেক টেরাস এখনকার প্রবাহিত অনেক নদীর পাশেই নিম্ন টেরাস আকারে দেখা যায় (চিত্র ২.১১)।

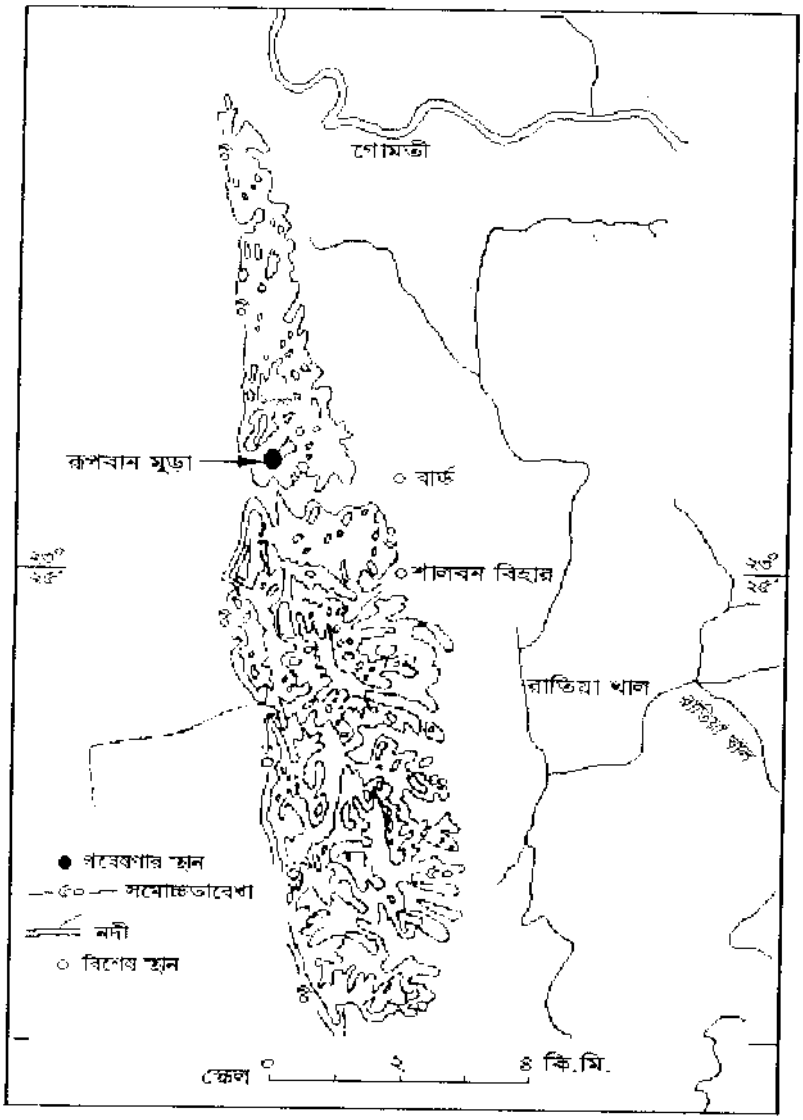

চিত্র ২.১১ : কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়িয়া এলাকার মানচিত্র।

বিভিন্ন স্তরীয় এককের মধ্যে পারম্পর্য স্থাপন (Correlation of Different Units and Subunits)

মধুপুর ও বরেন্দ্র এলাকার লালমাটি অনেকটা একই রকম। মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের নিম্নের তিনটি সভ্য মেরু প্রবণতা জারামিলো ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। এই দুটি সংঘের তিনটি সভ্যের মধ্যে ধারণকৃত পাললিক গঠন একই রকম। তাই এ দুটি সংঘের তিনটি সভ্য সমকালীন ও সমতুল (সারণি ২.৪)। মধুপুর সংঘের উপরিস্থিত কালসি স্তরদ্বয়ের নিম্নস্তরের মেরু প্রবণতা ও বরেন্দ্র সংঘের উপরিস্থিত গৌরীপুর স্তরের মেরু প্রবণতা একই রকম ; উল্টামেরু প্রবণতা। এই মেরু প্রবণতা জারামিলোর উপরে এবং ব্রানহেসের নিচে মাতুইয়ামা যুগের উপরের অংশ। ভূচৌম্বকের মেরু প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ও স্তরীয় বিন্যাস বিবেচনা করে এ দুটি স্তরকে সমকালীন ও সমতুল মনে করা যেতে পারে।

সারণি ২.৪ : মধুপুর, বরেন্দ্র, পঞ্চগড় ও চলনবিল এলাকাসমূহের কোয়াটারনারি স্তরক্রমের পারম্পর্য (সূত্র : মনসুর, ১৯৯৫)।

হলোসিন শ্রেণী মধুপুর, বরেন্দ্র, চলনবিল ও পঞ্চগড় এলাকায় বিস্তৃত। মধুপুর এলাকার হলোসিন সময়ের অবক্ষেপগুলোকে বাসাবো সংঘ বলা হয়। এই বাসাবো সংঘের পাঁচটি স্তরের মধ্যে প্রাপ্ত কাষ্ঠখণ্ডের রেডিওকার্বনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স অনুযায়ী বাসাবো সংঘকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং বাসাবো সংঘের পাঁচটি স্তরকে হলোসিনের পাঁচটি অনুশ্রেণীর সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে। বাসাবো সংঘকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করার ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে উক্ত সংঘে ধারণকৃত চারটি আচ্ছাদিত মৃত্তিকা। এই চারটি আচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপস্থিতি পঞ্চগড় এলাকার বোয়ালমারি এবং বরেন্দ্র এলাকার রহনপুর সংঘদ্বয়ের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। এই চারটি আচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপর ভিত্তি করে বাসাবো, রহনপুর ও বোয়ালমারি সংঘ তিনটির প্রতিটিকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই স্তরগুলোকে স্তরীয় অবস্থান অনুযায়ী সমকালীন ও সমতুল বলে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে। আর এই পাঁচটি স্তরকে রেডিওকার্বন পদ্ধতিতে নির্ণেয় বয়স অনুযায়ী হলোসিনের পাঁচটি অনুশ্রেণীর সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে। চলনবিল এলাকার চলনবিল সংঘের দুটি স্তরকে হলোসিনের উপরের দুটি অনুশ্রেণীর সাথে পারম্পর্য স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য এলাকার ন্যায় চলনবিল সংঘে নিচের তিনটি স্তর পাওয়া যায় না। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, অন্যান্য এলাকায় যখন নিচের তিন স্তরের অবক্ষেপণ চলছিল ঠিক সেই সময়েও চলনবিল এলাকায় ক্ষয়সাধন চলছিল। অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে চলনবিল এলাকায় স্রোতের প্রবল টানে চলছিল ক্ষয়সাধন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সোনাটিলা ও ভোলাগঞ্জ নুড়িপাথরের স্তর দুটি নিম্ন প্লেইস্টোসিন সময়ের যার সাথে সময়ের দিক থেকে মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের নিচের তিনটি সভ্যকে তুলনা করা যেতে পারে। পঞ্চগড় নুড়িপাথরের স্তর ঊর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘদ্বয়ের অবক্ষেপণের প্রতিবেশ (Depositional History of the Madhupur and Barind Formations)

মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘদ্বয়ের মধ্যে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি যা দেখে বলা যায় অবক্ষেপগুলো সমুদ্রজাত। ১৯৫৬ সনে মরগান ও ম্যাকিনতার এই সংঘ দুটিকে প্লাবনাক্ষেপ (fluvial) বলে অনুমান করেন। আর এই ধারণা পোষণ করেই তাঁরা মধুপুর ও বরেন্দ্রভূমির এই লালমাটির ভূখণ্ডগুলোকে এক একটি আলাদা টেরাস মনে করে মিসিসিপি নদীর অববাহিকায় বিস্তৃত টেরাসের সাথে তুলনা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৮৬ সনে মোঃ হাসান ও ১৯৯০ সনে বর্তমান লেখক পলিতত্ত্বের স্থিতিমাপ (Sedimentological Parameter) ব্যবহার করে প্রতিবেশ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। পলিতত্ত্বের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী প্লাবনাক্ষেপ বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। এই অবক্ষেপের নিম্ন সভ্যে সংরক্ষিত আছে প্রাথমিক পাললিক গঠন, তরঙ্গ ছাপ (ripple

mark) ও ক্রস-স্তর (cross bedding)। এ ছাড়াও অবক্ষেপণের মধ্যে পাওয়া যায় ঘাসের মূল ও কাষ্ঠ-খণ্ড যা প্লাবনাবক্ষেপণের বিশেষ নিদর্শন বলে ধরা হয়। বর্তমান লেখকের মাইক্রোমরফোলজিক্যাল (Micromorphological) গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘদ্বয় মিশ্রিত মৃত্তিকা। অসংখ্য মৃত্তিকার সংমিশ্রণে এ দুটি সংঘ গঠিত হয়েছে যার পললক্ষেপণ হয়েছে বছরে মাত্র কয়েক মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার। সুতরাং এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সংঘ দুটি প্লাবনাবক্ষেপজাত।

নব কোয়াটারনারির মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এবং বাংলা বেসিনের অবক্ষেপণের ইতিহাস

(Late Quaternary Monsoon Climatic Influence and the Depositional History of the Bengal Basin)

এটি এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, উচ্চ অক্ষাংশে যখন হিমযুগ চলছিল তখন নিম্ন অক্ষাংশে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করছিল। পক্ষান্তরে উচ্চ অক্ষাংশের হিমবিরতিকালে নিম্ন অক্ষাংশে ঘটেছিল প্রবল বৃষ্টিপাত। গত হিমযুগের শেষে অর্থাৎ প্রায় ১৮ হাজার বছর আগে হিমক্রিয়া সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে। সমুদ্রের পানি বরফ আকারে স্থলভাগে জমা হওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠ সর্বনিম্ন অবস্থানে পৌঁছে। আর এ অবস্থান বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা প্রায় ১০০ থেকে ১৩০ মিটার নিচে ছিল। হিমালয় পর্বত শ্রেণী সে সময়ে বেশ উঁচু হয়ে যায় এবং পর্বত চূড়াগুলো হিমাবৃত হয়। সে সময়ে হিমরেখা (snow line) পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত নেমে আসে। বরফ গলা পানি নদী দিয়ে বাংলা বেসিনের উপর দিয়ে দক্ষিণে, বহুদূরে, এখনকার সমুদ্রতীর থেকে কয়েকশত কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। ভারত উপমহাদেশে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ইতিহাস থেকে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, ২২ হাজার থেকে ১৫ হাজার বছর আগে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রাধান্য লাভ করে। স্থলভাগের উপর দিয়ে এ বায়ু আসতো বলে খুব কমই বৃষ্টিপাত ঘটাতো। ফলে, বাংলাদেশের উপরে প্রবাহিত নদীগুলো ছিল খুবই সংকীর্ণ এবং ঐ সকল নদী দিয়ে শুধু বরফ গলা পানিই সাগরের দিকে প্রবাহিত হতো। তখনকার সমুদ্রপৃষ্ঠ এখনকার চেয়ে ১০০ মিটারের মতো নিচে থাকায় নদীগুলো বাংলা বেসিনে গভীর খাদ সৃষ্টি করেছিল। ১৫ হাজার বছরের পর থেকেই মৌসুমী বায়ুর গতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ১২ হাজার বছরের আগেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রাধান্য বিস্তার করে এবং প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেকালের বৃষ্টিপাতের মাত্রা এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। পৃথিবীর আবহাওয়া সে সময়ে বেশ গরম হয়ে উঠে এবং স্থলভাগের বরফ গলতে শুরু করে; হিমালয়ের বরফও দ্রুত গলতে শুরু করে। হিমালয়ের এই দ্রুত বরফ গলা পানি এবং মৌসুমী বায়ুর অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পানি একযোগে প্রচণ্ডবেগে বাংলা বেসিনের ঐ সকল সংকীর্ণ নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত পানি ঐ সকল ক্ষীণ নদীগুলো ধারণ করতে পারে না ; নদীগুলো কানায় কানায়

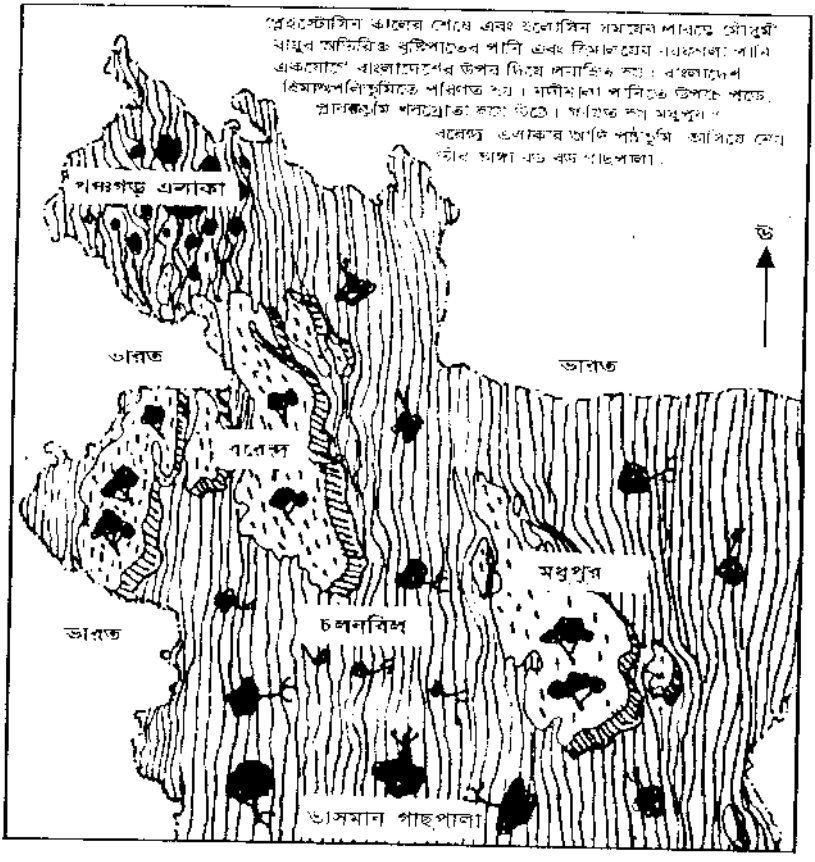

চিত্র ২.১২ : প্লেইস্টোসিন সময়ের শেষে এবং হলোসিন সময়ের শুরুতে বাংলা বেসিনের উপর মৌসুমী বায়ু প্রভাবের কিছু ঘটনাবলী।

ভরে উঠে এবং পার্শ্ববর্তী প্লাবন ভূমিতে উপচে পড়ে (চিত্র ২.১২)। বরেন্দ্র এলাকা থেকে মধুপুরসহ লালমাই এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত তখনকার ঐ প্লাবন ভূমি ছিল লালমাটিতে আবৃত (বরেন্দ্র ও মধুপুর সংঘ)। বরফ গলা পানি ও মৌসুমী বায়ুর তীব্রমাত্রার এ প্রবল ঢল বাংলা বেসিনের উপর দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হতে থাকলে লালমাটির প্লাবন ভূমির নিচু এলাকা বিশাল বিশাল নদীতে রূপান্তরিত হয়। মধুপুর ও বরেন্দ্র এলাকার লালমাটি আবৃত প্লাবন ভূমি ক্ষয় হতে থাকে। মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী কোনো কোনো স্থানে বরেন্দ্র ও মধুপুর সংঘের পুরোটাই ক্ষয় হয়ে বিলীন হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো স্থানে রয়ে যায় নিচের দু' একটি সভ্য। লালমাটির উপরের অংশ ক্ষয় হয়ে গেলেও বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকায় উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বী অনেক লালমাটির ভূখণ্ড রয়েই যায়। উত্তর-দক্ষিণ

লম্বালম্বী ভূখণ্ডগুলো উত্তর-দক্ষিণ স্রোতধারাই নির্দেশ করে। এ সকল ভূখণ্ডের পার্শ্বে প্রবল স্রোতের আবর্তে তৈরি করে বিরাট গভীর খাদ। মধুপুর এলাকায় এ সকল গভীর খাদ জলাশয় আকারে রয়ে গেছে।

মৌসুমী বায়ুর অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পানি এ সকল লম্বা ভূখণ্ডের উপর দিয়ে স্রোতাকারে ঢেলে দেয় পার্শ্বে প্রবাহিত প্রধান স্রোতে। ফলে এ সকল লালমাটির লম্বা ভূখণ্ডে তৈরি হয় নদী উপত্যকা। বর্তমানে তখনকার মতো বৃষ্টিপাত না থাকায় ঐ সকল উপত্যকা মৃতপ্রায় এবং এখন ঝুলন্ত উপত্যকা (Hanging valley) হিসেবে রয়ে গেছে।

হিমালয়ের পাদদেশে হিমযুগে জমে উঠা মোরেন ও টিল (হিমকর্দ) প্রবল স্রোতের টানে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। স্রোতের প্রবল টানে দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত নদীতল দিয়ে গড়তে গড়তে আসে। দহগ্রাম থেকে পঞ্চগড় পর্যন্ত বিশাল এলাকায় জমে উঠে মোটাবালি ও নুড়িপাথরের অসংখ্য বিশাল স্তর যাকে আমরা বলি পঞ্চগড় নুড়িপাথরের স্তর (চিত্র ২.১)।

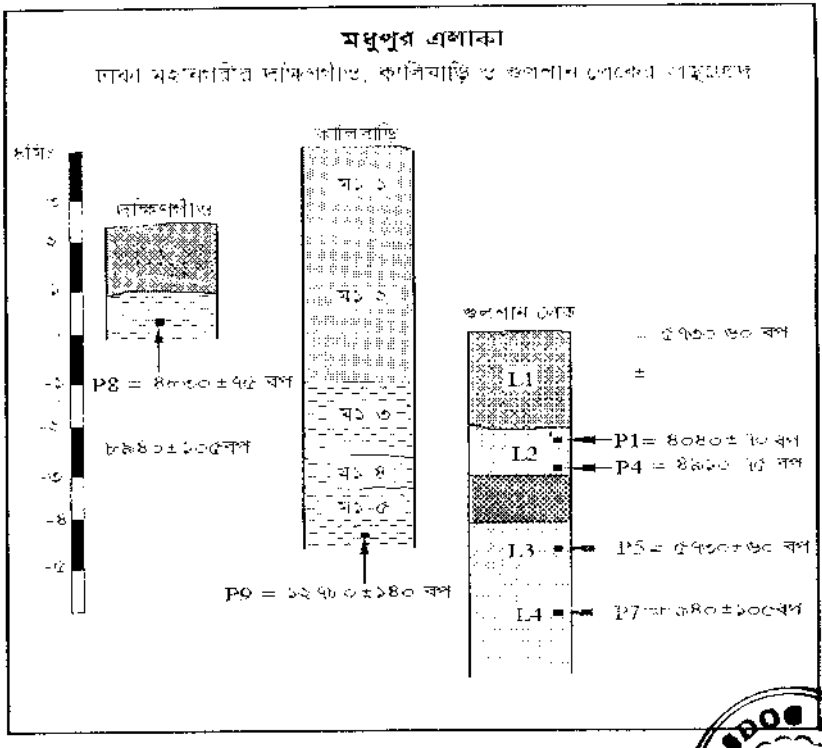

চিত্র ২.১৩ : কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে নির্ণেয় শিলার বয়সকাল।

নদীর প্রবল স্রোতের টানে দু'কূল ভেঙ্গে গাছপালা নিমজ্জিত হয় নদীগর্ভে। তাই ঐ সময়ের বালি ও নুড়িপাথরের স্তরে এবং তৎকালীন অবক্ষেপের মধ্যে পাওয়া যায় বিরাট কাষ্ঠখণ্ড বা আস্ত গাছ। কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে নির্ণেয় এ সকল গাছের বয়স হলোসিন সময় নির্দেশ করে (চিত্র ২.১৩)।

ঠাণ্ডা থেকে উষ্ণ আবহাওয়ার এ রূপান্তরে সাগরপৃষ্ঠ দ্রুত উপরে উঠতে থাকে। ফলে বাংলা বেসিনের উপরে প্রবাহিত নদীর স্রোতের গতিতে বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠায় খরস্রোতা নদী হয়ে উঠে মন্থর বা ধীর গতিসম্পন্ন। নদী উপত্যকা ও প্লাবন ভূমির ক্ষয়িত অংশগুলো ভরে উঠে নতুন নুতন তলানি দ্বারা। এই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় লালমাটির ক্ষয়িত অংশে বা ক্ষয়িত তলে জমে উঠা নব অবক্ষেপই হলো হলোসিন শ্রেণী (বাসাবো, রহনপুর, চলনবিল, বোয়ালমারি সংঘসমূহ)।

সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠতে উঠতে প্রায় ৫,৫০০ বছর আগে এখনকার সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা প্রায় এক থেকে দেড় মিটার উপরে উঠে (চিত্র ৪.৬)। এ সময়েও মৌসুমী বায়ুর আরোও একটি অতি বৃষ্টির ঘটনা ঘটে। উত্তরের ঢলগড়া স্বাদুপানি দিয়ে ভরে উঠে নদী এবং নদীর মোহনা। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠলেও বাংলা প্লাবন ভূমির নিম্ন দক্ষিণাঞ্চলে স্বাদুপানির চাপে লবণাক্ত পানি উত্তরে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি।

বাংলা বেসিনের ক্ষয়িত এলাকা নব তলানি দিয়ে ভরাট হলেও নব অবক্ষেপের উপরের পৃষ্ঠ লালমাটির উপরের তল পর্যন্ত সমান হতে পারে নি। ফলে বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকার লালমাটির ভূখণ্ডগুলো পার্শ্ববর্তী প্লাবনভূমি অপেক্ষা উঁচু হিসেবেই রয়ে যায়। তাই অনেকেই বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকাকে নব টেকটনিকের কারণে উঁচু বললেও বর্তমান লেখক ক্ষয় সাধনের ঘটনাকেই মুখ্য কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। লালমাটির ভূখণ্ডের পার্শ্ববর্তী নিম্নাঞ্চলে হলোসিন অবক্ষেপের নিচে কোনো কোনো স্থানে যে লালমাটি পাওয়া যায় তা' মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের মধ্য বা নিম্ন সভ্য। কোথাও একেবারেই মধুপুর বা বরেন্দ্র সংঘের কোনো অংশই পরিলক্ষিত হয় না। কৌশলের কারণে লালমাটির ভূখণ্ড উপরে উঠলে অবশ্যই পার্শ্ববর্তী নিম্নাঞ্চলে স্তরীয় ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো। অর্থাৎ লালমাটির ভূখণ্ডে বরেন্দ্র বা মধুপুরের তিনটি সভ্য থাকলে পার্শ্ববর্তী হলোসিন দ্বারা আবৃত লালমাটিতেও বরেন্দ্র বা মধুপুরের তিনটি সভ্য থাকতো। এ ছাড়াও আরো একটি যুক্ত হলো, মধুপুরের লালমাটির ভূখণ্ডের পার্শ্বের প্লাবনভূমিতে ক্ষয়িত লালমাটির তলের উপরে (মধুপুর সংঘের নিম্ন সভ্যের উপরে) হলোসিন অবক্ষেপের নিচে যে কাঠখণ্ড পাওয়া যায় তার বয়স প্রায় ১২ হাজার বছর (রেডিওকার্বন পদ্ধতিতে নির্ণেয়)। অর্থাৎ উক্ত স্থানে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে মধুপুর সংঘের উর্ধ্ব ও মধ্য সংঘদ্বয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। উচ্চতা বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪ মিটার।

চলনবিল এলাকা বর্তমান সাগরপৃষ্ঠ হতে প্রায় ১০ মিটার উপরে। হলোসিন অবক্ষেপের নিচের তল অর্থাৎ বরেন্দ্র সংঘের উপরের তলের হাজার বছর আগে

সাগরপৃষ্ঠে দেড় মিটার উপরে উঠলেও ক্ষয়িত তল তৎকালীন সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা আড়াই মিটার উঁচুতে ছিল। তাই ৬ হাজার বছর আগেও চলনবিল এলাকায় ক্ষয়সাধন হয়েছে। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেড় মিটার উপরে উঠায় কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত সৈকত থেকে খাড়া পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত সাগর জলে প্লাবিত হয়েছিল (চিত্র ৪.৬)। উন্মুক্ত সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ আঘাত করতো খাড়া খাড়া পাহাড়গুলোকে। বোকাবিল ও টিপাম সংঘের নরম শিলাগুলো সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সাগরে চলে যেত এবং সমুদ্র সামনের দিকে এগিয়ে চলছিল। বোকাবিল সংঘের ভিতরে যে গোল পাথর বা বিরাট বিরাট কংকর ছিল তা অত্যন্ত ভারি ও শক্ত বলে সৈকতেই রয়ে গেছে ঢেউ প্রতিরোধক হিসেবে। হয়তবা কক্সবাজার-টেকনাফ সৈকত রেখার আরও পশ্চিমে ছিল পাহাড়িয়া এলাকা যা' হলোসিন সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে উপরে উঠার সাথে সাথে ক্ষয়প্রাপ্ত বা বিধৌত হয়ে সাগরেই বিলীন হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠার সাথে সাথে নরম শিলার ক্ষয়সাধনের ফলে সাগর দ্রুত পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। দ্রুত সাগরের সম্মুখগামিতার ফলে সাগরের দিকে মহীসোপানের ঢাক খুবই কম। কক্সবাজারে পূর্বদিকের এলাকা সে সময়ে সাগরের জলে প্লাবিত হয়েছিল। সেন্টমার্টিন ও সোনাদিয়া দ্বীপগুলো সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যায়। মহেশখালি দ্বীপের পশ্চিমাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্র সৈকত পূর্বে অগ্রসর হতে থাকে (চিত্র ৪.৫)। গোরকঘাটা থেকে উত্তর নালবিল পর্যন্ত রাস্তা বরাবর ঐ সৈকত বিস্তৃত ছিল। সে সময়ের পর সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নেমে বর্তমান অবস্থানে আসলে পুরানো সৈকত রেখা ও নতুন সৈকত রেখার মাঝে একটি লবণবিল বোকাবিলের খাড়া পাহাড়ের সামনে বেশি প্রশস্ত। কারণ বোকাবিল পাহাড় ক্ষয় হয়ে যে বিরাট কংকর বা গোল পাথর রেখে যেত তা' সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নামার সময় সৈকতকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করতো। ইনানী এলাকার সৈকত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। টিপামের পাহাড়ি সৈকতে এমন গোল পাথর বা বিরাট কংকর না থাকায় হিমছড়িতে এখনও ঢেউয়ের ফলে পাহাড় ক্ষয় হয়ে সমুদ্র গর্ভে যাচ্ছে। এ সকল বিরাট কংকর আধিক্য অবশ্য পুরা নদীতল নির্দেশ করে। দুপাড় থেকে গড়িয়ে পড়া বিরাট কংকর নদীতলে জমা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সাগরের ক্ষয়সাধনে সকল বালিকণা সাগর গর্ভে চলে যাওয়ায় শুধু কংকরগুলোই বয়ে গেছে। হলোসিন সাগরপৃষ্ঠ নিচে নামায় মহেশখালি দ্বীপের পশ্চিমাংশে তৈরি হয়েছে বিশাল লবণবিল। পুরা সৈকত লাইনের পূর্বাংশে আগের পাহাড়িয়া ভূমিরূপ রয়েই গেছে।

হলোসিন কালে সাগরপৃষ্ঠে বর্তমানের চেয়ে উপরে উঠায় বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠেছে অনেক দ্বীপপুঞ্জ যাদের উপরের তল তখনও উচ্চ জোয়ারের নিচে ছিল। হলোসিন সময়ে অর্থাৎ প্রায় ৫,৫০০ বছর পূর্ব থেকে সাগরপৃষ্ঠ নিচে নেমে বর্তমান অবস্থানে আসায় ঐ সকল নিমজ্জিত দ্বীপ জেগে উঠে। হাতিয়া, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তৃতীয় অধ্যায়

পুরাচৌম্বকত্ব

(Palaeomagnetism)

ভূমিকা

একটি দণ্ড চুম্বকে ঝুলিয়ে রাখলে উত্তর–দক্ষিণ দিক বরাবর থাকে। কম্পাসের কাঁটা উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। একটি চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের কাঁটা উত্তর–দক্ষিণ দিক বরাবর অবস্থানের কারণ হিসেবে বলা হয় পৃথিবীই একটি চুম্বক যার দক্ষিণ মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরুর সন্নিকটে এবং যার উত্তর মেরু ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর অতি সন্নিকটে। ভূচুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যথাক্রমে দণ্ডচুম্বক বা কম্পাসের দক্ষিণ ও উত্তর মেরুকে তার নিজের দিকে টানে। তাই চুম্বকদণ্ড ভৌগোলিক উত্তর–দক্ষিণ দিক বরাবর থাকে। পৃথিবীর এই চৌম্বকত্বের স্বভাবকেই **ভূচুম্বক** (Geomagnetism) বলা হয়। চৌম্বকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে একটি দুই মেরু (diapole) বিশিষ্ট দণ্ড চুম্বক (bar magnet) হিসেবে কল্পনা করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা পৃথিবী দণ্ড চুম্বকের ভৌগোলিক উত্তর মেরুর (Geographic North pole) সন্নিকটের মেরুকে **ভূচৌম্বকের উত্তর মেরু** (Geomagnetic North pole) এবং ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটের মেরুকে **ভূচৌম্বকের দক্ষিণ মেরু** (Geomagnetic South pole) বলবো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ভূতাত্ত্বিক সময়ে (Geological time) ভূচুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বহুবার দিক পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ কোনো কোনো ভূতাত্ত্বিক সময়ে এখনকার উত্তর মেরু স্থান পরিবর্তন করে দখল করে নিয়েছে বর্তমান দক্ষিণ মেরুর স্থান, তেমনি দক্ষিণ মেরু দখল করেছে বর্তমান উত্তর মেরুর স্থান। ভূচুম্বকের দুই মেরুর পরস্পর স্থান পরিবর্তনের ঘটনাকে **ভূচুম্বকের মেরু উল্টান** (Geomagnetic reversal) বলা হয়। এইতো সবেমাত্র এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভূচুম্বকের মেরু উল্টানোর এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ভূবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভূতাত্ত্বিক সময়ে ভূচুম্বকের দু'মেরুর স্থান পরিবর্তনের এ লুকোচুরি খেলা ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক **ব্রানহেস** (Brunhes) এর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। আগ্নেয়গিরির লাভাকে উত্তপ্ত কিছু পোড়া কাদা (backed clay) নিয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে তিনি লক্ষ্য করলেন যে লাভার উত্তাপে উত্তপ্ত পোড়া কাদায় ধারণকৃত চৌম্বকাবশেষের (Remanent magnetization) দিক ঠিক লাভার চৌম্বকাবশেষের মতো স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে

উল্টা চুম্বকিত (reversely magnetised) লাভার সাথে সম্পর্কযুক্ত পোড়া কাদায় ধারণকৃত চৌম্বকাবশেষ উল্টা দিকে। এ ঘটনা থেকেই তিনি বলেন ভূচুম্বকের দুই মেরু ভূতাত্ত্বিক সময়ে পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে।

১৯১২ সালে জাপানের নাকামুরা এবং কিকুচি দেখাতে সক্ষম হন যে, আগ্নেয়গিরি থেকে বিক্ষিপ্ত লাভা ঠাণ্ডা হলে তার মধ্যে যে চুম্বকের কণা থাকে সেগুলো সমকালীন ভূচুম্বকের দিক বরাবর চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। এর অল্প কিছু দিন পরেই বিখ্যাত জাপানি বিজ্ঞানী মাতুইয়ামা (১৯২৯) জাপান, কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে সংগৃহীত টারশিয়ারি এবং কোয়াটারনারির আগ্নেয়শিলার উপর গবেষণা চালিয়ে প্রস্তাব করেন যে, নবকোয়াটারনারির নবীন শিলাগুলো ভূচুম্বকের দিক বরাবর চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, পুরাকোয়াটারনারিতে গঠিত শিলাগুলোর উল্টা মেরুপ্রবণতা (reverse polarity) দেখা যায়, আবার এর চেয়ে কিছু পুরানো শিলার চৌম্বকত্বের দিক বর্তমানের মতোই। ১৯২৫ সনে শেভালিয়ার (Chevallier, 1925) এটনা আগ্নেয়গিরির লাভা গবেষণা করে দুই হাজার বছরের ব্যাপক ব্যবধানের (secular variation) তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন।

প্রাচীনকালের পুরাচৌম্বকত্ব এবং প্রত্নচৌম্বকত্ব (Archaeomagnetism) এর গবেষণায় সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে বা কৃত্রিমভাবে উত্তপ্ত দ্রব্যসামগ্রীই প্রচলিত প্রাধান্য পেত, কারণ সেকালের যন্ত্রপাতি ছিল অনুন্নত এবং সেগুলো দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রকে (weak magnetic field) শনাক্ত করতে পারতো না। বর্তমানের চৌম্বক মাপক যন্ত্র অত্যাধুনিক। এগুলো অত্যন্ত অনুভূতিশীল এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম চৌম্বক ক্ষেত্রকে শনাক্ত করতে সক্ষম।

যাহোক, এখন এটি সর্বস্বীকৃত যে, ভূতাত্ত্বিক সময়ে ভূচুম্বক অনেকবার তার দিক পরিবর্তন করেছে, অর্থাৎ এখনকার ভূচুম্বকের উত্তর মেরু অতীতে কখনও বা ছিল ভূচুম্বকের দক্ষিণ মেরু আর বর্তমানের ভূচুম্বকের দক্ষিণ মেরু ছিল তখনকার ভূচুম্বকের উত্তর মেরু। ভূচুম্বকের দুই মেরুর এরূপ স্থান পরিবর্তনের ঘটনাকে **মেরু স্থানান্তর** (polarity reversal) বলা হয়।

ভূচৌম্বকত্ব (Geomagnetism)

অনেকেই বলেন পৃথিবী একটি দণ্ড চুম্বক যার উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরুর কাছে এবং দক্ষিণ মেরু ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর কাছে। পৃথিবীর কেন্দ্রকে দ্বিমেরুবিশিষ্ট ভূচুম্বকের কেন্দ্র হিসেবে ধরা যায়। এই দ্বিমেরুবিশিষ্ট ভূচুম্বকের অক্ষটি পৃথিবীর ঘূর্ণাক্ষের (rotational axis) সাথে ১১$\frac{1}{2}$ ডিগ্রি কোণ ধারণ করে আছে। ভূচুম্বকের মেরুদ্বয় ভৌগোলিক মেরুর মতো ভূপৃষ্ঠে নয় ; ভূপৃষ্ঠ থেকে বেশ গভীরে। ভূচুম্বকের অক্ষটি বর্ধিত করলে তা ভৌগোলিক মেরুকে ছেদ করবে না। ভূপৃষ্ঠের যে দু' জায়গায় ছেদ

করবে তার একটিকে ভূচুম্বকের **উত্তর মেরু** ও অন্যটিকে ভূচুম্বকের **দক্ষিণ মেরু** বলা হয়। বর্তমানে উত্তর মেরু কানাডায় (৭৩° উ: ১০০° প:) ও আন্টার্কটিকায় (৬৮° দ: ১৪৩° পূ:) অবস্থিত। কম্পাসের কাঁটার চৌম্বকত্বের নিরক্ষরেখার উপর সমান্তরাল থেকে যতই মেরুর দিকে যাওয়া যায় ততই নতি বাড়তে থাকে। কানাডার ও আন্টার্কটিকার ঐ দুই স্থানে কম্পাসের কাঁটার নতি ৯০°। ভূচুম্বকের চৌম্বকশক্তি অনেক। ভূচুম্বকের দুই মেরুর সন্নিকটে চৌম্বকশক্তি সবচেয়ে বেশি (প্রায় ০.৭ ওয়েস্টেড) এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে সবচেয়ে কম প্রায় ০.২৫ (দক্ষিণ ব্রাজিলের ২৫ দ: ৪৫° প: স্থানে)।

ভূচৌম্বকের ক্ষেত্র পরিবর্তন (Reversal of Geomagnetic Field)

পৃথিবী কেন যে চৌম্বকত্ব দেখায় বা পৃথিবী কেন যে একটি দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে এর সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত মেলেনি। আমরা জানি ম্যাগনেটাইট ৫৭৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চৌম্বকত্ব হারায়। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে যে পরিমাণ তাপ রয়েছে তাতে চৌম্বকত্ব থাকার কথা নয়। তবুও পৃথিবী একটি চুম্বক। এ ঘটনা আশ্চর্যের বিষয় বটে।

ভূচৌম্বকত্বের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয় সর্বদা একই স্থানে থাকে না। সকাল-বিকাল কিছুটা স্থান পরিবর্তন করলেও দিন ও রাতের পরিবর্তনের মাত্রা লক্ষণীয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতারও পরিবর্তন হয়। অনেক সময়েই দেখা যায় সকালে ভূচৌম্বকের মেরু এক স্থানে থাকে এবং বিকালে অন্য স্থানে চলে যায় ; আবার রাতে পূর্ব স্থানে ফিরে আসে। একইভাবে চৌম্বকত্বের তীব্রতার পার্থক্য দেখা যায়। ভূচৌম্বকত্বের এমন পরিবর্তনকে **ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের দিবা-রাত্রির পরিবর্তন** বলে (Diarnal variation of geomagnetic field)। এভাবেই **চৌম্বক ক্ষেত্রের বার্ষিক পরিবর্তন** (Annual variation of Geomagnetic field) দেখা যায়। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের কয়েকশ বছরের এরূপ পরিবর্তনকে **ব্যাপক ব্যবধান** (secular variation) বলা হয়। জিওফিজিক্যাল কেন্দ্রগুলোতে ভূচৌম্বকত্বের তীব্রতা (Intensity of geomagnetic field) ও নতি চৌম্বক মাপক যন্ত্রের সাহায্যে নথিভুক্ত করা হয়। কয়েকশ বা কয়েক হাজার বছরের ব্যাপক ব্যবধানের রেখাচিত্র (curve) থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদির বয়স নির্ণয় করা হয়। দিবা-রাত্রির বা ব্যাপক ব্যবধানের অবনমন বা চৌম্বিক কোণ (magnetic declination) খুব বেশি নয়। ব্যাপক ব্যবধানের চৌম্বিক কোণ বা অবনমন সর্বদাই ৯০° এর কম থাকে। ভূকেন্দ্রের আলোড়নের ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের অত্যন্ত সাময়িক পরিবর্তন ঘটে। যার ফলে দুই চুম্বকের মেরুর স্থানচ্যুতি ঘটে ; যাকে আমরা **চৌম্বক ঝড়** (magnetic storm) বলে থাকি। চৌম্বক ঝড়ের ফলে চৌম্বক মেরু স্বল্পকালের জন্য সরে যায়। আবার ভূকেন্দ্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই পূর্বস্থানে ফিরে আসে। চৌম্বক ঝড়েও চৌম্বক মেরুর অবনমন বা চৌম্বক কোণ ৯০° এর বেশি হয় না। ভূচৌম্বকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় দিক হলো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন যাকে ইতঃপূর্বে **চৌম্বক ক্ষেত্র**

উল্টানো (geomagnetic reversal) বলা হয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্র উল্টানোতে অবনমন ৯০° এর বেশি হয়। অর্থাৎ অবনমনের পরিমাণ ৯০° ছেড়ে গেলে চৌম্বক ক্ষেত্র দিক পরিবর্তন করেছে বলে ধরে নেয়া হয়। কি কারণে চৌম্বক ক্ষেত্র দিক পরিবর্তন করে তার সঠিক তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে ভূতত্ত্ববিদ্যায় অনেক ব্যাখ্যাই পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভূচুম্বকের মেরুদ্বয়ের বর্তমানের ন্যায় উত্তর দক্ষিণ অবস্থানকে আমরা বলবো **ভূচুম্বকের সিধা মেরু প্রবণতা** (geomagnetic normal polarity) এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দিক পরিবর্তন করার ফলে বর্তমান উত্তর মেরুর দক্ষিণে এবং দক্ষিণ মেরুর উত্তরের অবস্থানকে আমরা বলবো **উল্টা মেরু প্রবণতা** (reversed polarity)।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ভূতাত্ত্বিক সময়ে বহুবার দিক পরিবর্তন করেছে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন হয় কিনা তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র বা ধূমকেতুর অবস্থান যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এ সকল গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের কারণেই চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতার সাময়িক পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তনের ঘটনায় লেখকের মনে এটাই প্রশ্ন জাগে — পৃথিবীকে কি এমন কোনো ধূমকেতু উপবৃত্তাকারে বা অধিবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে যার ধূলিকণা উচ্চ চুম্বকীয় এবং যে ধূমকেতুর চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী। কে জানে হয়তোবা এমন কোনো উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট ধূমকেতুর প্রদক্ষিণে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন হয়ে যায়। এ ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে পারে যেমনটি ঘটে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন করার বেলায়।

ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনেক লম্বা সময় ধরে $১০^৬ - ১০^৯$ বছর মেরুদ্বয়ের গড় অবস্থানকে **ভূচৌম্বক মেরু যুগ** (geomagnetic polarity epoch) বলা হয়। একটি চৌম্বক যুগে মেরুদ্বয় গড়পড়তা একই দিক নির্দেশ করে। চৌম্বক যুগে হঠাৎ করে অল্প সময়ের জন্য ($১০^৩ - ১০^৭$) চৌম্বক ক্ষেত্র দিক পরিবর্তন করে উল্টা অবস্থানে থাকলে তাকে **ভূচৌম্বক মেরু ঘটনা** (geomagnetic polarity event) বলা হয়। একটি চৌম্বক যুগে এক বা একাধিক মেরু ঘটনা ঘটতে পারে। ব্যাপক ব্যবধানে স্থিতিকাল কয়েক হাজার বছর হলেও মেরুদ্বয় ঠিক উল্টা অবস্থান নেয় না। চৌম্বিক যুগের নামকরণ বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানীর নামানুসারে করা হয়েছে। যেমন বর্তমানে সিধা মেরুকে **ব্রানহেস সিধা মেরু প্রবণতার যুগ** (Brunhes normal polarity epoch) বলা হয় (চিত্র ৩.১)। ৭৩০ হাজার বছর ধরে বর্তমানের এমন সিধা মেরুর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ২.৪৮×১০^৬ থেকে ০.৭৩×১০^৬ বছরের মধ্যে চৌম্বক মেরুর গড় অবস্থান উল্টা দিকে। এই উল্টা মেরু প্রবণতাকে **মাতুইয়ামা উল্টা মেরু প্রবণতার যুগ** (Matuyama reversed polarity epoch) বলা হয়। এ ছাড়াও **গাউস সিধা মেরু প্রবণতা যুগ** (Gauss normal-polarity epoch) এবং **গিলবার্ট উল্টা মেরু প্রবণতা যুগ** (Gilbert reversed polarity epoch) উল্লেখযোগ্য। চুম্বক মেরু ঘটনাগুলোর নামকরণ যে স্থানে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে তদানুসারে করা হয়ে থাকে।

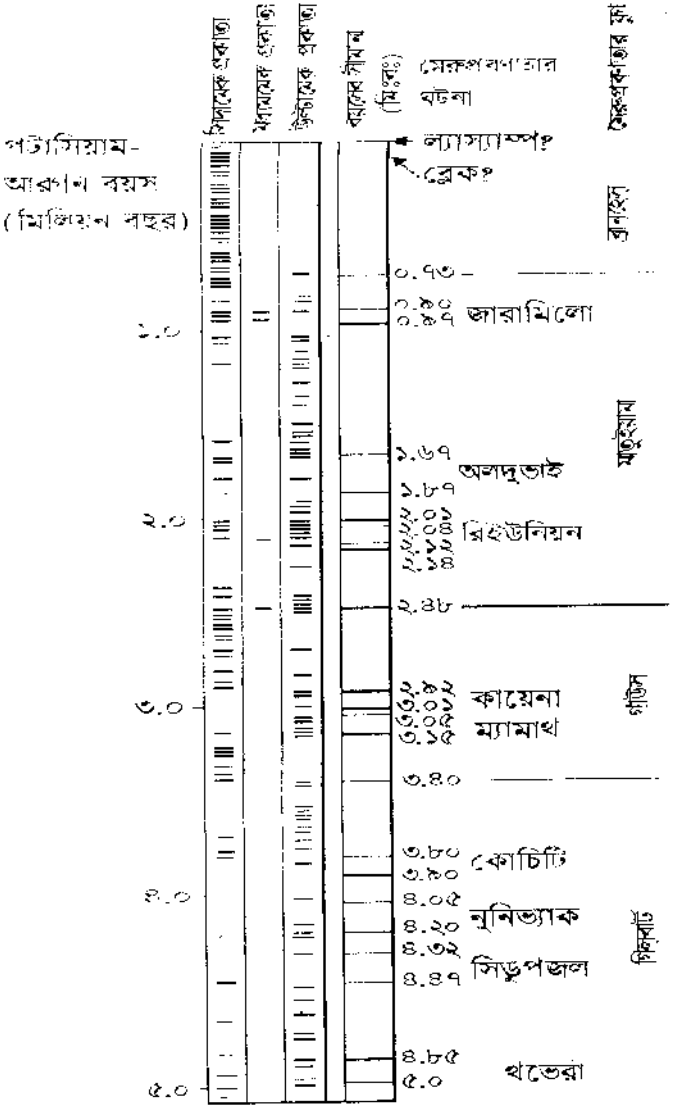

চিত্র ৩.১ : চৌম্বক স্তরীয় সময় মাপনী।
(সূত্র : ম্যানকিনেন ও ড্যালরিমপল, ১৯৭৯)।

যেমন মাতুইয়ামা উল্টা মেরু প্রবণতার যুগে **অলদুভাই** (Olduvai normal polarity event) ও **জারামিলা সিধা মেরু** (Jaramillo normal polarity event) **প্রবণতার ঘটনাদ্বয়** অলদুভাই ও জারা মিলো দুটি স্থানের নামানুসারে করা হয়েছে।

ভূচুম্বকের একটি মেরু ভৌগোলিক মেরু থেকে অবনমনীত হয়ে চৌম্বক কোনো বাড়তে বাড়তে ৯০° এর বেশি হলেই ভূচুম্বকের ক্ষেত্র উল্টান ধরা হয়। ভূচুম্বকের ক্ষেত্র উল্টান প্রক্রিয়ায় ঠিক কত সময় লাগে তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে একদিনেই বা এক ঘণ্টাতেই বদলায় না। ভূচুম্বকের ক্ষেত্র উল্টানোর প্রক্রিয়ায় প্রায় ২ থেকে ৫ হাজার বছর সময় লাগে।

চৌম্বকীয় পদার্থ (Magnetic Materials)

অনেক পদার্থেই চৌম্বকত্ব আছে। লোহা, নিকেল ও কোবাল্টজাতীয় পদার্থে চুম্বকের গুণাবলী দেখা যায়। বিশেষ করে লৌহজাতীয় মণিকে উল্লেখযোগ্যভাবে চৌম্বকত্ব বিদ্যমান। কোনো কোনো মণিক সামান্য বা মাঝারি চৌম্বকত্বসম্পন্ন, আবার কোনো কোনো মণিকে তীব্র চৌম্বকত্ব বিদ্যমান যেমন ; ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4)। ম্যাগনেটাইট অত্যন্ত তীব্র চৌম্বকত্বসম্পন্ন মণিক।

বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন কোনো পদার্থ যদি ঘুরতে থাকে তবে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইলেকট্রন তার নিজস্ব অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে এবং একই সময়ে সে তার নিউক্লিয়াসের চারপাশেও ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের ফলে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। একটি পরমাণুর খোসার (shell) দুটি ইলেকট্রন পরস্পর বিপরীতমুখী চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে খোসার চৌম্বকত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরমাণুর খোসায় জোড়াবিহীন ইলেকট্রনই শুধু চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। সে হিসেবে পদার্থ দুই প্রকার :

১। ডায়াচুম্বকীয় ও ২। প্যারাচুম্বকীয়।

ডায়াচুম্বকীয় পদার্থের ইলেকট্রনের খোসাগুলো পূর্ণ থাকে এবং সে সকল পদার্থকে যদি কোনো চুম্বক ক্ষেত্রে আনা হয় তবে সেগুলোর মধ্যে প্রয়োগকৃত চুম্বক ক্ষেত্রের ঠিক বিপরীতমুখী একটি চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। পক্ষান্তরে প্যারাচুম্বকীয় পদার্থের ইলেকট্রনের খোসা থাকে অপূর্ণ। ফলে প্রতিটি পরমাণুতে চৌম্বক ক্ষমতা তৈরি হয়। এ সকল পদার্থ যদি কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে আনা হয়, তবে তার মধ্যকার চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগকৃত চৌম্বক ক্ষেত্রে বরাবর অবস্থান গ্রহণ করে। সকল মণিকের ভিতরে ম্যাগনেটাইটই (magnetite) তীব্র চৌম্বকত্ব ধারণ করে। হেমাটাইট (Hematite), গোয়েথাইট (Goethite), ম্যাঘেমাইট (Maghemite), লিমোনাইট (Limonite) ইত্যাদি মণিকও কিছুটা চৌম্বকত্ব দেখায়। টিটানো ম্যাগনেটাইট এবং টিটানো হেমাটাইটজাতীয় সকল মাণিকই কিছুটা চুম্বকীয় গুণাবলী প্রদর্শন করে। যেমন লৌহটিটান অক্সাইডগুলো :

ইলমেনো-রুটাইল ($FeTi_2O_5$), ইলমেনাইট ($FeOTiO_2$), আলভো স্পিনেল (Fe_3O_4) ইত্যাদি। সকল মণিকের মধ্যে ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4) স্বাভাবিকভাবে যে চৌম্বকত্ব প্রদর্শন করে থাকে তা অন্যান্য মণিকের সাথে তুলনাহীন। খাঁটি ম্যাগনেটাইটে দুই ধরনের জাফরি (ল্যাটিস–lattice) দেখা যায়। এক ধরনের ল্যাটিস-ক-তে, আটটি তিন যোজনীবিশিষ্ট লৌহের (Fe^{+3}) ক্যাটিওন টেট্রাহেড্রাল (চারতলবিশিষ্ট) বহিরাকৃতি অবস্থানে থাকে। অন্য ধরনের ল্যাটিস-খ-তে লৌহের ষোলটি দুই-ও তিন যোজনীসম্পন্ন ক্যাটিগুন সমন্বয়ে বিপরীতমুখী অক্টাহেড্রাল (আটতলবিশিষ্ট বহিরাকৃতির অবস্থানে থাকে। ম্যাগনেটাইটের এরূপ আণবিক সমন্বয়ে ম্যাগনেটাইটের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত চুম্বকের উন্মেষ ঘটতে থাকে। এই চৌম্বকত্বের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ৯২ অ্যামপিয়ার।

কুরী তাপমাত্রা (Curie Temperature)

যে তাপমাত্রায় চুম্বকীয় পদার্থ তার চৌম্বকত্ব হারায় সেই তাপমাত্রাকে কুরী তাপমাত্রা বলা হয়। প্রতিটি চুম্বকীয় মণিকের একটি নির্দিষ্ট কুরী তারপমাত্রা আছে। কুরী তাপমাত্রা নির্ধারণ করেই অনেক সময় টিটানো ম্যাগনেটাইট ও টিটানো হেমাটাইট যৌগের উপাদানসমূহ নির্ধারণ করা হয়। টিটানো ম্যাগনেটাইট ও টিটানো হেমাটাইট যথাক্রমে ৮০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কঠিন দ্রবণ (solid solution) তৈরি করে। প্রাকৃতিকভাবে যে সকল কঠিন দ্রবণের মণিক পাওয়া যায় তাদের কুরি তাপমাত্রা সাধারণত সর্বদাই ২০০° সেলসিয়াস এর নিচে থাকে। বিশুদ্ধ ম্যাগনেটাইট বা হেমাটাইট থেকে ভেজালের পরিমাণ যতই বাড়বে ততই কুরী তাপমাত্রা কমতে থাকবে। বিশুদ্ধ ম্যাগনেটাইটের কুরী বা নীল (Neel) তাপমাত্রা ৫৭৫° সেলসিয়াস আর বিশুদ্ধ হেমাটাইটের নীল বা কুরী তাপমাত্রা ৬৭৫° সেলসিয়াস। কোনো কোনো ভেজাল হেমাটাইটের কুরী তাপমাত্রা ৭২৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত দেখা যায়।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক চুম্বকায়ন (Primary and Secondary magnetization)

লাভা উদ্গিরণের পর উচ্চ তাপমাত্রা থেকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে চুম্বকীয় (ম্যাগনেটিক) মণিকসমূহ স্ফটিকে রূপান্তরিত হতে থাকে। এরপর তাপমাত্রা যখন কুরী তাপমাত্রার নিচে নেমে যায় তখন চৌম্বকীয় মণিকসমূহ চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। এভাবে উচ্চ তাপমাত্রার গলিত পদার্থ থেকে ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে মণিকে যে চৌম্বকত্ব প্রাপ্তি ঘটে তাকে প্রাথমিক চুম্বকত্ব বা তাপীয় চুম্বকন (thermal magnetization) বলে। প্রাথমিক চুম্বকন সমকালীন (ambient) পরিবেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র বরাবর প্রাপ্তি হয়। প্রাথমিক চুম্বকন প্রাপ্তির পর কালক্রমে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। বিশেষ করে ভূচুম্বকের দিক পরিবর্তন ঘটলে প্রাথমিক চুম্বকনের উপরে উল্টা চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব পড়তে থাকে এবং উল্টা মেরু প্রবণতার প্রলেপ পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে

প্রাথমিক চুম্বকন একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রাথমিক চুম্বকন প্রাপ্তির সময় থেকে চুম্বকন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত কালকে **শিথিলতা সময়** (relaxation) বলা হয়। প্রাথমিক চুম্বকনের উপরে পরবর্তীতে প্রলেপ জাতীয় যে চুম্বকনের আচ্ছাদন পড়ে তাকে মাধ্যমিক চুম্বকন বা **আঠালো চুম্বকন** (viscous magnetization) বলা হয়। প্রাথমিক চুম্বকনের কুরী তাপমাত্রা অনেক বেশি ও স্থায়ী। মাধ্যমিক বা আঠালো চুম্বকনের কুরী তাপমাত্রা অনেক কম। চুম্বকীয় মণিককে তাপ দিতে থাকলে প্রথমেই মাধ্যমিক বা আঠালো চুম্বকের প্রলেপ চৌম্বকত্ব হারায়। এরপর তাপমাত্রা আরও বেশি প্রয়োগ করলে কুরী তাপমাত্রায় গিয়ে প্রাথমিক চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন প্রকার চুম্বকাবশেষ (Different Kinds of Remanent Magnetization)

চৌম্বকীয় মণিক চুম্বকন প্রাপ্তির পর প্রাথমিক চুম্বকন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং তার উপর মাধ্যমিক চৌম্বকনের প্রলেপ পড়তে থাকে। প্রাথমিক চুম্বকন ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর যে চুম্বকন অবশিষ্ট থাকে তাকে **চুম্বকাবশেষ** (remanent magnetization) বলা হয়। প্রকৃতিজাত মণিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক চুম্বকন একসাথে ধারণ করে। কারণ প্রাথমিক চুম্বকন প্রাপ্তির পরই তা ক্ষয় পেতে থাকে এবং মণিকে মাধ্যমিক চুম্বকনের প্রলেপ পড়তে থাকে। প্রকৃতিজাত মণিকে এরূপ সকল ধরন চুম্বকনের সমষ্টিকে **প্রাকৃতিক চুম্বকাবশেষ** (Natural remanent magnetization or NRM) বলে। প্রাথমিক চুম্বকনের উপরে ভূচুম্বকের প্রভাবে একজাতীয় আঠালো চুম্বকনের প্রলেপ পরে তাকে আঠালো চুম্বকাবশেষ (viscous remanent) বলে। কোনো একটি চৌম্বক পদার্থে বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাপের প্রভাবে তার মধ্যে ধারণকৃত চৌম্বকত্ব সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার উপর ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের আঠালো চুম্বকনের প্রলেপ পড়বে। এ জাতীয় চৌম্বকাবশেষকে **মূর্ছিত চৌম্বকাবশেষ** (Anhysteric remanent magnetization or ARM) বলে। উচ্চ তাপমাত্রায় যে চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় তার অবশিষ্টাংশকে **তাপীয় চুম্বকাবশেষ** (Thermal remanent magnetization or TRM) বলে।

প্রকৃতিতে ফেলডসপার বা মাইকাজাতীয় মণিক সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লোহার আয়ন ছেড়ে দেয়। এ সকল লোহার মুক্ত আয়ন অতি সহজেই বায়ু থেকে অক্সিজেন এবং পানি থেকে হাইড্রোক্সিল নিয়ে লোহার অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড (যেমন হেমাটাইট, লিমোনাইট, গোয়েথাইট, মেঘেমাইর ইত্যাদি) জাতীয় চৌম্বকীয় মণিক তৈরি করে। রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত প্রাপ্ত এ সকল চৌম্বকাবশেষকে **রাসায়নিক চৌম্বকাবশেষ** (Chemical remanent magnetization or CRM) বলে।

ভূপৃষ্ঠে লাভা বা অন্যান্য শিলা স্থানচ্যুত বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হলে উক্ত শিলায় ধারণকৃত প্রাথমিক চুম্বকন, চুম্বকন প্রাপ্তির সময়কালীন ভূচুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে। সে সকল শিলার প্রতিটি চৌম্বকীয় কণা তৎকালীন পরিবেষ্টিত চৌম্বক ক্ষেত্র

অবক্ষেপিত হয়। এ ছাড়াও নমিত স্তরে অবক্ষেপের ফলে ভূচৌম্বকের নতি নির্দেশে ভুলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ ধরনের ভুলকে **স্তরীয় ভুল** (bedding error) বলা হয়। ল্যাবরেটরিতে স্তরীয় ভুলের পরিমাণ ২৫° পর্যন্ত দেখা যায়।

ছোট ছোট কণা যখন বাতাসে বা পানির মধ্যে মুক্তাবস্থায় নিচে অবক্ষেপিত হতে থাকে তখন খুব তাড়াতাড়িই ঘুরে পরিবেষ্টিত চৌম্বক ক্ষেত্র বরাবর আসে। এই ঘূর্ণনের সময় অতি অল্প (১/১০ সেকেণ্ডে)। অবক্ষেপণের পরেও কণাগুলো একটু নড়াচড়া করে উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর আসতে পারে। অবক্ষেপণের পরে কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত এমন উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর অবস্থান নেওয়ার ব্যাপার ঘটতে পারে। ভূচৌম্বকের শক্তি কম বলে বড় কণার চেয়ে ছোট কণাগুলো তাড়াতাড়ি ঘুরে সঠিক দিক নির্দেশ করে।

নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরিমাপ (Sampling and measurement in the Laboratory)

যথেষ্ট সতর্কতার সাথে পুরাচৌম্বকত্বের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কঠিন শিলার নমুনা সংগ্রহ করতে প্রথমে শিলাটি হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হয় এবং ভাঙ্গার স্থানে টুকরাগুলো পুনঃস্থাপন করে তার উপরে প্লাস্টার অব প্যারিস বা জিপসাম দিয়ে ক্লাইনোমিটারের (ভূতাত্ত্বিক কম্পাস) সাহায্যে অথবা একটি লেভেলের সাহায্যে প্লাস্টার অব প্যারিসের উপরিভাগকে সমান্তরাল করতে হয়। প্লাস্টার অব প্যারিস শক্ত হওয়ার পর ভূতাত্ত্বিক কম্পাসের সাহায্যে পেন্সিল দিয়ে উত্তর দিককে চিহ্নিত করে গবেষণাগারে নিয়ে আসা হয়।

নরম শিলার নমুনা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নরম শিলার নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রস্থচ্ছেদে হাতুড়ি দিয়ে প্লাস্টিক টিউব ঢুকিয়ে দিতে হয়। তারপর থেওডোলাইটের সাহায্যে প্লাস্টিকের গায়ে উত্তর দিককে চিহ্নিত করতে হয়। কোনো কোনো সময় কিউব (cube) আকৃতির নমুনাকে জিপসাম দিয়ে জড়িয়ে জিপসামের উপরিভাগ সমান্তরাল করে তার উপরের দিক চিহ্নিত করে গবেষণাগারে নিয়ে আসা হয়। মাটি শক্ত হলে তামার চাকু দিয়ে টিউবের মতো করে সরাসরি মাটি কেটেও নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রস্থচ্ছেদের আসল মাটির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এক নাগাড়ে বিরামহীনভাবে নমুনা সংগ্রহ করা ভাল। সকল সময়েই মনে রাখতে হবে যে, নমুনা সংগ্রহের মাটি সকল সময়েই অনড় ছিল অর্থাৎ কখনও নড়াচড় বা স্থানচ্যুত হয় নি। নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে চুম্বক পরিমাপক যন্ত্রের (magnetometer) প্রকারভেদ অনুযায়ী নমুনাকে নির্দিষ্ট আকারে কাটতে হয়। অনেক ধরনের চুম্বক পরিমাপক যন্ত্র আছে। যেমন : স্পাইনার ম্যাগনেটোমিটার (Spinner magnetometer), ক্রাইওজেনিক সুপার কনডাকটিং ম্যাগনেটোমিটার (Cryogenic supper conducting magnetometer) ইত্যাদি। কঠিন শিলার পুরাচৌম্বকত্ব পরিমাপের জন্য স্পাইনার ম্যাগনেটোমিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ তাতে চৌম্বকজাতীয় খনিজের কণার পরিমাণ বেশি থাকে। তবে কাদামাটি বা নরম শিলার জন্য সুপার কনডাক্টিং ম্যাগনেটোমিটারের বিকল্প

নেই। চুম্বক পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে নমুনার ম্যাগনেটিক ভেক্টরের (magnetic vector) দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাপ গ্রহণ করা হয়। দেখা হয়, ম্যাগনেটিক ভেক্টর (চৌম্বক শক্তি) সমান্তরাল থেকে কতটুকু নিচে বা উপরে হেলানো যাকে **নতি** (Inclination) বলা হয়। আর অন্য পরিমাপটি হলো ম্যাগনেটিক ভেক্টরের অবনমন (declination) অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ভেক্টর বর্তমান চৌম্বকীয় উত্তর মেরু (magnetic north) থেকে কতটুকু পশ্চিমে বা পূর্বে অবস্থান করছে।

প্রাথমিক চুম্বকনই সঠিক মেরুর সন্ধান দিতে পারে। সেজন্য প্রথমেই কিছু নমুনাকে আদর্শ নমুনা হিসেবে বেছে নিতে হয় (সাধারণত এক-তৃতীয়াংশ) এবং সেগুলোর চৌম্বকত্ব ধাপে ধাপে বিনষ্ট করে ম্যাগনেটোমিটারের সাহায্যে চৌম্বকত্বের পরিমাপ নেয়া হয়। অল্প তাপেই আঠালো চুম্বক বিনষ্ট হয়ে যাবার পর প্রাথমিক চুম্বকন বিনষ্ট হতে থাকবে। কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় (বা বৈদ্যুতিক চক্রে) সকল মাধ্যমিক চুম্বকন (secondary magnetization) বিনষ্ট হবে তা স্থির করে অবশিষ্ট সকল নমুনার ঐ তাপমাত্রা বা বৈদ্যুতিক চক্রে মাধ্যমিক চুম্বকন বিনষ্ট করে প্রাথমিক চুম্বকনের নতি ও অবনমন পরিমাপ করতে হয়।

চুম্বকন বিনষ্ট করার জন্য সাধারণত দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় : (১) তাপের মাধ্যমে ও (২) বৈদ্যুতিক চক্রের মাধ্যমে। একটি বৈদ্যুতিক চুলার মধ্যে ধীরে ধীরে তাপ বৃদ্ধি করা হয় এবং নমুনাকে চুলার মধ্যে বার বার প্রতিস্থাপন করে ধাপে ধাপে নমুনার চুম্বকন বিনষ্ট করা হয়। তাপের মাধ্যমে প্রতিটি ধাপে চুম্বকন বিনষ্টের পরে যে চৌম্বকাবশেষ রয়ে যায় ম্যাগনেটোমিটারের সাহায্যে তার পরিমাপ করা হয়।

বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তামার তারের কুণ্ডলীর (coil) মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহ করে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ শক্তি বাড়িয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তিও বৃদ্ধি করা হয়। এর সাথে সাথে নমুনাকে কুণ্ডলীর মধ্যে স্থাপন করে উল্টা চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগের মাধ্যমে নমুনার চৌম্বক কণার চৌম্বক শক্তিকে ধাপে ধাপে বিনষ্ট করা হয় এবং চৌম্বকাবশেষের পরিমাপ নেয়া হয়।

গবেষণালব্ধ উপাত্তের বিশ্লেষণ (Data Interpretation)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিলাস্তরের মেরুপ্রবণতা (polarity) পরিমাপ করা হয়েছে এবং সে সকল শিলাস্তরে ধারণকৃত লাভার পটাসিয়াম আরগন পদ্ধতিতে প্রকৃত বয়স নির্ণয় করা হয়েছে। এরপর এ সকল স্তরকে কালস্তরীয় হিসেবে বিন্যস্ত করে তার পাশে মেরু প্রবণতাগুলোকে দেখানো হয়েছে। শিলাস্তরীয় প্রস্থচ্ছেদের পাশে চৌম্বক স্তরীয় মেরু প্রবণতা স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে শিলাস্তরে বিদ্যমান লাভার সাহায্যে প্রকৃত বয়স নির্ণয় করে কালস্তরীয় হিসেবে তুলনা করা হয়েছে।

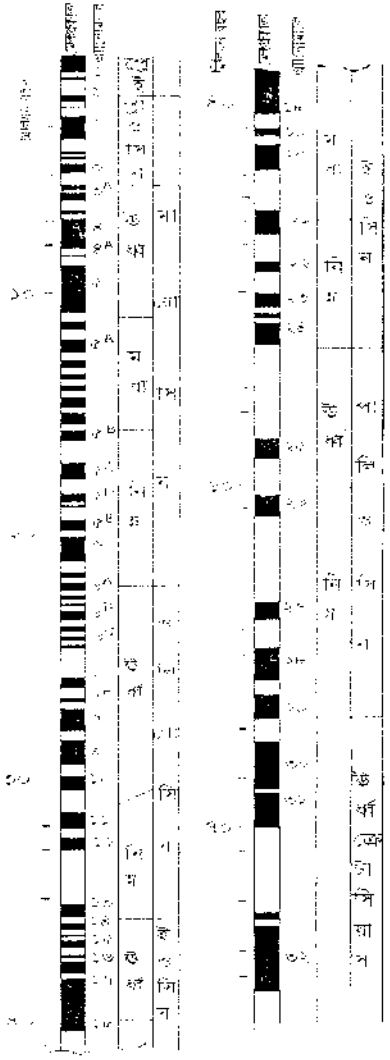

চিত্র ৩.২ : চৌম্বক সময় মাপনী। ৬৫ থেকে ৩০ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত শিলার বয়স নির্ণয়ে সক্ষম।

চৌম্বক স্তরীয় অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় কক্স (Cox) তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সংশোধিত চৌম্বকস্তরীয় সময় মাপনী (Magnetostratigraphic time scale) তৈরি করেন।

১৯৬৬ সনে ওপডাইক (Opdyke) উক্ত সময় মাপটি সামুদ্রিক তলানির মেরু প্রবণতা দিয়ে আরোও নিশ্চিত (confirmed) করে তোলেন। কারণ সমুদ্রের কোনো কোনো স্থানে কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে অবিরাম তলানি অবক্ষেপিত হচ্ছে। তাই সামুদ্রিক শিলাস্তরীয় প্রস্থচ্ছেদে কোনো কোনো স্থানে বিগত কয়েক লক্ষ বছর ধরে কোনো অসংগতি নেই। ঐ সকল তলানি যে মেরুপ্রবণতা ধারণ করে তাতে ভূচুম্বকের ক্ষেত্রে উল্টানোর ধারাবাহিকতার ঘটনাবলী চমৎকার-ভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই স্থলভাগ ও জলভাগের অবক্ষেপ থেকে মেরু প্রবণতার প্রাপ্ত তথ্যাদি এক ও অভিন্ন। বর্তমানে উন্নতমানের যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে পটাসিয়াম আরগন পদ্ধতিতে প্রকৃত বয়স (absolute age) নির্ণয়ে আগের চেয়ে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যন্ত্রের মান উন্নয়নে পূর্বের ব্যবহৃত ধ্রুবকের মান সংশোধন করা হয়েছে। ধ্রুবকের মান সংশোধন করে এবং পূর্বে প্রাপ্ত ফলাফলকে সংশোধিত করে ১৯৭৯ সালে ম্যানকিনেন ও ড্যালরিমপল (Mankinen and Dalrymple)

চৌম্বকস্তরীয় সময় মাপনী তৈরি করেন। উক্ত সময় মাপনীই এখন ভূচৌম্বকের মেরু প্রবণতার আদর্শ সময় মাপনী হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে (চিত্র ৩.১)। যে সকল প্রস্থচ্ছেদ স্তরীয় ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং কোনো শিলাস্তরে কোনো অসংগতি থাকলে ভূচৌম্বকের মেরু প্রবণতার সময় মাপনী দিয়ে শিলার আপেক্ষিক বয়স নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা থেকে যায়।

শিলার বয়স নির্ণয়ের জন্য কোনো একটি শিলাস্তরীয় প্রস্থচ্ছেদের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিরামহীনভাবে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। গবেষণাগারে সে সকল নমুনার মেরু প্রবণতা নির্ণয় করা হয় এবং প্রাপ্ত মেরু প্রবণতা শিলাস্তরীয় প্রস্থচ্ছেদ অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়। তারপর প্রাপ্ত ফলাফল ভ্যালেনটাইন ও ড্যালরিমপলের আদর্শ সময় মাপনীতে বিন্যস্ত করা হয়। সেখান থেকে আপেক্ষিক বয়স নির্ণয় করা হয়।

ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের মেরু প্রবণতা দিয়ে বয়স নির্ণয়ের বেশ কিছু মাপনী (রেখাচিত্র) দেখা যায় যা' প্রায় ৬০–৮০ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত শিলার বয়স নির্ণয় করতে সক্ষম (চিত্র ৩.২)। কিন্তু চৌম্বক শক্তির শিথিলতার সময় (relaxation time), মেরু প্রবণতার যুগ বা ঘটনার স্থিতিকাল ও শিলাস্তরীয় অসংগতির কথা বিবেচনা করলে ঐ সকল আপেক্ষিক বয়সের আর কোনো যথার্থতা থাকে না। তবে কোয়াটারনারি যুগের শিলাস্তরগুলোর আপেক্ষিক বয়স মোটামুটি ভালভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব।

ভূচৌম্বকের মেরু প্রবণতা দিয়ে শিলার বয়স ও ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাপক ব্যবধান দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদির বয়স নির্ণয় করা যায়।

বাংলাদেশের কোয়াটারনারি অবক্ষেপের পুরাচৌম্বকত্বের ফলাফল (Palaeomagnetic Results of the Quaternary Deposits of Bangladesh)

ষাট দশকের শুরুতেই মধুপুর, বরেন্দ্রভূমি এবং লালমাই পাহাড়িয়া এলাকার লালমাটির বয়স নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য দেখা যায়। এ সকল অবক্ষেপের মধ্যে কোনো জীবাশ্ম বা অন্য কোনো বয়স নির্ণয়ে সাহায্যকারী পদার্থ পাওয়া যায় না, যা' থেকে প্রকৃত বয়স নির্ণয় করা যায়। ১৯৮৭ সনে বর্তমান লেখক তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রির গবেষণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পুরাচৌম্বকত্বের সাহায্যে বয়স নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট নমুনা সংগ্রহ করেন।

পুরাচৌম্বকত্বের মাধ্যমে শিলার বয়স নির্ণয়ের জন্য ঢাকা নগরীর মিরপুর, বাসাবো ও গুলশান লেক ; মধুপুর ; লালমাই পাহাড়ের রূপবান মুরা ; বরেন্দ্রভূমির রহনপুর ; ভাগলপুর নদী ও পূর্ণভাবা নদীর তীর (গুজরঘাট) ; বগুড়ার শেরপুর ; দিনাজপুরের সন্নিকটে লালমাটিয়া ; চলনবিলের তাড়াশ ও কুশাবাড়ি এবং জৈন্তাপুর এলাকা থেকে প্রায় ২৬০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

অধিকাংশ কিউবাকৃতি তলানির নমুনা প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে জড়িয়ে সংগ্রহ করা হয়। তামার চাকু দিয়ে কেটে কিউবাকৃতির খোলা নমুনাও সংগ্রহ করা হয়।

এ সকল নমুনাকে বেলজিয়ামের ডুরবেতে স্থাপিত পুরাচৌম্বকত্বের গবেষণাগারে নেয়া হয়। সেখানে হীরার করাতে কেটে প্রতিটি নমুনাকে ৩৮x৩৮x৩৮ মি. মি কিউবে

তৈরি করা হয়। এ সকল নমুনার প্রাকৃতিক চুম্বকাবশেষ পরিমাপ করা হয়। এরপর নিয়ম অনুযায়ী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নমুনার বৈদ্যুতিক ও তাপীয় পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে চুম্বকাবশেষ পরিমাপ করা হয়। ধাপে ধাপে চুম্বকাবশেষ পরিমাপ করে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যা থেকে অনুমান করা হয় যে, ঐ তাপমাত্রায় সকল মাধ্যমিক চুম্বকাবশেষ বিনষ্ট হতে পারে। ঐ তাপমাত্রাটি ছিল ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

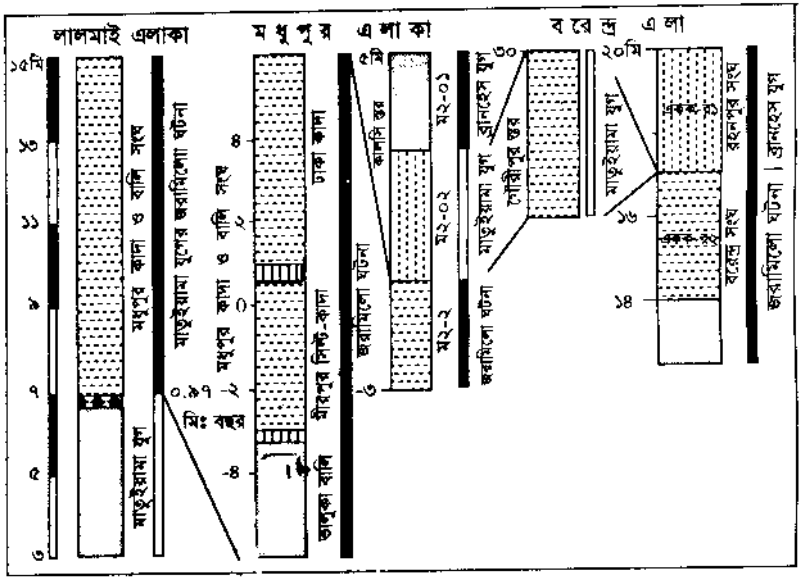

চিত্র ৩.৩ : মধুপুর, লালমাই ও বরেন্দ্র এলাকার কোয়াটারনারির শিলাস্তরীয় এককগুলোর সাথে চৌম্বকস্তরীয় সময় মাপনীর (ম্যানকিনেন ও ড্যালরিমপল, ১৯৭৯) পারস্পর্য।

পরে সকল নমুনাকে ২৫০° তাপ দিয়ে আঠালো চুম্বকাবশেষ বিনষ্ট করে প্রাথমিক চুম্বকাবশেষ ক্রাইওজেনিক সুপার কনডাক্টিং ম্যাগনেটোমিটার যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়। পুরাচৌম্বকত্বের নমুনাগুলো প্লেইস্টোসিন ও হলোসিনের প্রায় সকল শিলাস্তরীয় একক থেকেই নেয়া হয়েছিল। উপরন্তু হলোসিন সময়ের প্রতিটি শিলাস্তরীয় একক এবং অনু-একক থেকে কার্বন ১৪ বা তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে বয়স নির্ণয়ের জন্য গাছের খণ্ডবিশেষ সংগৃহীত করা হয়।

পুরাচৌম্বকত্বের গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, চলনবিল এবং বাসাবো সংঘসমূহ থেকে সংগৃহীত সকল নমুনা সিধা চৌম্বক মেরু প্রবণতা ধারণ করে। কার্বন ১৪ পদ্ধতিতে নির্ণেয় প্রাপ্ত বয়স অনুযায়ী (চিত্র ২.১৩) দেখা যায় বাসাবো সংঘের বিভিন্ন অনুস্তর প্রায় ১২ হাজার বছর থেকে ৪ হাজার বছর পর্যন্ত বয়স নির্দেশ করে। তাছাড়াও রহনপুর, চলনবিল ও বাসাবো সংঘসমূহের স্তরীয় অবস্থান সর্ব উপরে। তাই

পুরাচৌম্বকের দিক থেকে এ সকল সংঘ ব্রানহেস সিধা মেরু প্রবণতার যুগে পরে (চিত্র ৩.৩)। মিরপুরে কালসি নামক দুটি স্তরীয় অবক্ষেপ দেখা যায়। এই অবক্ষেপগুলো মধুপুর সংঘের উপরের সভ্যকে বা মধ্য সভ্যকে কিয়দংশ ক্ষয় করে অবক্ষেপিত হয়েছে। সুতরাং কালসি স্তরদ্বয় ও মধুপুর সংঘের সভ্যের সীমারেখা ক্ষয়জনিত অসংগতি (Erosional unconformity) নির্দেশ করে। কালসি স্তরদ্বয়ের দুটি ভাগ আছে। নিচের স্তরটি উল্টা মেরু প্রবণতা ধারণ করে। স্তরের উপরে সিধা মেরু প্রবণতা ব্রানহেস যুগ এবং নিচের উল্টা মেরু প্রবণতা মাতুইয়ামা যুগ নির্দেশ করে। তাহলে কালসি স্তরদ্বয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখার বয়স হয় ৭৩০ হাজার বছর।

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর শহরের অদূরবর্তী পুর্নাভাবা নদীর তীরে গৌরীপুরের লালমাটিয়া বলে একটি জায়গা আছে। এই লালমাটিকে গৌরীপুর স্তর বলা হয়। স্তরীয় দিক থেকে, স্তরটি বরেন্দ্র সংঘের সকল সভ্যের উপরে। ঐ স্তরটিতে ধারণকৃত চৌম্বকত্বের উল্টামেরু প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কালসি ও গৌরীপুর স্তর দুটির নিচে যথাক্রমে মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের সভ্যদের থেকে সংগৃহীত সকল নমুনাই সিধামেরু প্রবণতা ধারণ করে। নিম্ন-কালসি (নিচেরটি) ও গৌরীপুর স্তর দুটির মেরু প্রবণতাকে মাতুইয়ামার সর্ব উপরের উল্টা মেরু প্রবণতার অন্তর্ভুক্ত। আর মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের সভ্যদের মেরু প্রবণতা জারামিলা সিধামেরু ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সে হিসেবে কালসি স্তরদ্বয়ের নিচের স্তর ও গৌরীপুর স্তর দুটোর বয়স ৯০০ থেকে ৭৩০ হাজার বছরের মধ্যে বলে অনুমান করা হয় এবং মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের সভ্যদের বয়স ৯০০ থেকে ৯৭০ হাজার বছরের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়।

লালমাই পাহাড়িয়া এলাকার রূপবান মুরায় মধুপুর সংঘের নিচের নুড়িপাথরের একটি স্তর আছে যাকে কুমিল্লা নুড়িপাথরের স্তর বলা হয়। এই স্তরের নিচে বালিস্তর আছে, যাকে ডুপিটিলা বালি সংঘ বলে। সেখান থেকে সংগৃহীত নমুনার চুম্বকাবশেষ উল্টামেরু প্রবণতা নির্দেশ করে। তাই ডুপিটিলা সংঘের উপরিভাগ জারামিলো ঘটনার নিচে মাতুইয়ামার উল্টামেরু প্রবণতার অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে ডুপিটিলা সংঘের বয়স ৯৭০ হাজার বছরের চেয়ে বেশি। গিরুজন ও টিপাম সংঘদ্বয় এবং সুরমাদল থেকে সংগৃহীত নমুনায় ধারণকৃত চৌম্বকাবশেষের পরিমাণ খুবই কম। তদুপরি, এ সকল সংঘ ও দলের মধ্যে এত বেশি ক্ষয়জাত ও কৌণিক অসংগতি যে, প্রাপ্ত মেরু প্রবণতার ফলাফল থেকে বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কেউ বললেও তাকে কঠিন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

সৈকতে বিভিন্ন রকম। পৃথিবীর জলাধারের আয়তন ও জলের পরিমাণের কোনো পরিবর্তন না ঘটে যদি কোনো সৈকত ভূগাঠনিক বা টেকটনিকের (tectonic) কারণে উঠানামা করে তবে তাকে আপেক্ষিক সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন বলা হয়। এমন পরিবর্তনে আপেক্ষিকভাবে মনে হবে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে ঘটে। প্রধানত পাঁচটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

১। দীর্ঘকালব্যাপী টেকটনিক পরিবর্তন (Long term tectonic change)

২। হৈমিক ভারসমতা (Glacial Isostasy)

৩। জল ভারসমতা (Hydro Isostasy)

৪। জিওইড বা ভূ-আকৃতিক পরিবর্তন (Geoidal change)

৫। হিমক্রিয়া ও হিমবিরতির পালাক্রম।

১। দীর্ঘকালব্যাপী টেকটনিক পরিবর্তন : সাগরতল বিস্তৃতির (Sea-floor speeding) ফলে দশ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে নতুন নতুন ত্বকের সৃষ্টি হচ্ছে। ঊর্ধ্ব সেনোজইক (Cenozoic) হলো মহাদেশীয় সংঘর্ষ (continental collision) ও তটরেখা (coast line) সংকোচনের সময়কাল। তাই সামগ্রিকভাবে সমুদ্র পশ্চাদগামিতাই (marine regression) বা সমুদ্র অবনতিই ঘটছে। ১৯৭১ সনে ব্লুম (Bloom, 1971) উল্লেখ করেন যে, মহাসমুদ্রের আয়তন বছরে ১৬ সে.মি. করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত হিমবিরতিতে (প্রায় ১২৭ হাজার বছর আগে) হিমবাহ থেকে মাত্র ৬% বরফ গলা জল সমুদ্র গর্ভে ফেরত এসেছিল। এতদসত্ত্বেও বর্তমান হলোসিনের সমুদ্রপৃষ্ঠ ১২৭ হাজার বছর আগের সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা ৮ মিটার নিচে অবস্থান করছে। অর্থাৎ সমুদ্রের মেঝে বা তলের বিস্তৃতির ফলে মহাসমুদ্রে গত হিমবিরতির তুলনায় বর্তমান হলোসিন হিমবিরতিতে জল ধারণ ক্ষমতা বেড়ে গেছে (কারণ আয়তন বেড়েছে) এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ ৮ মিটার নিচে নেমে গেছে। ভূথালার (plate) বা প্লেট টেকটনিক গতিশীলতা মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার (Mid Oceanic Ridge) ঊর্ধ্বগতি, ভূত্বকের অবনমন (Crustal subsidence) ইত্যাদি দীর্ঘকালব্যাপী টেকটনিকের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে।

২। হিমক্রিয়া ও হিমবিরতির পালাক্রম : হিমক্রিয়া ও হিমবিরতির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়। হিমযুগ সাগরের পানি জলীয়বাষ্প আকারে উপরে উঠে বরফ আকারে স্থলভাগে জমতে থাকে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নেমে যায়। আবার হিমবিরতিতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়; ফলে বরফ গলতে থাকে এবং বরফ গলা পানি সাগরে ফিরে যায়। সাগরে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠে। অক্সিজেন আইসোটোপের (oxygen isotope) রেখাচিত্রে এ পরিবর্তন লক্ষণীয় (চিত্র ৬.১)।

৩। হৈমিক ভারসমতা : হিমযুগে সাগরের পানি বরফ আকারে স্থলভাগের উপরে জমা হওয়ায় স্থলভাগের উপরের বোঝা বেড়ে যায়। ফলে স্থলভাগ নিচে দেবে যায় এবং

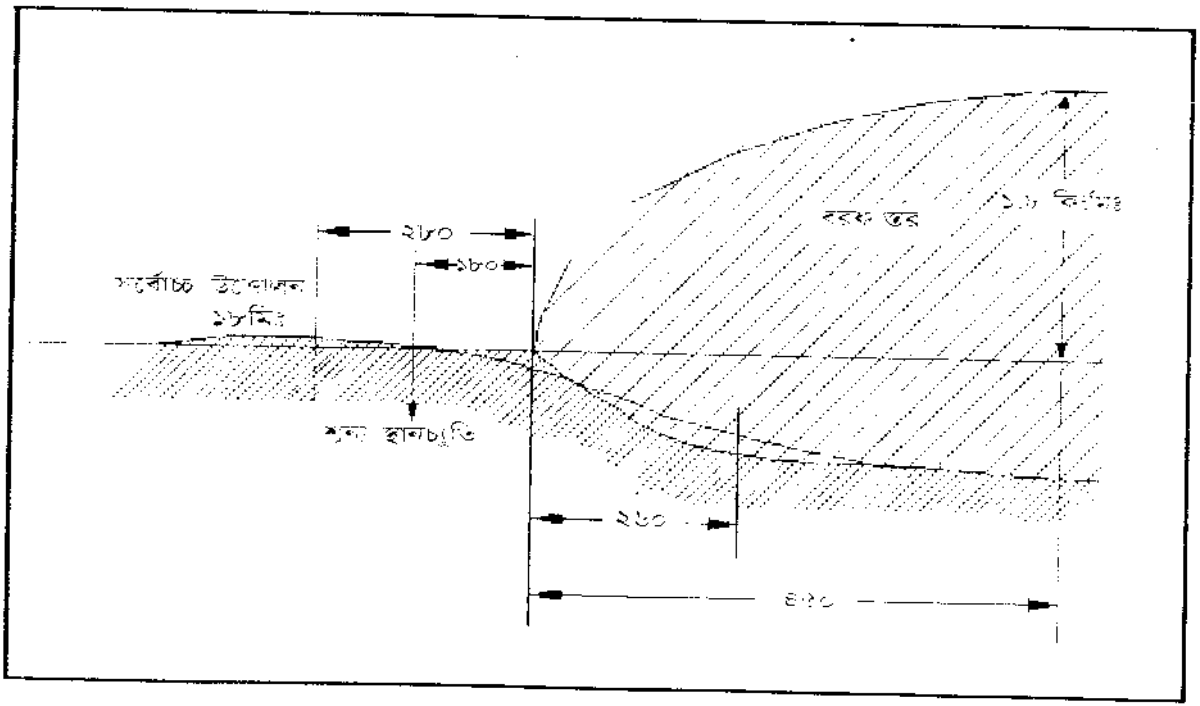

চিত্র ৪.১ : হৈমিক ভারসাম্যের সম্পর্ক।

(সূত্র : ওয়ালকোট, ১৯৭৩)।

আপেক্ষিকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠেছে বলে মনে হয় (চিত্র ৪.১)। কোনো কোনো সমুদ্রবর্তী স্থলভাগ যদি প্লেটের মতো থাকে, আর প্লেটের একদিকে সমুদ্র এবং অন্যদিকে বরফ জমা হলে, বরফ জমা অংশ নিচে দেবে যাবে এবং সমুদ্র তীরবর্তী অংশ উপরে উঠবে। ফলে আপেক্ষিকভাবে মনে হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নেমে গেছে।

৪। **জলভারসমতা :** ভূত্বক যেমন বরফের ভার বা ভার মুক্তিতে উঠানামা করে তেমনি সমুদ্রতলও পানির ভার বা ভার মুক্তিতে উঠানামা করে। গত হিমযুগের শেষে যখন বরফ গলে পানি সমুদ্রে ফিরে গেছে তখনই পৃথিবী পৃষ্ঠের সবচেয়ে বড় ধরনের বিকৃতি (deformation) ঘটেছে। হিসাব করে দেখা গেছে, গত ৭০০০ বছর ধরে মহাসাগরীয় বেসিন গড়ে ৮ সে.মি. করে অবনমিত হয়েছে ; একই সময়ে মহাদেশগুলো ১৬ মিটার উপরে উঠেছে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ১৬ মিটার দূরত্ব বেড়েছে।

৫। **জেওইড বা ভূ-আকৃতিক পরিবর্তন :** জেওইড অনেকটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও নানা বিষয়, বিশেষ করে বহির্বিশ্ব মহাশক্তির উপর নির্ভর করে। বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠ সমতল নয়। সমতল বা ঢেউ আকৃতির সমুদ্রপৃষ্ঠের উঁচু ও নিচু স্থানের ব্যবধান প্রায় কয়েক মিটার। জেওইডের নকশায় দেখা যায় যে, নিউগিনির কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও মালদ্বীপের কাছে নিম্নতার ব্যবধান প্রায় ১৮০ মিটার।

প্লেইস্টোসিন উপযুগের সমুদ্রপৃষ্ঠ

প্লেইস্টোসিন সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেকবার পরিবর্তন ঘটেছে। প্লেইস্টোসিন সময়ের সমুদ্রপৃষ্ঠের রেখাচিত্র দেখতে অনেকটা মিলাঙ্কোভিচের রেখাচিত্রেরই মতো (চিত্র ১.৯)। রেখাচিত্রগুলো সামগ্রিকভাবে সিনুসইডাল রেখার মতো। অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্র (চিত্র ৬.১) থেকে জানা যায় যে, হিমযুগে সমুদ্রপৃষ্ঠ যতটুকু নেমে গিয়েছিল হিমবিরতিতে আবার পূর্বস্থানে ফিরে এসেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্র দ্বারা প্রতিফলিত হয় না। কারণ অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্রটি নির্ভর করে সাগরের পানিতে ভারি অক্সিজেনের পরিমাণের উপর। হিমযুগে যে পানি সাগর থেকে বরফ আকারে স্থলভাগে চলে যায় ; হিমবিরতিতে তা আবার ফিরে আসে। তাই অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্রে সাগরপৃষ্ঠে উঠা ও নামার পরিমাণ প্রায় সমানই থাকে। এর অর্থ হলো সকল হিমবিরতির চূড়ায় সাগরপৃষ্ঠে একই উচ্চতায় থাকার কথা। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, নিম্ন প্লেইস্টোসিনের হিমযুগের সমুদ্রপৃষ্ঠের সর্বনিম্ন অবস্থান, বর্তমানের হিমবিরতির সাগরপৃষ্ঠের অবস্থানের প্রায় সমান (চিত্র ৪.২)।

আর নিম্ন বা মধ্য প্লেইস্টোসিনের হিমবিরতির সাগরপৃষ্ঠের অবস্থান আরও উপরে (চিত্র ৪.২)। এ বিষয়ে অধ্যাপক ফেয়ারব্রিজের (১৯৭১) রেখাচিত্র উল্লেখ করা যেতে পারে

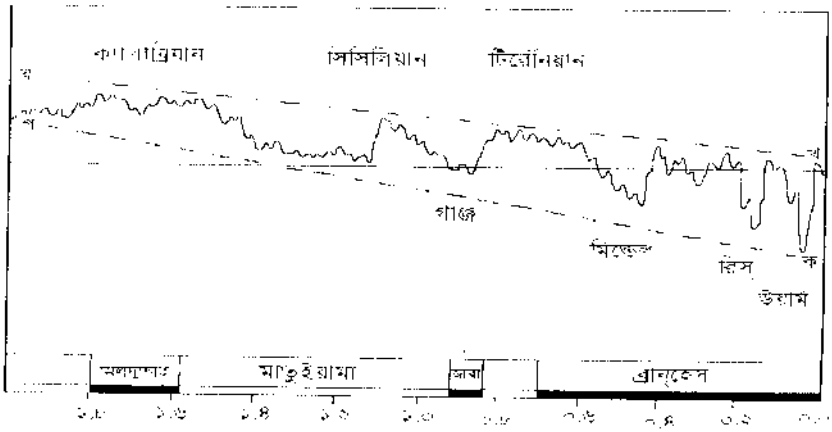

চিত্র ৪.২ : কোয়াটারনারি সময়ের সাগরপৃষ্ঠের পরিবর্তন (সূত্র : ফেয়ারব্রীজ, ১৯৭১)।

(চিত্র ৪.২)। রেখাচিত্রটি ভূমধ্যসাগরের তীরে ইতালির সাগরতটের একটি সক্রিয় অবনমন প্লেট। এখানকার ক্যালাব্রিয়া স্তরগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪০০ মিটার উঁচুতে দেখা যায়। ক্যালব্রিয়া স্তরগুলো অগভীর সাগর তলানির প্রতিবেশ উদ্ভূত। আর এগুলো জমা হয়েছিল নিম্ন প্লেইস্টোসিন সময়ে। এর পরবর্তী সোপান সিসিলিয়ান। সিসিলিয়ান সোপানের নমুনাঞ্চল দক্ষিণ-পশ্চিম সিসিলি। আদর্শ-ভূমিটি সমতল ভূমি, যা প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় অবস্থিত। সিসিলি সোপানটি ঢাকা পড়েছে মিলাজ্জি সোপান দ্বারা ; সিসিলির পূর্বে যার উচ্চতা সমুদ্র থেকে প্রায় ৫০ মিটার। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নিম্ন প্লেইস্টোসিনের হিমবিরতির সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমান হিমবিরতির সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় অনেক উপরে ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তনের জন্য মালোর্কা এবং নিউগিনির সাগরতট উল্লেখ করা যেতে পারে। সামুদ্রিক ও অবক্ষেপ অনেকটা চক্রাকারে স্তরীভূত। সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠায় সাগর তলানি স্তরীভূত হয়েছে। আবার সাগরপৃষ্ঠ নিচে নামায় তার উপর স্তরীভূত হয়েছে স্থলীয় অবক্ষেপ।

অক্সিজেন আইসোটোপ রেখাচিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং নিম্ন প্লেইস্টোসিনে সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা অনেক উপরে দেখিয়ে অধ্যাপক পাপের একটি কোয়াটারনারির রেখাচিত্র প্রদত্ত হলো।

আসল কথা হলো, প্লেইস্টোসিন সময়ে অনেকবার সাগর সম্মুখগামী ও পশ্চাদগামী হয়েছে।

হলোসিনের সমুদ্রপৃষ্ঠ (Holocene Sea Level)

স্থলভাগের হৈমিক ভারসমতা ও জলভাগের জলভারসমতার পরিষ্কার নির্দশন বহন করে হলোসিন সময়ের সমুদ্রপৃষ্ঠ। হিমযুগ থেকে হিমবিরতিতে রূপান্তর খুব তাড়াতাড়িই সংঘটিত হয়েছিল। মাত্র ১৮ হাজার বছর পূর্বে গত হিমযুগ তার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে।

অর্থাৎ ১৮ হাজার বছর আগে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা পরে। স্থলভাগে হিমবাহের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। হিমযুগের শেষে অর্থাৎ প্লেইস্টোসিন সময়ের শেষে এ সকল বরফ দ্রুত গলতে শুরু করে এবং বরফ গলা পানি সাগরে ফিরে যেতে থাকে। সে সময়ের সমুদ্রপৃষ্ঠও তার সর্বনিম্ন অবস্থান থেকে দ্রুত উপরে উঠতে থাকে। আবহাওয়ার এই বিরাট পরিবর্তনের ফলে বরফ গলে যাওয়ার সাথে সাথে স্থলভাগ হিমভারমুক্ত হয়ে উপরে উঠতে থাকে। অন্যদিকে বিশাল জলরাশির ভারে (জলভারসমতায়) সাগরও একটু নিচে দেবে যায়। সাগরতলের নিচে নামার পরিমাণ ও স্থলভাগের ঊর্ধ্বে উঠার পরিমাণ দুটি যোগ করলেও দেখা যায় সমুদ্রে পানির পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং হলোসিন সমুদ্রপৃষ্ঠ দ্রুত উপরে উঠেছে। এ সকল ঘটনা ঘটেছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ হাজার বছর আগে। এই ঘটনার সত্যতাও বেশ নিখুঁতভাবে প্রমাণ করা যায়।

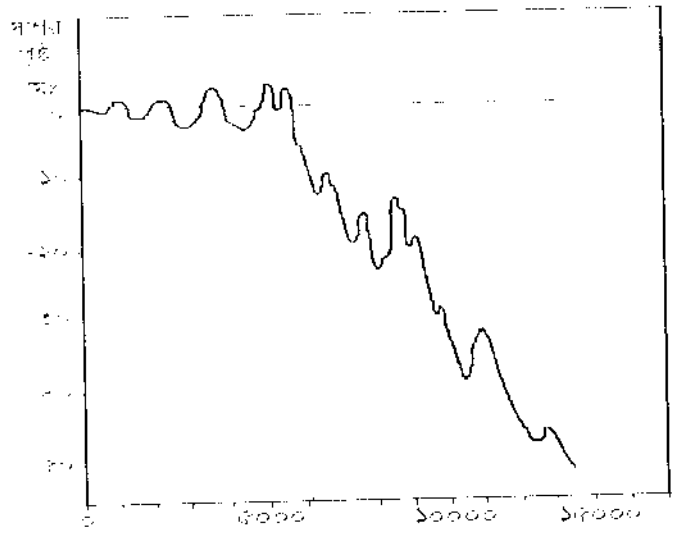

চিত্র ৪.৩ : প্লেইস্টোসিন সময়ের শেষের এবং হলোসিন সময়ে দ্রুত সাগরপৃষ্ঠ পরিবর্তনের রেখাচিত্র (সূত্র : ফেয়ার ব্রীজ, ১৯৬১)।

বরফ গলে যাওয়ায় হৈমিক ভারসমতার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক সাগরতটই কাত হয়েছে। হিমযুগ শেষে হলোসিন সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠার দু'ধরনের রেখাচিত্র দেখা যায়। ফেয়ার ব্রিজের রেখাচিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ দ্রুত উঠানামা করার উপর ধারণা করে (Rapidly Fluctuating Sea Level Hypothesis) (চিত্র ৪.৩)। পক্ষান্তরে শেফার্ড এবং কারীর (১৯৬৯) রেখাচিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে মসৃণ বা ধীরগতিতে সাগরপৃষ্ঠে উপরে উঠেছে এর উপর ধারণা করে। (চিত্র ৪.৪) টেকটনিক পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরগতিতে হয়। আর আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। হলোসিন সময়ের উর্ধ্বমুখী সমুদ্রপৃষ্ঠ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় নিচে নেমেছে অথবা একই উচ্চতায় কয়েকশত বছর স্থিরভাবে রয়েছে। প্রায় ৫,৫০০ বছর পূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমানের তুলনায় ১ থেকে ২ মিটার উপরে ছিল।

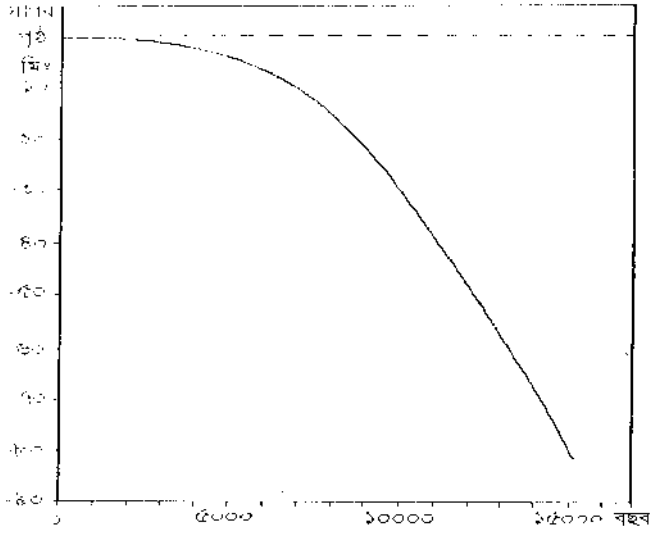

চিত্র ৪.৪ : প্লেইস্টোসিন সময়ের শেষের এবং হলোসিন সময়ে ধীর গতিতে সাগরপৃষ্ঠ পরিবর্তনের রেখাচিত্র (সূত্র : শেফার্ড ও কারি, ১৯৬৭)।

অতীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তনের প্রমাণাদি (Evidence for Sea Level Changes in the Past)

কি কি নিদর্শন থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তন হয়েছে বলে ধারণা করা যায় সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(ক) সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমানের চেয়ে উপরে থাকার নিদর্শন : আমরা পূর্বের আলোচনায় বলেছি নিম্ন ও মধ্য প্লেইস্টোসিন সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় উপরে

ছিল। এ ছাড়াও হলোসিন সময়েও সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে থাকার নিদর্শনগুলো নিম্নরূপ :

(১) সাগর সংলগ্ন খাড়া পাহাড় (Sea-cliff) : সমুদ্রের ঢেউয়ে পাহাড় ভেঙ্গে যায় বলে পাহাড় অনেকটা খাড়া হয়ে অবস্থান করে।

(২) ঢেউয়ে কাটা সমতল ছাদ (Wave cut platform) অথবা সামুদ্রিক সমতল ছাদ (Marine terrace) : সাগরতট যদি নরম শিলা দ্বারা গঠিত হয় তবে সমুদ্রের ঢেউয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিশাল মাচানের (platform) মত ভূমিরূপ তৈরি করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নেমে গেলে মাচানটি সমতল ভূমি আকারে দৃশ্যমান হয়। ঢেউয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এরকম সমতল ছাদ সমুদ্রের মধ্যেও তৈরি হতে পারে। সাগরপৃষ্ঠ উপরে উঠলে ঐ মাচান সাগরজলে নিমজ্জিত হয়।

(৩) ঢেউয়ে কাটা খাঁজ (Wave cut notch) : সাগরতটে যদি কঠিন শিলার পাহাড় থাকে তবে বছরের পর বছর ধরে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে কঠিন শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ে খাঁচ বা খাদ তৈরি করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নেমে গেলে খাঁজটি উপরে দৃশ্যমন হয়।

(৪) সমুদ্রপৃষ্ঠ বরাবর অবস্থিত খাড়া পাহাড়ের গায়ে অনেক ছিদ্র বা গুহা দেখা যায় (sea-cave system)।

উপরিউক্ত নিদর্শনগুলো বর্তমান সাগরপৃষ্ঠের উপরে দৃশ্যমান হলে অতীতের সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমানের তুলনায় উপরে ছিল। ফলে মনে করা যেতে পারে (যদি জায়গাটি টেকনিক দিক থেকে স্থিতিশীল থাকে)।

(খ) অতীতের সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমানের তুলনায় নিচে থাকার নির্দশন :

(১) নিমজ্জিত সাগরতট,

(২) নিমজ্জিত বর্ধিত সাগর উপত্যকা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ঊর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন সময়ে সাগরপৃষ্ঠ নিচে থাকায় গঙ্গা নদীর উপত্যকা বঙ্গোপসাগরের বহুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হলোসিন সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ উপরে উঠা উক্ত নদী উপত্যকা এখন বঙ্গোপসাগরে বহুদূর পর্যন্ত নিমজ্জিত অবস্থায় বিস্তৃত আছে।

বঙ্গোপসাগর তটে সমুদ্রপৃষ্ঠ পরিবর্তনের নিদর্শনসমূহ

এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের ইংরেজি (An Introduction to the Quaternary Geology of Bangladesh, 1995) বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে কিছুটা আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গত হিমযুগের শেষে, ১৮ হাজার বছর আগে পৃথিবী সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ ছিল বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা ১০০ থেকে ১৩০ মিটার নিচে। বঙ্গোপসাগরের

বর্তমান সাগর তটের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এলাকা ঊর্ধ্ব প্লেইস্টোসিন সময়ে শুষ্ক ছিল। সাগরতট ছিল প্রায় শত কিলোমিটার দক্ষিণে। তখন হিমালয় পর্বত ছিল বেশ উঁচু বরফে ঢাকা। বরফ গলা পানি বাংলা সমভূমির উপর প্রবাহিত অসংখ্য নদী দিয়ে দক্ষিণে বহুদূরে সাগরে পতিত হতো। গত হিমযুগে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু খুব কমই বৃষ্টিপাত ঘটাতো। ফলে নদীগুলো ছিল খুব সংকীর্ণ। সমুদ্রপৃষ্ঠ শতাধিক মিটার নিচে থাকায় নদীগুলো গভীর খাদের সৃষ্টি করেছিল। এই গভীর খাদ সংবলিত নদী পটুয়াখালির সাগরতট থেকে দক্ষিণে হয়তো শতাধিক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও সেই খাদ সংবলিত নদীর চিহ্ন বঙ্গোপসাগরের বহুদূর পর্যন্ত সাগর তলে বিস্তৃত। হিমযুগের শেষে ১৫ থেকে ১০ হাজার বছরের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটাতে থাকে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় স্থলভাগের বরফ গলতে থাকে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই সাগরতট দ্রুত উপরে উঠতে থাকে। বাংলাদেশ এলাকায় প্রবল মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পানি এবং হিমালয় পর্বতমালার বরফ গলা পানি একযোগে প্রচণ্ড বেগে বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বঙ্গোপসাগরের পানির পৃষ্ঠ দ্রুত উপরে উঠতে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমান অবস্থানে আসলে পুরানদীর গভীর খাদ বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত অবস্থাতেই রয়ে যায় (Swash of no ground)। এখনও মেঘনা মোহনা (estuary) দিয়ে নদীর ঘোলা পানি প্রবল বেগে উক্ত পুরানদীর নিমজ্জিত উপত্যকা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। ফেয়ার ব্রিজের (১৯৬১) রেখাচিত্র থেকে (চিত্র ৪.৩) এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সাগরতটের উপাত্ত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্লেইস্টোসিনের শেষ থেকে হলোসিন সময়ের সমুদ্রপৃষ্ঠ দ্রুত উপরে উঠতে প্রায় ৫,৫০০ বছর আগে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের সমুদ্রপৃষ্ঠের এ অবস্থান বর্তমান সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় ১ থেকে ২ মিটার উপরে ছিল। বঙ্গোপসাগরের বর্তমান পূর্বতটে সমুদ্রপৃষ্ঠের ঊর্ধ্ব অবস্থানের যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। চিটাগং থেকে সেন্টমার্টিন পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের পূর্বতটে হলোসিন সময়ের উচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

হলোসিন সময়ের উচ্চ সমুদ্রতটের কতকগুলো প্রমাণ নিম্নে সন্নিবেশিত হলো :

(১) মহেশখালী দ্বীপে উত্তর নালবিলা থেকে দক্ষিণ গোরকঘাটা পর্যন্ত রাস্তার পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় মিটার উচ্চ মাচানের মতো সমভূমি ঢেউয়ে কাটা মাচান (wave cut platform) এর মতো (চিত্র ৪.৫)। গোরকঘাটা থেকে উত্তর নালবিলা পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা বরাবর সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে সাগরতট ছিল। রাস্তার দু'পাশে সেকালের সৈকত বালি (beach sand) দেখা যায়। এখনকার কক্সবাজার-টেকনাফ সৈকত বালির মতোই সে বালিতে মূল্যবান ভারি মণিকের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। গোরকঘাটা-নালবিলা রাস্তার পূর্বেই বিস্তৃত মহেশখালীর আদি পাহাড়িয়া এলাকা। বোকাবিল ও টিপাম বালুকণার এমন পাহাড়িয়া এলাকা রাস্তার পশ্চিমেও বিস্তৃত ছিল। বোকাবিল ও টিপাম বালুকণার এমন পাহাড়িয়া এলাকা রাস্তার পশ্চিমেও বিস্তৃত ছিল। হলোসিন সময়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ঐ সকল নরম শিলায় গঠিত পাহাড় সামুদ্রিক ঢেউয়ে প্রাপ্ত হয়ে

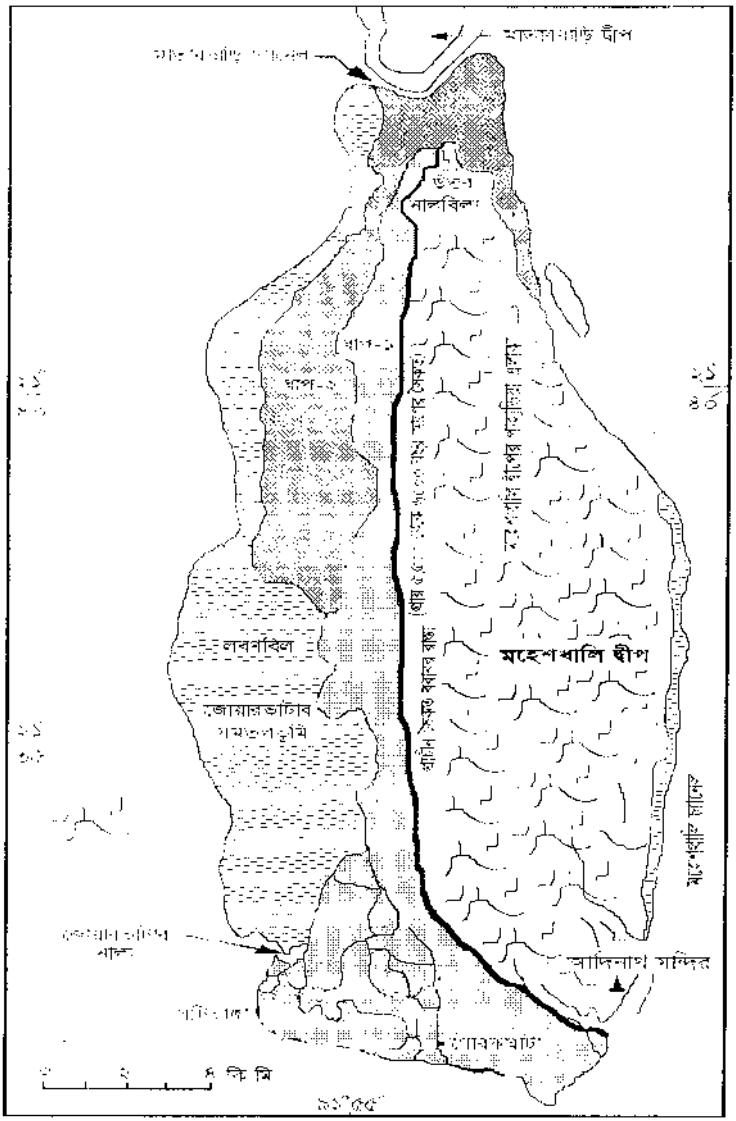

চিত্র ৪.৫ : মহেশখালি দ্বীপের মানচিত্র।

মাচানের মতো সমতলভূমি তৈরি করেছে। বর্তমান সাগরতট নিচে নামায় বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা বর্তমানে লবণ বিলে পরিণত হয়েছে।

(২) কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ছোট বড় খাড়া পাহাড় প্রকৃতপক্ষে, হলোসিন সময়ের উচ্চ সাগরতটের ঢেউয়ে কাটা খাড়া পাহাড়ই (wave-cut cliff) বটে। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের সাগরতট এ সকল খাড়া পাহাড়ের (cliff) পাদদেশ বরাবরই বিস্তৃত ছিল। খাড়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বর্তমান সাগরতট পর্যন্ত বিস্তৃত মাচানের (platform) মত উঁচু সমতল এলাকা (জোয়ারের উঁচুরেখা হতে প্রায় ১ মিটার উঁচু) বর্তমানের লবণ বিল যা' তৈরি হয়েছে হলোসিন উচ্চ সাগরতটের প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে (wave-cut platform)। এই মাচানের পাতলা পলির নিচেই রয়েছে তৎকালীন সৈকতবালি, যা' ভারি মণিকে ভরপুর। আর রয়েছে বড় বড় গোল পাথর (concretion)। সাগরতটের খাড়া পাহাড়ের মধ্যে বোকাবিল সোপানের এ সকল গোল পাথর দেখা যায়। এ সকল গোল পাথর বর্তমান সাগরতটে দেখা যায়। ইনানীর সৈকতে এ সকল গোল পাথরের আধিক্য অনেক বেশি এবং সেগুলো সৈকতকে উত্তাল তরঙ্গ থেকে রক্ষা করছে। হলোসিন সময়ের জলোচ্ছ্বাসে বা সমুদ্রের সম্মুখগামিতায় বোকাবিল শেল ও বালির তৎকালীন পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বালি চলে গেছে সমুদ্রগর্ভে আর বিশাল গোল পাথরগুলোই সৈকত বরাবর রয়ে গেছে। বোকাবিল শিলার খাড়া পাহাড়াগুলোর পাদদেশ থেকে সামনে এমন মাচান বা লবণবিল তৈরি করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নামায় এ সকল গোল পাথর সৈকতকে রক্ষা করেছে ঢেউয়ের হাত থেকে। গোল পাথর না থাকায় টিপাম সংঘের বালির পাহাড়ে অবশ্য এখনও ক্ষয়ক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। হিমছড়িতে এমন দৃশ্য এখনও বিদ্যমান। সেখানে উন্মুক্ত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ সরাসরি আঘাত করছে টিপাম পাহাড়ের পাদদেশকে। সেখানে অবশ্য পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত কোনো মাচান দেখা যায় না। টেকনাফে এমন উঁচু মাচান বা লবণবিল থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ী বা কনস্ট্রাক্টর গোল পাথর সংগ্রহ করছে (যদিও সৈকত রক্ষার্থে তা' সমর্থন করা যায় না)। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বর্তমান সাগরতটের পেছনে খাড়া পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় গোল পাথর ও সৈকতবালির (ভারি মণিকের আধিক্য) অবস্থানই প্রমাণ করে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের উচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠের অবস্থান ও সমকালীন তটরেখা (চিত্র ৪.৬)।

(৩) বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে দূরে সাগরের মধ্যে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ। প্রায় ৪ কি.মি. ও ১ কি.মি. (সর্বোচ্চ) প্রস্থ এই দ্বীপটি হয়তোবা মধ্য প্লেইস্টোসিন সময়ের টেকটনিক আন্দোলনের ফলে তৈরি হয়েছে। সাগরের মধ্যে অবস্থান হওয়ায় দ্বীপটির উপরিভাগ সমুদ্রের ঢেউয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। গোল পাথর ও সৈকতবালি দ্বীপটির প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঠানামা করায় কোয়াটারনারির শেষে দ্বীপটির উপরিভাগ অনেকবারই সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। দ্বীপটি সাগরের পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে গোল পাথরের গায়ে জন্ম নিয়েছিল কোরাল। যেহেতু

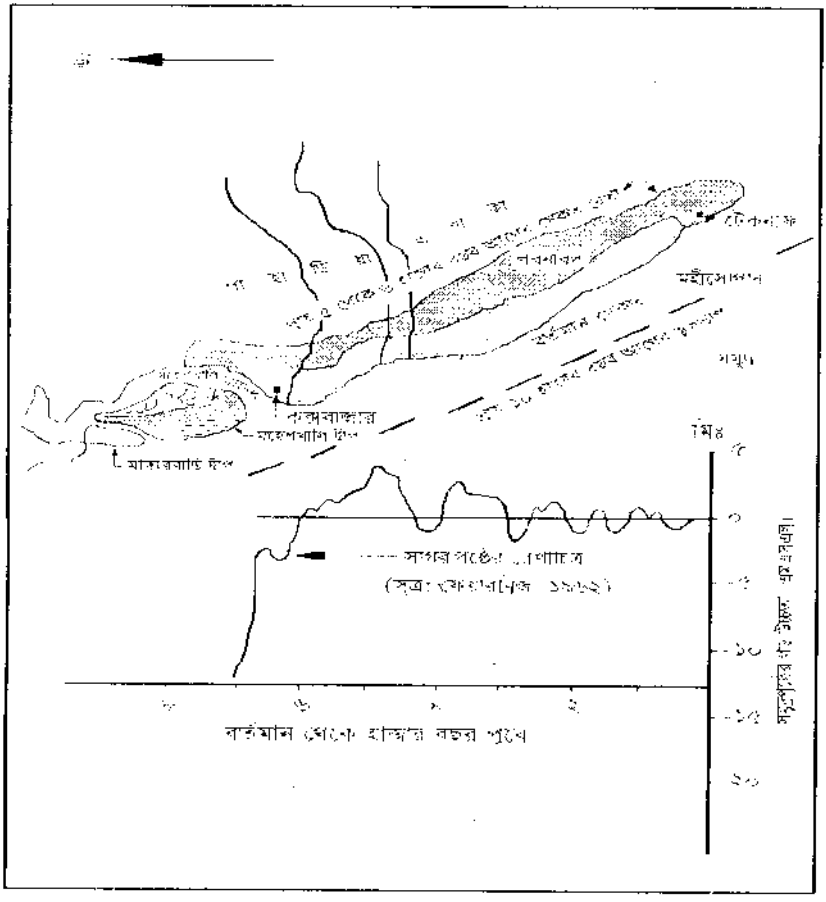

চিত্র ৪.৬ : সাগরপৃষ্ঠ পরিবর্তনের রেখাচিত্রের আলোকে কক্সবাজার–টেকনাফ সমুদ্রসৈকত।

দ্বীপটি কয়েকবার সাগরের পানির নিচে নিমজ্জিত হয়েছিল তাই দ্বীপের উপরিভাগের কোরালও বিভিন্ন সময়ের। দ্বীপটিতে একটি কোকুইনার স্তর দেয়া যায়। এই স্তরটি সর্ব উপরে এবং বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় এক থেকে দেড় মিটার উপরে। একই রকম কোকুইনার খোসা টেকনাফে মাচাংঘাটের গোল পাথর সংবলিত সৈকত বালিস্তরের মধ্যেও দেখা যায়। এ সকল নিদর্শন থেকেই বুঝা যায় কোকুইনা স্তরটি হলোসিন সময়ের উচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠের সাক্ষ্য বহন করে।

(৪) বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিশাল নদীগুলো দ্বারা বাহিত প্রচুর বালিকণা বঙ্গোপসাগরের অবক্ষেপিত হচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে অনেক নতুন নতুন দ্বীপ জেগে উঠছে। এ সকল দ্বীপের উপরিভাগ এখনও জোয়ারের সর্বোচ্চ উচ্চতার নিচে অবস্থান করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ এক বা দু' মিটার নিচে নেমে গেলে এ সকল দ্বীপপুঞ্জ জেগে উঠবে। এখনকার জেগে উঠা দ্বীপের মতো সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেও জোয়ারের সর্বোচ্চ উচ্চতার নিচে নিমজ্জিত দ্বীপপুঞ্জ ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ দু'মিটার নিচে নামায় এ সকল দ্বীপপুঞ্জ স্থলে পরিণত হয়। হাতিয়া, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের হলোসিনের উচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠকালীন সময়ে গঠিত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নামায় এ সকল দ্বীপপুঞ্জ জেগে উঠেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পুরামৃত্তিকা

(Palaeosol)

ভূমিকা

স্তরবিন্যাস পুরামৃত্তিকার গুরুত্ব অনেক। প্রথমেই দেখা যাক মৃত্তিকা কি? এক কথায় মৃত্তিকা সেই মাটিকেই বলা যায়, যে মাটির উপরে উদ্ভিদ জন্ম নিয়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বেঁচে থাকতে পারে। মৃত্তিকা হলো, প্রকৃতিজাত এমন একটি জিনিস যা সময়ের ব্যবধানে স্থির ভূমিরূপে জৈব ও আবহাওয়ার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের উৎস বস্তুতেই ধীরে ধীরে জন্মলাভ করতে পারে। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকা গঠনে পাঁচটি উপসর্গ প্রধান : (১) উৎস বস্তু (parent material), (২) জৈব পদার্থ (biota), (৩) ভূমিরূপ (relief), (৪) আবহাওয়া (climate) ও (৫) সময় (time)। ভূপৃষ্ঠের শিলার আবরণ উপযুক্ত আবহাওয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। আর সহায়ক ভূমিরূপের কারণে এ সকল ক্ষয়িত পদার্থ অন্য স্থানে স্থানান্তরিত না হয়ে স্বস্থানে অবস্থান করে। এরপর ধীরে ধীরে সেখানে জৈব পদার্থ জমা হতে থাকে এবং তার পরিমাণ বাড়তে থাকে। এরূপ অনুকূল আবহাওয়ায় উদ্ভিদের জন্ম শুরু হয়। এভাবেই আদি শিলা মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়।

মৃত্তিকায় দু'ধরনের পদার্থ থাকে : (১) অজৈব ও (২) জৈব। অজৈব পদার্থ বলতে মাটিতে মোট আটটি মৌলিক পদার্থের পরিমাণ বুঝায়। এই আটটি মৌলিক পদার্থ হলো : লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও সিলিকন। প্রকৃতপক্ষে, আদি শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হলেই উক্ত মৌলিক পদার্থগুলো বের হয়ে আসে। জৈব পদার্থের মধ্যে হিউমাস নামক কাল এক ধরনের পদার্থ থাকে যা উদ্ভিদের খাদ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। একটি আদর্শ মৃত্তিকার প্রস্থচ্ছেদে তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয় : (১) 'এ' স্তর, (২) 'বি' স্তর ও (৩) 'সি' স্তর। মৃত্তিকা বলতে প্রকৃতপক্ষে 'এ' ও 'বি' স্তর দু'টিই বুঝায়। 'সি' স্তর হলো শিলাস্তর (চিত্র ৫.১)।

'এ' স্তরের গুরুত্ব সর্বাধিক এক মিটার। 'এ' স্তরকেও মোটামুটি ২টি ভাগে ভাগ করা যায় : 'এ ১' এবং 'এ-২'। প্রস্থচ্ছেদের উপরিভাগে কাল রংয়ের পাতলা একটি স্তরকে 'এ ১' স্তর বলা হয়। জৈব পদার্থের ধ্বংসাবশেষ এখানে জমা হয় বলেই সাধারণত এ পাতলা স্তরের (৫-১০ সে.মি.) রং কালো। এ পাতলা কালস্তরের নিচেই 'এ-২' স্তর। উপরের

ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ এই স্তর দিয়ে নিচে চুইয়ে যায়। সাধারণত এই স্তরের রং উজ্জ্বল বা সাদা। বিশেষ করে, উপরের ক্ষয়প্রাপ্ত কাদাজাতীয় পদার্থের সাথে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামের আয়ন নিচে পানির সাথে চুইয়ে নিচে যায়। 'এ' স্তরের নিচেই থাকে 'বি' স্তর। 'বি' স্তর হলো আদি শিলার ক্ষয়িত পদার্থ জমানোর এলাকা (zone of accumulation)। 'বি' স্তরের রং গাঢ় তামাটে। উপর থেকে চুইয়ে আসা পদার্থ 'বি-১' স্তরে অতি সামান্য ও 'বি-২' স্তরে অবশিষ্টাংশ জমা হয়। এই জমাকৃত পদার্থের মধ্যে লৌহকণা, পানি ও বাতাসের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে লোহার অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইডজাতীয় মণিক তৈরি করে। এ সকল মণিকের রং সাধারণত হলদে বা তামাটে। তাই 'বি' স্তর তামাটে দেখা যায়। 'সি' স্তরটি প্রকৃতপক্ষে আদি শিলাস্তর। তবু এ স্তরে ক্ষয়সাধনের প্রক্রিয়া লক্ষণীয়।

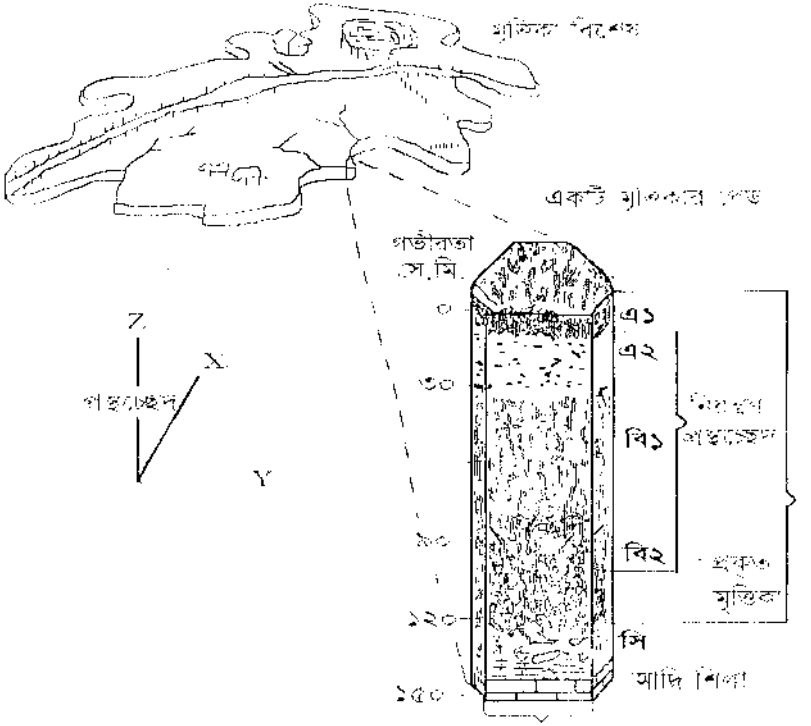

চিত্র ৫.১ : একটি আদর্শ মৃত্তিকার প্রস্থচ্ছেদ (সূত্র : বুণ্ডল ও অন্যান্য, ১৯৭৩)

একটি মৃত্তিকার প্রস্থচ্ছেদে স্তরগুলো আলাদা আলাদাভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে বেশ সময় লাগে। এই সময় কয়েকশত বছর হতে শিলার প্রকারভেদ কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত

হতে পারে। নরম পাললিক শিলাতে যেমন কম সময় লাগে তেমনি আগ্নেয়শিলা আর্দ্র আবহাওয়ায় ক্ষয়সাধন হয়ে মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে। একটি মৃত্তিকার স্তর সেই সময়ের আবহাওয়ায় ভারসাম্য রক্ষা করে তৈরি হয়।

পুরামৃত্তিকা বলতে আমরা আদিকালের মৃত্তিকাকেই বুঝি। অতীতে একটি বিরাট সময় ধরে মৃত্তিকা গঠনের পর যদি উক্ত মৃত্তিকা স্তরের উপরে পললক্ষেপণ হয় তবে ঐ মৃত্তিকার স্তর উপরস্থিত নতুন অবক্ষেপ দ্বারা ঢাকা পরে যায়। বদলে যায় পৃথিবী, বদলে যায় পৃথিবীর আবহাওয়া ও পরিবেশ। আর এই আচ্ছাদিত মৃত্তিকার স্তর মাটির নিচে থেকেই চেষ্টা করে নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে।

মৃত্তিকাস্তর যখন অপর একটি শিলাস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন প্রায়ই দেখা যায়, মৃত্তিকার উপরের 'এ' স্তরটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর এবং 'বি' স্তরের উপরে পললক্ষেপণ হয়েছে। যার ফলে কোনো একটি স্তরীয় প্রস্থচ্ছেদে 'বি' স্তরটি তামাটে রংয়ের স্তর হিসেবে দৃশ্যগোচর হয়। সুতরাং তামাটে রংয়ের স্তর দেখে স্তরীয় প্রস্থচ্ছেদে পুরামৃত্তিকা শনাক্ত করবার একটি উপায়। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে স্তরতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদে সকল তামাটে স্তরই পুরামৃত্তিকা নয়।

স্তরতাত্ত্বিক প্রস্থচ্ছেদে পুরামৃত্তিকার উপস্থিতি অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন :

১। পুরামৃত্তিকা কোনো একটি ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ নির্দেশক। মৃত্তিকা স্থলভাগেই জন্ম লাভ করে।

২। পুরামৃত্তিকা কোনো একটি ভূপৃষ্ঠের এমন একটি স্থান নির্দেশ করে যে স্থান স্থলভাগে বহুকাল উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল। যার ফলে উক্ত স্থানের শিলাস্তর প্রাকৃতিক (physical) জৈবিক (biological) রাসায়নিক (chemical) বিক্রিয়ার ফলে ক্ষয়সাধিত হয়েছে।

৩। পুরামৃত্তিকা কোনো একটি ভূপৃষ্ঠের পললক্ষেপণের বিরতি নির্দেশক। উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠে পললক্ষেপণ হলে ক্ষয়সাধন হওয়ার সময় পাবে না, ফলে মৃত্তিকার জন্মলাভ ঘটবে না। মৃত্তিকা গঠনের পূর্বশর্ত হলো, ক্ষয়িত পদার্থগুলো স্থানান্তরিত না হয়ে স্বস্থানেই অবস্থান করতে হবে। যদি ক্ষয়িত পদার্থ বাতাসে বা পানির মাধ্যমে অন্যস্থানে চলেই যায়, তবে সর্বদাই আদি শিলাস্তর উন্মুক্ত থাকবে। 'এ' ও 'বি' স্তর গঠনে যে সূক্ষ্ম বালি বা কর্দাকণা দরকার তা থাকবে না।।

৪। পুরামৃত্তিকা আর্দ্র আবহাওয়া নির্দেশক। কোনো একটি স্থানে মৃত্তিকা গঠনে আবহাওয়া অবশ্যই সহায়ক হতে পারে। অধিরাম শুষ্ক আবহাওয়া শিলার ক্ষয়সাধনে সহায়ক হতে পারে, তবে কোনো উদ্ভিদের জন্মে সহায়ক হতে নয়। সাভানা আবহাওয়া মৃত্তিকা গঠনে অতি সহায়ক নয়। সাভানা আবহাওয়ায় অল্প বৃষ্টিপাত হয়। তাই দুর্বল মৃত্তিকা জন্মলাভ করে। সামান্য ছোট ছোট গাছপালার জন্ম হতে পারে। সুন্দর মৃত্তিকা গঠনে আর্দ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে গভীর বনের সৃষ্টি হতে পারে।

৫। মৃত্তিকা সর্বদাই অসংগতি নির্দেশক। কারণ মৃত্তিকা গঠনে ভূপৃষ্ঠ দীর্ঘদিন পললক্ষেপণ ব্যতিরেকে উন্মুক্ত থাকতে হবে।

৬। মৃত্তিকা নির্দেশক স্তর (marker horizon) ইঙ্গিত করে। মৃত্তিকা একটি নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় জন্ম লাভ করে। আর ঐ আবহাওয়াও শুধু ছোট্ট একটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোনো এক কালে কোনো একটি আবহাওয়ার বিস্তৃতি থাকে ব্যাপক। সুতরাং মৃত্তিকার পার্শ্বস্থ বিস্তৃতি (lateral extension) থাকে ব্যাপক। কোনো এক স্থানে পুরামৃত্তিকা দেখা গেলে সমকালীন পুরামৃত্তিকা দুই একশত কিলোমিটার ফাঁকেও দেখা যাবে। সুতরাং বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের স্তরীয় এককগুলোর মধ্যে পারম্পর্য স্থাপনে পুরামৃত্তিকা নির্দেশক স্তর হিসেবে কাজ করে।

পুরামৃত্তিকার প্রকারভেদ (Kinds of Palaeosol)

বিখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী রেটালাক (১৯৮১) পুরামৃত্তিকাকে সাধারণত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : (চিত্র ৫.২)

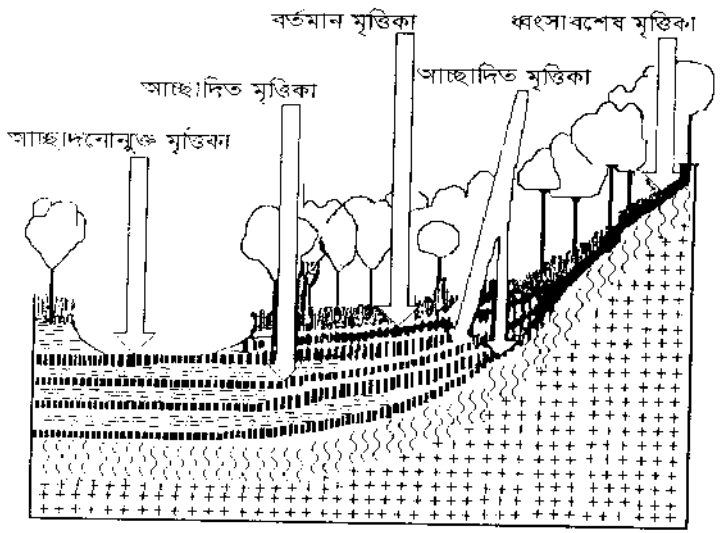

চিত্র ৫.২ : বিভিন্ন প্রকার পুরামৃত্তিকা (সূত্র : রেটালাক, ১৯৮১)।

(১) আচ্ছাদিত মৃত্তিকা (Buried soil)

(২) আচ্ছাদনোন্মুক্ত মৃত্তিকা (Exhumed soil)

(৩) ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা (Relic soil)।

(১) আচ্ছাদিত মৃত্তিকা : একটি মৃত্তিকা গঠনের পর যদি প্রতিবেশের পরিবর্তন ঘটে এবং উক্ত মৃত্তিকা স্তরের উপরে যদি পললক্ষেপণ হয় তবে মৃত্তিকা স্তরটি উপরের অবক্ষেপ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এরূপ একটি মৃত্তিকা স্তর যদি অপর একটি পললক্ষেপণ চক্রের নতুন অবক্ষেপ দ্বারা মাটির নিচে নিমজ্জিত হয়ে যায় তবে তাকে **আচ্ছাদিত মৃত্তিকা স্তর** বলা হয়। প্লাবনভূমিতে পললক্ষেপণের বিভিন্ন চক্রের ফলে একটি মৃত্তিকার স্তরের উপরে আরোও একটি মৃত্তিকার স্তর, এমনকি একাধিক মৃত্তিকার স্তর দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে বায়ুবাহিত অবক্ষেপণের মধ্যে অনেক আচ্ছাদিত মৃত্তিকা স্তর দেখা যায়। চীনের লোয়েস মালভূমি (plateau) এবং বেলজিয়ামের অরনেটন মিশ্রিত মৃত্তিকা (Warneton soil complex) এমন কতকগুলো আচ্ছাদিত মৃত্তিকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(২) আচ্ছাদনোন্মুক্ত মৃত্তিকা : কোনো একটি আচ্ছাদিত মৃত্তিকা যদি ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়সাধনের মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়ে যায় তবে তাকে **আচ্ছাদনোন্মুক্ত মৃত্তিকা** বলা হয়। ক্ষয়সাধনের মাধ্যমে নদী উপত্যকায় এ ধরনের আচ্ছাদনোন্মুক্ত মৃত্তিকা দেখা যেতে পারে।

(৩) ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা : ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানে যদি ভূতাত্ত্বিক সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে এবং আবহাওয়া যদি সহায়ক হয় তবে ঐ স্থানে পরবর্তীকালের পরিবর্তিত আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষা করে গঠিত পুরানো মৃত্তিকার উপর নতুন মৃত্তিকা গঠনের ছাপ পরে। এ ধরনের মৃত্তিকাকে ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা বলা হয়। সোজা কথায় বলা যায়, পুরাকালের আবহাওয়ার দ্বারা গঠিত পুরামৃত্তিকার পদার্থের উপর নতুনকালে নতুন করে মৃত্তিকা গঠন করলে উক্ত মৃত্তিকাকে **ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা** বলা হয়। মধুপুর ও বরেন্দ্র এলাকার পুরামৃত্তিকার উপর নতুন করে গঠিত মৃত্তিকা ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকার উদাহরণ।

পুরামৃত্তিকার শনাক্তকরণ (Identification of Palaeosol)

পুরামৃত্তিকা শনাক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। কোনো একটি স্তরীয় প্রস্থচ্ছেদে পুরামৃত্তিকা তামাটে রংয়ের দেখা যায়। আবার সকল তামাটে রংয়ের স্তরই পুরামৃত্তিকা নয়। সাধারণত মৃত্তিকার এ স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়িত পদার্থ হতে লোহার মুক্ত আয়ন 'বি' স্তরে জমা হয়। শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বায়ু চলাচলেরও সুবিধা হয়। 'বি' স্তরে জমা লৌহ কণিকা বায়ু ও বৃষ্টির চুয়ানো পানির সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে হেমাটাইট, গোয়েথাইট, লিমোনাইট, ম্যাগেমাইট ইত্যাদি মণিক তৈরি করে। এ সকল মণিকের রং হলদে বা তামাটে। তাই 'বি' স্তরটি হলুদ বা তামাটে দেখায়।

প্লাবনভূমিতে আচ্ছাদিত মৃত্তিকা কালচে বা ধূসর রংয়ের দেখাতে পারে। 'এ' স্তরটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আগেই যদি পললক্ষেপণ হয় তবে স্তরীয় অবক্ষেপে 'এ' স্তরকে কালচে রংয়ের দেখাতে পারে; সে ক্ষেত্রে 'বি' স্তরটি 'এ' স্তরের নিচে থাকতে পারে যদি মৃত্তিকা গঠনকালে 'বি' স্তরটি সুস্পষ্টভাবে গঠিত হয় বা ফুটে উঠে।

পুরামৃত্তিকা স্তরে জৈব পদার্থ থাকতে পারে। বিশেষ করে ঘাসের বা উদ্ভিদের মূল। মৃত্তিকা থাকলে তো উদ্ভিদ জন্মলাভ করবেই এবং পুরামৃত্তিকা স্তরে উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে অম্লজাতীয় পানির (acidic water) দ্বারা কালক্রমে ঘাসের বা উদ্ভিদের মূল গলে পানির সাথে মিশে নিচের দিকে চুয়ায়ে যায়। যার ফলে মূলটি সম্পূর্ণভাবে গলে যাবার পর উদ্ভিদের শিকড় বরাবর একটা ছিদ্র সৃষ্টি করে। ছিদ্র দিয়ে বছরের পর বছর পানি চুয়ায়ে যাওয়ার ফলে ছিদ্রের গায়ে লৌহকণা জমতে থাকে। ছিদ্রের গায়ে লৌহকণা জমতে জমতে কালক্রমে ভিতরে ছিদ্র সংবলিত লম্বা উপরে মোটা ও নিচে সরু আকারের নল তৈরি করে যাকে লৌহ গুঁড়ি (pipe stem) বলা হয়।

পুরামৃত্তিকা শনাক্ত করবার বিশেষ দিক হলো রংয়ের ছাপ (colour mottling)। সাদা বা ধূসর মাটির গায়ে লাল, ফ্যাকাশে লাল দাগ। ভূজলের পৃষ্ঠ (ground water level) উঠানামার জন্য এমন দাগের উৎপত্তি হয়। বর্ষাকালে ভূজলপৃষ্ঠ উপরে উঠে এবং শুষ্ক মৌসুমে নিচে নেমে যায়। ভূজলপৃষ্ঠ উপরে উঠলে বালি প্রধান মাটির অংশের লৌহ আয়ন পানির সাথে স্থানান্তরিত হয়। ভূজলপৃষ্ঠ নিচে নামলে কাদা প্রধান অংশ শুষ্ক মৌসুমে অনেক দিনই পানি ধারণ করে। সিক্ত কাদায় চারপাশে শুষ্ক মৌসুমে বায়ু চলাচল করে। লৌহ কণিকা পানি ও বায়ুর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে হলুদ বা তামাটে রংয়ের লোহার অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে। ফলে ঐ সমস্ত স্থানে হলদে, লাল বা তামাটে রংয়ের দাগ দেখা যায়। জারণ-বিজারণের এ সকল দাগ সংবলিত মৃত্তিকাকে **গ্লে-মৃত্তিকা** (Gley soil) বলা হয়। মধুপুর ও বরেন্দ্র এলাকায় লাল মাটির জারণ-বিজারণের দাগ ও রংয়ের দাগ উল্লেখযোগ্য। ভূজলপৃষ্ঠ যদি অনেক নিচে থাকে তবে চুয়ানো পানির প্রভাব পরে মৃত্তিকা গঠনে। এ সকল মাটিতে যদি অপ্রবেশ্য (impervious) স্তর থাকে তবে বৃষ্টির পানি চুয়ায়ে নিচে যাওয়ার কালে এ সমস্ত স্তরে সাময়িকভাবে বাধা পায় এবং পানি জমে ভিজে উঠে। এ সকল স্থানে রংয়ের দাগ পড়ে (অর্থাৎ পানি ও বাতাসের সাহায্যে লোহার অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে) এবং চারদিকে বিজারিত হয়। এ ধরনের মৃত্তিকাকে **ছদ্ম-গ্লে মৃত্তিকা** (Pseudogley soil) বলা হয়। মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের উর্ধ্ব সভ্যে এ ধরনের ছদ্ম গ্লে মৃত্তিকা দৃশ্যগোচর হয়।

মাইক্রোমরফোলজিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পুরামৃত্তিকা শনাক্ত করা যেতে পারে। এ গবেষণায় এক টুকরা মাটি বা পেড (ped) নিতে হয় যার ভিতরের কণাগুলো নড়াচড়া করে না। এরপর বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের মাধ্যমে উক্ত পেডের মধ্যে রেজিন ঢুকিয়ে শক্ত করে শিলার সূক্ষ্মচ্ছেদ (thin section) তৈরি করা হয়। একটি সমবর্তিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (polarized microscope) সাহায্যে উক্ত সূক্ষ্মচ্ছেদ দেখলে মৃত্তিকার অনেক গাঠনিক দৃশ্য দেখা যায় যা থেকে ধারণা করা যায় মাটি মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল কিনা।

মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘের মাইক্রোমরফোলজিক্যাল গবেষণা (Micromorphological studies of the Madhupur and Barind Formations)

মধুপুর ও বরেন্দ্র সংঘদ্বয় হতে মাইক্রোমরফোলজির জন্য বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনার পেডগুলো এমন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয় যে স্থানের তলানি এলোমেলো হয়ে যায় নি। এ সকল নমুনা কতকগুলো অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের মধ্যে নিয়ে পাত্রগুলোকে এমন একটি বন্ধ সিস্টেমের মধ্যে রাখা হয় যার মধ্যকার বাতাস বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে বের করে দেয়া হয়। এর ফলে নমুনার মধ্য থেকেও বায়ু নিষ্কাশিত হয়। বায়ু নিষ্কাশনের সাথে সাথে নমুনাগুলোর কণার ভিতরের শূন্যস্থানগুলোর মধ্যে রেজিন প্রবেশ করানো হয়। এরপর নমুনাগুলো শক্ত করে সূক্ষ্মচ্ছেদ (thin section) প্রস্তুত করা হয়। এর-পর সূক্ষ্মচ্ছেদগুলোকে সমবর্তিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। (চিত্র ৫.৩)

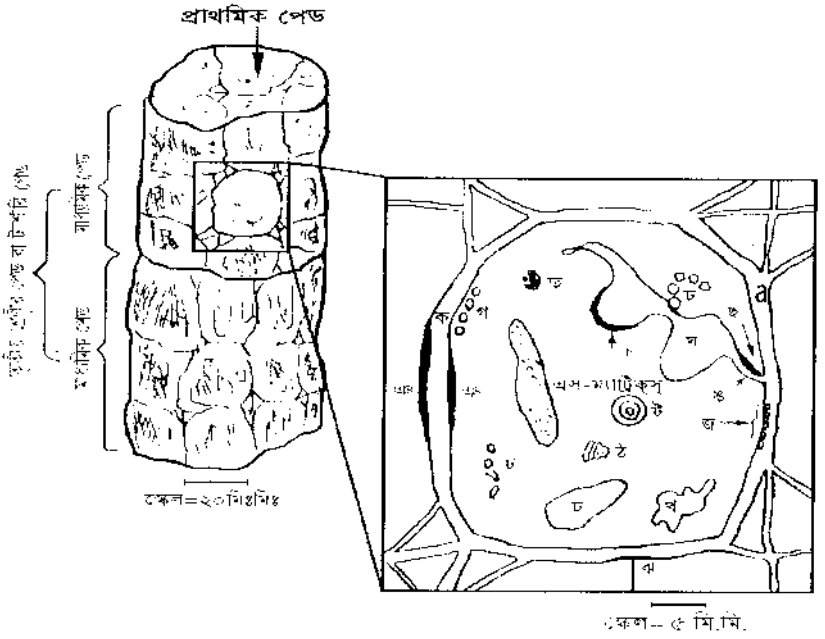

চিত্র ৫.৩ : কিছু মাইক্রোমরফোলজির মুখাবয়ব :

ক প্যাকিং ভয়েড ; খ-ভুগস ; গ-ভেসিকলসম ; ঘ-চ্যাম্বার ; ঙ-চ্যানেল ; চ-চ্যাম্বার কোটিং ; ছ-চ্যানেল কোটিং ; জ-স্কেলিট্যান ; ঝ-ক্লে কোটিং ; ঞ-স্ট্রেস কোটিং ; ট-কঙ্কর (কনক্রেশন) ; ঠ-পাপিউল ; ড-নডিউল ও ঢ-স্কেলিটন কণা। স্কেলিটন কণা ও ভয়েডসমূহের সমন্বয়ে প্লাজমা তৈরি হয়। (সূত্র : বুওল, ১৯৭৩)।

নমুনাগুলো মধুপুর এলাকার মিরপুর, লালমাই এলাকার রূপবান মুরা ও বরেন্দ্র এলাকার রহনপুর থেকে নেয়া হয়েছিল। গবেষণা শেষে এটাই পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এ সকল সংঘের উপরের অংশের মৃত্তিকা বেশ পক্ক ; নিচের দিকে পক্কতা কমতে থাকে এবং নিম্ন সভ্যের পক্কতা প্রায় একেবারেই নেই। তবে এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সংঘগুলোতে একাধিক পুরামৃত্তিকা আছে।

সংঘগুলোতে পুরামৃত্তিকা নির্দেশক যে সকল সূক্ষ্ম গঠনরীতি (microstructure) পাওয়া যায় তার মধ্যে ভুগ (Vugh), ভেসিকল (Vesicle), চ্যামবার (Chamber), ও চ্যানেল (Channel) গঠনরীতি প্রধান। মৃত্তিকা আকৃতির (Pedofeature) মধ্যে দানাহীন (amorphous), অবকেলাসী (Cryptocrystalline), বুননি (texture) এবং নিঃশেষিত (depletion) মৃত্তিকাকৃতি প্রধান। এছাড়া উক্ত সংঘগুলোতে জারণ–বিজারণের স্থানগুলো অতি সুস্পষ্ট এবং লৌহগুঁড়ি লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অক্সিজেন আইসোটোপ
(Oxygen Isotope)

ভূমিকা

আইসোটোপ বলতে কোনো মৌলিক পদার্থের সে ধরনের পরমাণু বুঝায় যাদের নিউক্লিয়াস-সমূহে (Nucleus) সমান সংখ্যক প্রোটন (Proton) কিন্তু অসমান সংখ্যক নিউট্রন (Neutron) থাকে। আইসোটোপ গ্রীক শব্দ। আইসো (Iso) অর্থ সমান, টোপস (Tope) অর্থ স্থান। এর অর্থ হলো পিরিওডিক টেবিলে (Periodic table) তাদের অবস্থান একই স্থানে।

এটা সবারই জানা আছে যে, ইলেকট্রনের ওজন অতি সামান্য বিধায় কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন নির্ধারিত হয় উক্ত পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ধারণকৃত প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যার উপর। ইলেকট্রনের ওজন প্রোটন বা নিউট্রনের তুলনায় অতি সামান্য বিধায় পারমাণবিক ওজন থেকে বাদ দেয়া হয়। প্রোটন এবং নিউট্রনের ওজন সমান। তাই একটি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন বিভিন্ন রকম। যেমন অক্সিজেনের তিন ধরনের পরমাণু পাওয়া যায়। সকল ধরনের পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা ৮, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্নতর : কোনোটিতে ৮, কোনোটিতে ৯ এবং কোনোটিতে বা ১০টি নিউট্রন পাওয়া যায়। ফলে অক্সিজেনের তিন ধরনের আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন যথাক্রমে ১৬, ১৭ এবং ১৮। এ সকল আইসোটোপকে সাধারণত ^{16}O, ^{17}O এবং ^{18}O এভাবে লেখা হয়।

প্রকৃতিতে সাধারণত দু'ধরনের আইসোটোপ দেখা যায়। যথা : স্থায়ী এবং অস্থায়ী। স্থায়ী আইসোটোপের সংখ্যা প্রায় ৩০০। আর অস্থায়ী আইসোটোপের সংখ্যা প্রায় ১২০০ এর কাছাকাছি। অস্থায়ী আইসোটোপগুলো তেজস্ক্রিয়। স্থায়ী বলতে অনেকটা আপেক্ষিক স্থিতিকাল বুঝায়। অস্তিত্ব নির্ভর করে অনেকটা তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়কালের উপর। কয়েকটি মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ এবং স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে তাদের প্রাচুর্য নিম্নে দেয়া হলো :

অক্সিজেন (O) :

$^{16}O = ৯৯.৭৬৩\%$

$^{17}O = ০.০৩৭\%$

$^{18}O = ০.১৯৯\%$

হাইড্রোজেন (H)

$^{1}H = ৯৯.৯৯৮৪৪\%$

$^{2}D = ০.০১৫৬\%$ (ডিউটেরিয়াম–Deuterium)

হাইড্রোজেনের উপরিউক্ত দুটি আইসোটোপই স্থায়ী। এ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দেখা যায় যাকে ট্রিটিয়াম (Tritium) বলা হয় এবং যার অর্ধ–জীবন বা হাফ লাইফ (Half-life) ১২.৫ বছর। কার্বনের দুটি স্থায়ী আইসোটোপ :

$^{১২}C = ৯৮.৮৯\%$

$^{১৩}C = ১.১১\%$

আইসোটোপ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়াসমূহ (Isotope Fractionation Processes)

আইসোটোপের অনুপাত অনুযায়ী দুটি বস্তু বা মাধ্যমের মধ্যে ধারণকৃত আইসোটোপসমূহ দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আইসোটোপ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া বলে। নিম্নলিখিত কারণসমূহ আইসোটোপ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী :

১। আইসোটোপ বিনিময়ী রাসায়নিক বিক্রিয়া (Isotope exchange reaction)

২। সক্রিয় গতিশীল প্রক্রিয়া (Kinetic process) বা কাইনেটিক প্রক্রিয়া

৩। প্রাকৃতিক–রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফল (Physico-chemical effect)।

১। আইসোটোপ বিনিময়ী রাসায়নিক বিক্রিয়া : এ ধরনের বিনিময়ী রাসায়নিক বিক্রিয়ার পদ্ধতির সাধারণ পরিবর্তন হয় না ; শুধু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী রাসায়নিক পদার্থের বা পদার্থের অবস্থার অথবা অণুগুলোর মধ্যকার আইসোটোপ বিস্তার বণ্টনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নিচের একটি আইসোটোপ বিনিময় বিক্রিয়া দেখা যাক :

$$ক_{১} + খ_{২} = ক_{২} + খ_{১}$$

মনে করি, ক এবং খ দুটি পৃথক যৌগ পদার্থের অণু যার মধ্যে কোনো একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু সাধারণ থাকে। ১ এবং ২ সংখ্যা যথাক্রমে ভারি ও পাতলা অণু নির্দেশ করে। এ বিক্রিয়ার ভারসাম্য রক্ষা হয় একটি ধ্রুবকের উপরে, যাকে **সমতা ধ্রুবক** (equilibrium constant) বলা হয়। ভূতত্ত্ববিদ্যায় এই সমতা ধ্রুবক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষণীয় যে, এই সমতা ধ্রুবক তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো সময় 'এক' এর অধিক এবং কোনো কোনো সময় 'এক' এর চেয়ে কম হয়।

এ অধ্যায়ে আমরা সাধারণত বিভক্তি গুণক (fractionation factor) এ বেশি গুরুত্ব দেব। কোনো একটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের দুটি আইসোটোপের সংখ্যার অনুপাতকে অন্য একটি রাসায়নিক পদার্থের ঐ দুটি আইসোটোপের সংখ্যার অনুপাত দিয়ে ভাগ

করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে **বিভক্তি গুণক** (α) বলা হয়। তরল পদার্থ থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হলে বিভক্তি গুণক (α) হবে :

$\alpha_{ত-গ}$ = (তরল পদার্থে দুটি আইসোটোপের অনুপাত)/(গ্যাসীয় পদার্থে ঐ দুটি আইসোটোপের অনুপাত)

প্রায়ই দেখা যায় পানি জলীয়বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। সে ক্ষেত্রে পানি ও জলীয়বাষ্পে অক্সিজেন আইসোটোপের বিভক্তি গুণক :

$\alpha_{পা-বা} = \{(^{১৮}O/^{১৬}O)_{পানি}/(^{১৮}O/^{১৬}O)_{বাষ্প}\}$

নিচের একটি আইসোটোপ বিনিময় রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যাক :

$C^{১৬}O_২ + H_২{}^{১৮}O = C^{১৮}O_২ + H_২ + H_২{}^{১৮}O$

উপরিউক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানির কোনো পরিবর্তন না হয়ে শুধু আইসোটোপের বিনিময় ঘটে।

$H_২{}^{১৮}O + ১/৩CaC^{১৬}O_৩ = H_২{}^{১৬}O + ১/৩CaC^{১৮}O_৩$

এ বিক্রিয়ায় সমতা রক্ষাকালে $K = \alpha$

২। **সক্রিয় গতিশীল বা কাইনেটিক প্রক্রিয়া :** এ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া সাধারণত দুটি আইসোটোপ অণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগের উপর নির্ভরশীল। যেমন বায়বীয় অবস্থায় আইসোটোপের হালকা অণুগুলো সাধারণত আইসোটোপের ভারি অণুর চেয়ে তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করবে। দুটি বায়বীয় বা গ্যাসীয় অণুর স্থানান্তরের গতিবেগ তাদের আণবিক ওজনের বর্গমূলের সাথে উল্টা সমানুপাতিক। যেমন হালকা কার্বন ডাই-অক্সাইডের আইসোটোপের ($^{১২}C^{১৬}O_২$) এর গতিবেগ এবং ভারি কার্বন ডাই-অক্সাইডের ($^{১৩}C^{১৬}O_২$) গতিবেগের অনুপাত এই দুটি অণুর আণবিক ওজনসমূহের বর্গমূলের সাথে উল্টাভাবে সমানুপাতিক। এর অর্থ হলো ৪৪ ভরসম্পন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের গতিবেগ ৪৫ ভরসম্পন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের গতিবেগের তুলনায় ১.১% বেশি।

($^{১২}C^{১৬}O_২$ এর গতিবেগ)/($^{১৩}C^{১৬}O_২$ এর গতিবেগ) $= \sqrt{(৪৫/৪৪)} = ১.০১১$

৩। **প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফল :** এ প্রক্রিয়ায় বাষ্পীভবন (evaporation) ও ঘনীভবন (condensation), স্ফটিকীকরণ (crystallization), গলন (melting) উল্লেখযোগ্য। বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন প্রক্রিয়াসমূহ ভূতত্ত্ববিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাষ্পীভবন (Evaporation) **এবং ঘনীভবন** (Condensation)

এ দুটি প্রক্রিয়া স্থায়ী আইসোটোপের ভূরসায়নবিদ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন আইসোটোপ অণু সংবলিত জলীয়বাষ্পের চাপে আইসোটোপ বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া

সম্পাদিত হয়। বাষ্পীভবনের সময় পাতলা আইসোটোপের অণু, যেমন ^{16}O, ভারি আইসোটোপের অণুর ^{18}O তুলনায় তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়। আবার ঘনীভবনকালে প্রথমেই ভারি আইসোটোপের অণুগুলো ঘনীভূত হয় এবং শেষের দিকে পাতলা আইসোটোপের অণু ঘনীভূত হতে থাকে।

আমরা জানি, হিমযুগে সাগরের পানি বাষ্পীভূত হয়ে বরফ আকারে স্থলভাগের উপর জমা হয়েছিল। মহাসমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে পানির পাতলা আইসোটোপই (^{16}O) জলীয়বাষ্প আকারে স্থলভাগের দিকে চলে যায়। ফলে সমুদ্রের পানিতে ভারি আইসোটোপের অণুর (^{18}O) আধিক্য দেখা যায়। এভাবে হিমযুগে যতই সাগরজল বাষ্পীভূত হতে থাকে ততই ^{16}O পাতলা আইসোটোপ জলীয়বাষ্পের সাথে স্থলভাগে চলে যেতে থাকে এবং সাগরজলে ভারি আইসোটোপের (^{18}O) পরিমাণ বাড়তে থাকে। এ কারণেই হিমযুগে সাগরজলে ভারি আইসোটোপের পরিমাণ বেশি ছিল। হিমবিরতিতে বরফগলা পানি আবার সমুদ্রে ফিরে আসায় পাতলা আইসোটোপের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সাগরজলে অক্সিজেনের দুটি আইসোটোপ ^{16}O এবং ^{18}O এর পরিমাণ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে থাকে।

জলীয়বাষ্প যখন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটাতে থাকে তখন প্রথমেই ভারি আইসোটোপের অণুগুলো (^{18}O) ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টির ফোঁটায় রূপান্তরিত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে জলীয়বাষ্প থেকে প্রথমেই যে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি হয় তাতে ভারি আইসোটোপের পরিমাণ অবশিষ্ট জলীয়বাষ্প থেকে বেশি থাকে। অবশিষ্ট জলীয়বাষ্প থেকে দ্বিতীয় ধাপে যে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি হয় সে বৃষ্টির ফোঁটাতেও অবশিষ্টাংশ জলীয়বাষ্পের তুলনায় ভারি আইসোটোপের পরিমাণ বেশি থাকে। তবে প্রথম ধাপের (পর্যায়ের) বৃষ্টির ফোঁটার তুলনায় দ্বিতীয় ধাপের (পর্যায়ের) বৃষ্টির ফোঁটায় ভারি আইসোটোপের পরিমাণ কম থাকে। অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টিতে ^{18}O এর পরিমাণ বেশি থাকে এবং শেষের বৃষ্টিতে ^{18}O এর পরিমাণ কম থাকে।

আইসোটোপ মাপক যন্ত্র ও মান

স্থায়ী আইসোটোপের প্রাচুর্য মাপার বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আছে। আইসোটোপের অনুপাত মাপার জন্য মাসস্পেকটোমিটার ব্যবহৃত হয়। ১৯১৮ সনে সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমস্টার (Demster) সর্বপ্রথম মাসস্পেকটোগ্রাফ তৈরি করেন। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের ক্যাভেনডিশ (Cavendish) গবেষণাগারে অ্যাস্টন আর একটি মাসস্পেকটোমিটার তৈরি করেন। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মাসস্পেকটোমিটার তৈরি হয়েছে যেগুলোকে সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ সম্ভব।

আইসোটোপের অনুপাতের পরিবর্তন অতি সামান্য। আর আইসোটোপের অনুপাতটি কোনো একটি আদর্শের (standard) সাথে আপেক্ষিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

আইসোটোপের অনুপাত মাপকের এককে **ডেলটা মান** (δ) বলা হয়। ডেলটার মান হাজারে প্রকাশ করা হয়।

$$\{(\text{নমুনায় আইসোটোপ অনুপাত}) - (\text{আদর্শের আইসোটোপের অনুপাত})\} \text{ আদর্শের আইসোটোপের অনুপাত }] \times 1000$$

মনে করি,

ক = আইসোটোপের অনুপাত = $^{18}O/^{16}O$

δ [{ (ক) নমুনা — (ক) আদর্শ } / (ক) আদর্শ] ১০০০

δ = [$(^{18}O/^{16}O)$ নমুনা - $(^{18}O/^{16}O)$ আদর্শ)} / $(^{18}O/^{16}O)$ আদর্শ] ১০০০

আইসোটোপের অনুপাতটি প্রকাশ করা হয় কোনো আদর্শের সাথে তুলনা করে। যেমন জলীয়বাষ্পে $^{18}O/^{16}O$ অনুপাতের মান কোনো একটি পদার্থের (মনে করি পানির) $^{18}O/^{16}O$, এর তুলনায় কতটুকু বেশি বা কম। সাধারণভাবে কোনো একটি পদার্থে বিদ্যমান দুটি আইসোটোপের অনুপাতকে একটি আদর্শের মধ্যে বিদ্যমান ঐ আইসোটোপের অনুপাত দিয়ে ভাগ করে সেই মানটি দেখতে হবে একক সংখ্যা থেকে কতটুকু বেশি বা কম। যেহেতু ঐ অনুপাতের ব্যবধানটি খুবই কম তাই হাজারে প্রকাশ করা হয়। এটি খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আদর্শ পদার্থটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। অবশ্য সে রকম আদর্শ পদার্থ পাওয়া দুষ্কর। আমেরিকার জাতীয় আদর্শ ব্যুরো (National Bureau of Standard) বা এনবিএস, নমুনার আইসোটোপের অনুপাতকে তুলনা করার জন্য একটি নির্দেশক নমুনা বের করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের আইসোটোপের তুলনা করার জন্য সমুদ্রের পানির আইসোটোপের অনুপাতের সাথে তুলনা করা হয়। এই আদর্শকে আদর্শ গড় সাগর জল (Standard Mean Ocean Water SMOW) বা "স্মো" বলা হয়। অর্থাৎ কোনো নমুনায় অক্সিজেনের দুটি আইসোটোপের অনুপাতকে গড় সাগরের জলের মধ্যকার অক্সিজেনের দুটি আইসোটোপের অনুপাত $(^{18}O/^{16}O)$ দিয়ে ভাগ করে দেখা হয় যে প্রাপ্তমান এক এর চেয়ে কতটুকু কম বা বেশি। উক্ত সমীকরণে ^{18}O এর পরিমাণ আদর্শের (সাগর জলের) চেয়ে নমুনায় বেশি হলে { $(^{18}O/^{16}O)$ নমুনা / $(^{18}O/^{16}O)$ আদর্শ } এর মান এককের চেয়ে বেশি হবে এবং সমীকরণের মান পজিটিভ (ধনাত্মক) হবে। নমুনায় ^{18}O এর পরিমাণ আদর্শের তুলনায় কম হলে সমীকরণের মান নেগেটিভ (ঋণাত্মক) হবে। কার্বন আইসোটোপের বেলায় আমেরিকার দক্ষিণ ক্যারোলিনার ক্রেটাসিয়াস সময়ের পেডি সংঘের মধ্যে যে বেলেমনিটেল্লা আমেরিকানা পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ ধরা হয় (Belemnitella Americana from the Cretaceous Pee Dee Formation,South Carolina–PDB)। কার্বন আইসোটোপ তুলনার এই আদর্শকে পিডিবি (PDB) আদর্শ বলা হয়।

জাতীয় আদর্শ ব্যুরো অক্সিজেন আইসোটোপের বেলায় পরিস্রুত জল (distilled water) ব্যবহার করে থাকে। সাগরজল ও পরিস্রুত জলের মধ্যকার অক্সিজেন আইসোটোপের অনুপাতের সম্পর্কটা নিম্নরূপ :

$$({}^{১৮}O/{}^{১৬}O)\ \text{স্মো} = ১.০০৮\ ({}^{১৮}O/{}^{১৬}O)\ \text{এনবিএস}$$

সাগর তলানির অক্সিজেন আইসোটোপীয় গবেষণা (Oxygen Isotope Research on Marine Deposits)

কোয়াটারনারির পূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে পৃথিবীতে এমন একটি স্থান বের করতে হবে যেখানে আজ থেকে প্রায় ২/৩ মিলিয়ন বছর ধরে অবিরাম পললক্ষেপণ হচ্ছে। স্থলভাগের অবক্ষেপগুলোতে প্রায়ই অসংগতি বা পললক্ষেপণে বিরতি দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্র হলো এমন একটি জায়গা যেখানে বার্ষিক পললক্ষেপণের পরিমাণ অতি সামান্য হলেও অবিরাম পললক্ষেপণ লক্ষ্য করা যায়।

সমুদ্রতলের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় কোয়াটারনারি তলানি দেখা যায় না। যদিও বা দেখা যায় সেগুলো সাগরতল দেশীয় স্রোত দ্বারা পুনঃক্ষেপণকৃত নতুবা পঙ্কিলতা স্রোত দ্বারা মহীতলের সন্নিকটে পাললিত হয়। সাগরতলে প্রায়ই এক জায়গা থেকে তলানি পঙ্কিলতা স্রোত (density current) দ্বারা অন্য জায়গায় পুনঃপললক্ষেপণ হতে পারে। সমুদ্রের তলদেশের ঢিবির ধারে তলানির নড়াচড়া বা পুনঃক্ষেপণ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সমুদ্রের ঐসব প্রতিবেশের তলানিকে **সৈন্ধব-জৈব তলানি** (Pelagic sediments) এবং প্রতিবেশকে **সৈন্ধব-জৈব প্রতিবেশ** বলে (Pelagic environment)। সৈন্ধব-জৈব প্রতিবেশের বার্ষিক পললক্ষেপণের হার অতি সামান্য ; প্রতি হাজার বছরে এক বা মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। হাজার বছরে ৫ সেন্টিমিটার হারে পাললিত তলানি অক্সিজেন আইসোটোপের গবেষণার জন্য সবচেয়ে ভাল। সমুদ্রের তলানির আর একটি অসুবিধা হলো বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার নড়াচড়ায় বা ক্রিয়াকর্মে তলানিগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে, মধ্য প্লেইস্টোসিনের আগের তলানির পললক্ষেপণের হার খুবই কম এবং ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা তলানিগুলো কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়েছে। ফলে অক্সিজেন আইসোটোপের গবেষণার জন্য খুব একটা সুবিধাজনক নয়।

১৯৪৭ সালে কুলেনবার্গ পিস্টন আবিষ্কারের ফলে প্রায় ১০ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত গভীরতার সামুদ্রিক তলানির নমুনা সংগ্রহ সম্ভব। সামুদ্রিক তলানি সংগ্রহের জন্য বর্তমানে অবশ্য আরোও ভাল ভাল কুরুনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

সৈন্ধব-জৈবিক প্রতিবেশের জৈবিক তলানি নিয়ে অক্সিজেন আইসোটোপ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এসব জৈবিক তলানির ৩০% এর বেশিই হলো জীবের কঙ্কাল-জাতীয় পদার্থ এবং কাদা। প্লাঙ্কটনিক ফোরামিনিফেরা সমুদ্রের পানি থেকে ক্যালসিয়াম

কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং সিলিকন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং তাদের মৃত্যুর পর সেগুলো সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়।

গভীর সমুদ্রের তলানির জৈব ফসিলের অক্সিজেন আইসোটোপের গবেষণার মাধ্যমে কোয়াটারনারির জলবায়ু পরিবর্তনের অনেক প্রমাণই মিলে। অনেক সৈন্ধব-জৈবিক পদার্থের কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করা গেলেও প্লাঙ্কটনিক ও বেনথনিক ফোরমিনিফেরা দিয়েই অধিকাংশ গবেষণা পরিচালিত হয়। সামুদ্রিক কোরাল খুব একটা ভাল ফলাফল না দিলেও সেগুলো সমুদ্রে পুরাতাপমাত্রা ও সামুদ্রিক গভীরতা নির্দেশক।

আইসোটোপ গবেষণার সকল কৃতিত্বই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারোল্ড ইউরির। তিনি বলেন, যদিও রাসায়নিক গঠনের (chemical composition) দিক দিয়ে আইসোটোপগুলো একই রকম কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তারা ভিন্নতর আচরণ করে। পানি যখন জলীয়বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তখন ^{16}O, ^{17}O ও ^{18}O অণুসংবলিত পানি বিভিন্ন হারে জলীয়বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি পাতলা আইসোটোপের অণু (^{16}O) আগেই জলীয়বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। ফলে পানিতে ভারি আইসোটোপের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ থেকেই বুঝা যায় পানিতে আইসোটোপের পরিমাণ কোনোভাবেই অপরিবর্তনীয় নয়। হিমযুগে সাগরের পানি জলীয়বাষ্প ও পরে বরফ আকারে স্থলভাগে স্থান নিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে পাতলা অক্সিজেন আইসোটোপ সর্বাগ্রে জলীয়বাষ্পের সাথে স্থলভাগে চলে যাওয়ায় সমুদ্রের পানিতে ভারি অক্সিজেন আইসোটোপের পরিমাণ বেড়ে যায়। সুতরাং সাগরের পানিতে অক্সিজেনের ভারি (^{18}O) বা পাতলা (^{16}O) আইসোটোপের পরিমাণ তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। সমুদ্রের পানি থেকে কোনো জৈবিক বা অজৈবিক কার্বনেটজাতীয় পদার্থ সাগরতলে তলানি পড়ে তার মধ্যে ধারণকৃত অক্সিজেন আইসোটোপের অনুপাত সেই সময়ের সাগর জলের অক্সিজেন আইসোটোপের অনুপাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সাগরজলের মধ্যকার আইসোটোপের যে কোনো পরিবর্তন সাগরজল থেকে নিঃসৃত সমকালীন যে কোনো পদার্থের মধ্যে তা প্রতিফলিত হবে। সামুদ্রিক পানির দ্রবণ থেকে যখন অক্সিজেন আইসোটোপ সংবলিত কার্বনেট তলানি পড়ে, তখন পানি আর কার্বনেটের আয়নের ভিতর বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ইউরি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় $^{18}O/^{16}O$ এর অনুপাত ০.০০২৩ হারে পরিবর্তিত হয়। সমুদ্রের পানিতে বসবাসকারী বর্তমান ও পুরাকালের প্রাণীর খোলসের অক্সিজেন আইসোটোপের অনুপাত তুলনা করে সেকালের সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা নির্ধারণ করা যায়।

অক্সিজেন আইসোটোপ গবেষণার সংক্ষিপ্ত কার্যপ্রণালী (Procedure of Oxygen Isotope Analysis)

আমরা আগেই বলেছি অক্সিজেন আইসোটোপ গবেষণার মাধ্যমে পুরাকালিয় জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। পৃথিবীর তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং তার সাথে আরোও সম্পর্কযুক্ত সাগর জলের আইসোটোপের অনুপাত। সাগর জলে বাস করে প্লাঙ্কটনিক ফোরামিনিফেরা, নানোপ্লাঙ্কটন, রেডিওলারিয়া, কোরাল ইত্যাদি। এ সকল অণুজীবের দেহের খোলস তৈরিতে প্রতিফলিত হয় সাগর জলের আইসোটোপের অনুপাত। এ সকল অণুজীবের গায়ের খোলস তাদের জীবদ্দশায় সমকালীন সমুদ্রের পানির আইসোটোপের অনুপাতের সঙ্গতি রেখে কার্বনেট দিয়ে তৈরি হয়। আর যেহেতু ঐ অনুপাত তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল তাই তাদের গায়ের কার্বনেটজাতীয় খোলস গবেষণা করে পুরাকালিয় তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

এক বিশেষ ধরনের জাহাজ ব্যবহার করে সন্ধানী কূপ খননের মাধ্যমে সমুদ্রের উপযুক্ত স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য এ সকল নমুনার বেশিরভাগই জৈবিক ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এই জৈবিক ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে ফোরামিনিফেরা (যেমন গ্লোবোরোতালিয়া ট্রাংকাতুলিনইডেস) সংগ্রহ করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে কার্যপ্রণালী নিম্নে দেয়া হলো :

১। আলট্রাসনিক ভাইব্রেটর (ultrasonic vibrator) দিয়ে ফোরামিনিফেরা পরিষ্কার করা হয়।

২। এরপর ফোরামিনিফেরাগুলো ধুয়ে ২০০ মাইক্রোন বুনানি (sieve) দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়।

৩। আভেনের ৫০° ডিগ্রি তাপমাত্রায় বা স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় সেগুলোকে শুকিয়ে নিতে হয়।

৪। এরপর বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে একটি বিশেষ প্রজাতি সংগ্রহ করা হয়।

৫। প্রায় এক মিলিগ্রামের মতো নমুনা নিতে হয়। আগে ৩ থেকে ৫ মিলিগ্রাম নিতে হতো। তাতে প্রায় ৫০ থেকে ১০০টির মতো নির্দিষ্ট প্রজাতির খোলস লাগতো।

৬। হালকা করে সেগুলোকে গুঁড়া করতে হয়।

৭। আলট্রাসনিক দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করতে হয়।

৮। এরপর ধুইতে হয় এবং শুকাতে হয়।

৯। অবশিষ্ট জৈবিক পদার্থ ফেলে দেবার জন্য ক্লরক্স (clorox) ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০। প্রস্তুতকৃত নমুনাগুলোকে ১০০% ফসফরিক এসিড দিয়ে ২৫ বা ৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ধরে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে হয়।

১১। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে সেই গ্যাসকে তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে ঠাণ্ডা করে গ্যাসকে জলীয়বাষ্প মুক্ত করা হয়।

১২। উক্ত গ্যাস (CO_2) একটি মাসস্পেকট্রোমিটারের মধ্যে পরিচালিত করে আইসোটোপের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়।

অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্র (Oxygen Isotope Curve)

১৯৫৫ সনে এমিলিয়ানি (Emiliani) গভীর সমুদ্রে কূপ খননের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত এ সকল নমুনা থেকে ফোরামিনিফেরার চারটি প্রজাতির অক্সিজেন আইসোটোপের অনুপাত বের করেন। গবেষণায় প্রাপ্ত আইসোটোপীয় তাপমাত্রা (ডিগ্রি সে.) খননকূপের গভীরতা অনুসারে সাজিয়ে যে রেখাচিত্রগুলো পাওয়া গিয়েছিল তাতে ১৫টি ধাপ পরিলক্ষিত হয়। খননকূপের সব উপরে প্রতিনিধিত্বকারী ধাপটিকে প্রথম ধাপ (১) ধরা হয় যা বর্তমানের হিমবিরতি হলোসিন উপযুগকে নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ধাপকে (২) ঠাণ্ডাকাল (হিমযুগ) ধরা হয়। এভাবেই বিজোড় সংখ্যার ধাপগুলো গরম কাল (হিমবিরতি) এবং জোড় সংখ্যার ধাপসমূহ ঠাণ্ডা কাল (হিমযুগ) নির্দেশক। দুটি ধাপের সীমারেখা ধাপগুলোর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বিন্দুদ্বয় সংযোগকারী রেখার মধ্যবিন্দু।

অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্রের অনেকটা করাতের দাঁতের মতো; সিনুসয়ডাল প্রকৃতির নয়। এর কারণ হলো, গড়ে প্রায় ৯০ হাজার বছর ধরে খুব অল্প অল্প করে যে বরফ স্থলভাগের উপরে জমা হয় তা গলে যেতে মাত্র এক দশমাংশ সময় লাগে। এরূপ দ্রুত বরফ গলে যাওয়াকে **সমাপ্তি** (termination) বলা হয়। এ সমাপ্তিগুলো সমুদ্রের পানিতে ^{18}O আইসোটোপটি কমে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। অক্সিজেন আইসোটোপের ধাপ - ২ থেকে ধাপ - ১ এ রূপান্তরকে সমাপ্তি - ১ বলা হয়। তেমনি ধাপ - ৬ থেকে ধাপ - ৫ এ রূপান্তরকে সমাপ্তি - ২ বলা হয়। ১৯৭৩ সনে স্যাকলেটন ও অপডাইক (Shackleton and Opdyke, 1973) প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন প্লাটু (Solomon Plateau, ৩১২০ মি. গভীরতা) এর খননকূপ-ভি-২৮-২৩৮ থেকে সংগৃহীত নমুনার অক্সিজেন আইসোটোপের রেখাচিত্র তৈরি করেন (চিত্র ৬.১)। ধাপ সংবলিত অক্সিজেন আইসোটোপের এ রেখাচিত্র প্লাইস্টোসিন সময়ের শেষের দিকের ৯,০০,০০০ বছর নির্দেশ করে। জোড়া ধাপগুলো ঠাণ্ডাকাল (হিমযুগ) এবং বিজোড় ধাপগুলো গরমকাল (হিমবিরতি) নির্দেশক। এ রেখাচিত্রের ১৯ নং ধাপটি ব্রানহেস ও মাতুইয়ামা যুগের সীমারেখা নির্দেশক। স্যাকলেটন ও অপডাইকের অক্সিজেন আইসোটোপের ২১ ধাপবিশিষ্ট এই রেখাচিত্রটি আদর্শ রেখাচিত্র হিসেবে বিবেচ্য।

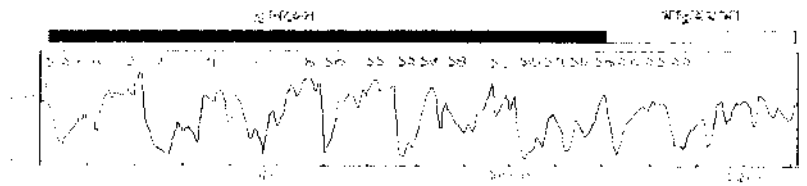

চিত্র ৬.১ : অক্সিজেন আইসোটোপের আদর্শ রেখাচিত্র।
(সূত্র : স্যাকলেটন ও অপডাইক, ১৯৭৩)।

তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে সামুদ্রিক কোয়াটারনারির অবক্ষেপের বয়স নির্ণয় করা হয়, যথা : (১) ইউরেনিয়াম থোরিয়াম পদ্ধতি, (২) কার্বন-১৪ পদ্ধতি ও (৩) পুরাচৌম্বকত্ব পদ্ধতি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অক্সিজেন আইসোটোপের ৫ নং ধাপটি পুনরায় ৫টি উপধাপে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা : ৫এ, ৫বি, ৫সি, ৫ডি ও ৫ই। ৫ নং ধাপটিকে শেষ হিমবিরতি বলা হয়। ৫ই উপ-ধাপটি শেষ হিমবিরতির শুরু করা হয়। এই উপ ধাপটির (৫ই) প্রকৃত বয়স ১১৮ বা ১২৫ হাজার বছর।

পিগোট এবং ইউরে (১৯৪২) থোরিয়াম-২৩০ পদ্ধতির মাধ্যমে সামুদ্রিক তলানির বয়স নির্ণয় করেন। ১৯৫৫ সনে রোবিন ও সুইচ কার্বন-১৪ এবং ১৯৬৯ সালে হেজ পুরাচৌম্বকত্বের মাধ্যমে সামুদ্রিক পললের বয়স নির্ণয় করেন।

BANGDOC Library Dhaka

গ্রন্থপঞ্জি

অ্যালেন, জে. আর. এল. ও ভি. পি. রাইট, ১৯৮৯ : Paleosol in siliciclastic sequence. Postgraduate Research Institute for Sedimentology. University of Reading, Whiteknights, Reading RGB 2ab.

আলম, এম. কে. ও এম. আর. খান, ১৯৮০ : Madhupur clay and its probable scope of economic uses. Seminar and Exhibition, 1980.

ইসলাম, এম. এ., ১৯৭৪ : On the madhupur Clay. Journal of the Bangladesh National Geographic Association. V.2, no. 1 and 2.

উইম্‌স্ট্রা, টি. এ., ১৯৬৯ : Palynology of the first 30 metres of a 120 m deep section in northern Greece., Acta Botan, Neerl., 18, 511.

এলজিয়ারস্‌মা, এস., ১৯৬৬ : Sea-level changes during the last 10,000 years. Proc. International Symposium on World climate from 8000 B.C. Imperial College London, 18-19 April, 1966. Roy. Met. Soc. London, p. 54-71.

ওয়েস্ট, আর. জি., ১৯৬৮ : Pleistocene Geology and Biology. With special reference to the British Isles. Lonmans green and co. Ltd. London and Harlow.

ওল্ডস্টেড্‌ড্‌, ১৯৬৭ : The Quaternary of Germany. In The Quarternary (ed K, Rankama), 239-300. New York and London.

কক্স, এ., ১৯৬৯ : Geomagnetic reversals. Science, 163, 237-245.

কক্স, এ. ও ডোয়েল, আর. আর., ১৯৬০ : Review of palcomagnetism. Geol. Soc. Amer. Bull., 71, 645-768.

কক্স, এ., ডোয়েল, আর. আর. এবং জি. বি. ড্যালরিম্‌পল্‌, ১৯৬৩ক : Geomagnetic polarity epochs and Pleistocene geochronology. Nature, 198, 1049-1051.

কক্স, এ., ডোয়েল, আর. আর. এবং জি. বি. ড্যালরিম্‌পল্‌, ১৯৬৩খ : Geomagnetic polarity epochs : Sierra Nevada II, Science, 142, 382-385.

জাগভেইন, ডব্লিউ. এইচ., ১৯৭৪ : The Plio-Pleistocene boundary in western and southern Europe, Boreas, 3, 75-97.

জাগভেইন, ডব্লিউ. এইচ., ১৯৭৫ : Variations in climate as shown by pollen analysis especially in the Lower Pleistocene of Europe. In Ice ages : Ancient and modern (eds A. E. Wright and F. Moseley), (Seel House, Liverpool), 137-52.

জুনার, এফ. ই., ১৯৫৯ : The Pleistocene Period : its climate, chronology and faunal successions, 2nd edn., London.

টারলিং, ডি. এইচ., ১৯৭১ : Principles and application of palaeomagnetism. Chapman & Hall, 11 New Fetter Lane, London EC4.

টারলিং, ডি. এইচ., ১৯৭৩ : Palaeomagnetism. Principles and application in Geology, Geophysics and Archaeology. Chapman and Hall, London, New York.

পেনক্, এ. ও ই. ব্রাকনার, ১৯০৯ : Die Alpen im Eiszeitalter, Leipzig.

ফেয়ারব্রিজ, আর. ডব্লিউ., ১৯৬১ : Eustatic changes in sea level. Physics and Chemistry of the Earth. V. 4, p. 99-185.

ফেরগুসন, জে., ১৮৬৩ : Delta of the Ganges. Quaternary Journal of the Geological Society of London. V. XIX, p. 321-354.

বকর, এম. এ., ১৯৭৭ : Quaternary geomorphic evolution of the Brahmanbaria-Noakhali area., Comilla and Noakhali districts, Bangladesh. Records of the Geological Survey of Bangladesh. Vol. 1, part. 2, 1-48.

বাগচি, কে., ১৯৪৪ : The Ganges Delta. Department of Geography, Calcutta University, India, p. 39-49.

বুওল, এস. ডব্লিউ, হোল, এফ. ডি. এবং এমসিক্রাকেন, আর. জে., ১৯৭৩ : Soil Genesis and Classification. The Iowa State University Press, Ames.

বুডেল, জে., ১৯৪৯ : Die raumliche und zeitliche Gliederung Eiszeitklima, Die naturwissenschafen, 36, 105-112, 133-139.

বুলক, পি., ফেডরফ, এন., জনজিরিয়াস, এ., স্কুপস্, জি., তুরসিনা, টি এবং ইউ. বাবেল, ১৯৮৫ : Handbook for thin section description. Wolverhampton, England, Waine Research Publication, 152p.

বোয়েন, ডি. কিউ., ১৯৭৮ : Quaternary Geology. A Stratigraphic Framework for Multidisciplinary Works. 1st Edn., Pergamon press, Willium Clowes & sons Ltd., London, Beceles and Colchester.

ব্রেউয়ার, আর., ১৯৬৪ : Fabric and Mineral Analysis of Soil. John Willy and Sons, New York.

ভ্যান ডার হামেন, টি., উইম্স্ট্রা টি. এ. এবং ডব্লিউ. এইচ. জাগভেইন, ১৯৭১ : The floral record of the Late Cenozoic of Europe. In *The Late Cenozoic glacial ages* (ed. K.K. Turekin), 391-424.

মনসুর, এম. এইচ., ১৯৯২ : Quaternary stratigraphy of the Barind area of the Bengal Basin, Bangladesh. Ind. J. Earth. Sci., v. 19, n.2-3, p. 79-84.

মনসুর, এম. এইচ., ১৯৯২ : Palaeopedological and miromorphological studies of the Lalmai Clay, Madhupur and Barind Formations of the Bengal Basin. Bangladesh. J. Sci. Res., 10(2) : 143-152.

মনসুর, এম. এইচ., ১৯৯৪ : Quaternary stratigraphy of the Madhupur area of the Bengal Basin, Bangladesh. Bangladesh J. Sci. Res., v. 12. no. 1, p. 41-47

মনসুর, এম. এইচ., ১৯৯৪ : Palaeomagnetic studies of the Quaternary deposits. exposed in the Madhpur area of the Bengal basin. Dhaka Univ. J. Sci., v. 42. n. 2, p. 247-252.

মনসুর, এম. এইচ., ১৯৯৫ : Procedure of removal of secondary magnetic components of the Quaternary sediments of the barind area of the Bengal basin. Dhaka Univ. J. Sci., v. 43, no. 1. p. 53-57.

মনসুর, এম. এইচ., ১৯৯৫ : Behaviour of magnetic components of the sediments of the Madhpur area during the demagnetization tests. Bang. J. Sci. Res. 13 (1) : 71- 77.

মনসুর, এম. এইচ., ১৯৯৫ : An Introduction to the Quaternary Geology of Bangladesh. City Press and Publications : 2, Nandalal Datta Lane, Dhaka-1000.

মনসুর, এম, এইচ. : A preliminary palaeomagnetic results of the Quaternary deposits exposed in the Barind area of the Bengal basin. Bangladesh. Bangladesh J. Sci. Res.

মনসুর এম. এইচ., ও চৌধুরী, এম. এম. এম., ১৯৯৬ : Late Quaternary climatic fluctuations and the depositional history of the Bengal basin. Jour. Nepal Geol. Society.

মনসুর ও অন্যান্য, ১৯৯৩ : Quaternary stratigraphy of the Chalanbil area of the Bengal basin. The Raj. Univ. Stud., part-B, vol. XXI, p 99-108.

মনসুর, এম. এইচ. ও কামাল, এ. এস. এম. এম. ১৯৯৪ : Holocene sea level changes along the Maiskhali and Cox's Bazar Teknaf coast of the Bay of Bengal. The J. Noami, vol. 11, no. 1. p. 15-21.

মাতুইয়ামা, এম., ১৯২৯ : On the direction of magnetization of basalt in Japan. Tyozen and Manchuria. Proc. Imp. Acad. Japan. 5. 203-205.

মিলানকোভিচ, এম., ১৯৪১ : Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf des Eiszeitpproblem, Acad. Roy. Serbe, Spec., Ed., 133, 922pp.

ম্যানকিনেন, ই. এ. এবং জি. বি. ড্যালরিমল, ১৯৭৯ : Revised geomagnetic polarity timescale for the interval 0-5 m.y. BP. J. Geophys. Res., 84, 615-626.

রিচটার, জে., ১৯৬১ : Aufpressungsosartige Gletscherbruchrucken sudlich Cloppenburg in Oldenburg. Z. Deut. Geol. Ges., 112, 369.

রেটালাক, জি. বি., ১৯৮১ : Fossil soil : Indicator of ancient terrestrial environments, in Niklas, K. J., ed., Palaeontology, Palaeoecology and evolution. v.1. New York, Praeger Publishers, p. 55-102.

রেটালাক, জি. বি., ১৯৮৩ : A palaeopedological approach to the interpretation of terrestrial sedimentary rocks. The Mid-Tertiary fossil soil of Badlands National park, South Dakota. Geol. Soc. Am. Bull., v. 94, p. 823-840.

হামেন, টি. ভ্যানডার, উইম্‌স্ট্রা, টি. এ এবং জাগভেইন, ডব্লিউ. এইচ., ১৯৭১ : The floral record of the Late Cenozoic of Europe. In the Late Cenozoic glacial ages (Ed K. K. Turekin), 391424.

হাসান, এম., ১৯৮৬ : Stratigraphical and Sedimentological Studies on the Quaternary deposits of the Lalmai Hills (with relation to the Madhpur tract and the adjoining floodplain), bangladesh. D.Sc. Dissertation submitted to the Free University of Brussels, Belgium.

হেডবার্গ, এইচ. ডি., ১৯৭৬ : International Stratigraphic Guide : A Guide to the Stratigraphic classification, terminology and procedure. International Subcommission on Stratigraphic Classification of IUGS Commission on Stratigraphy.

সর্বাধিকারী, ত.র, ১৯৮১ : ভারতের শিলাস্তর ও ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা।

স্যাকলেটন, এন. জে. ও এন. ডি. অপডাইক, ১৯৭৩ : Oxygen Isotope and Palaeomagnetic Stratigraphy of Equitorial Pacific Core V28-238 : Oxygen Isotope Temperatures and Ice volumes on a 105 and 106 year scale. Quaternary Research, 3, 39-55.

পরিভাষা

absolute dating	প্রকৃত বয়স
active layer	সক্রিয় স্তর
alternation	পর্যায়িত
anhysteric magnetization	মূর্ছিত চৌম্বকত্ব
archaemagnetism	প্রত্নচৌম্বকত্ব
authigenic	অনুজাত
basin	বেসিন বা অববাহিকা খাত
Bed	স্তর
belt	বলয়
Biostratigraphic unit	জীবস্তরীয় একক
Biozone	জৈবিক অঞ্চল
boulder	বোল্ডার
buried soil	আচ্ছাদিত মৃত্তিকা
Cenozoic Era	নবজীবীয় অধিযুগ
Chronostratigraphic unit	কালস্তরীয় একক
cliff	খাড়া পাহাড়
coarse	মোটা
consolidated rock	কঠিন শিলা
continental	মহাদেশীয়
correlation	পারম্পর্য
cover sand	আবরণ বালি
cross-section	প্রস্থচ্ছেদ
cryoturbation	ঠাণ্ডা উপদ্রুত
deformed	বিকৃত
deposits	অবক্ষেপ
deposition	অবক্ষেপণ
Early	পুরা
environment	প্রতিবেশ
Epoch	উপযুগ
erosional unconformity	ক্ষয়জাত অসংগতি
exotic	বিদেশীয় উদ্ভিদাদি
faunal	জৈবিক
fine	মিহি
fired clay	পোড়া কাদা
fluvial deposit	প্লাবনাবক্ষেপ
fluvioglacial	হৈমিক প্লাবন
flysch	ফ্লিশ
Formation	সংঘ
frozen ground	হিমজমাট ভূমি
gorge	গিরি উপত্যকা
Group	সংঘদল
guide fossil	প্রদর্শক জীবাশ্ম
horizonation	দিগন্তকরণ
hummock	ক্ষুদ্র পাহাড়, টিবি, তুষার স্তূপ
ice-sheet	হিমস্তর
ice-wedge	বরফ গোঁজ
Index fossil	সূচক জীবাশ্ম
intensity	তীব্রতা
interpluvial	বর্ষাবিরতি (শুষ্ককাল)

Late	নব
lateral extension	পার্শ্বিক বিস্তৃতি
lithology	শিলালক্ষণ
Lithostratigraphic unit	শিলাস্তরীয় একক
loam	লোম বা সারমাটি
lodgement	অস্থায়ী জমাট
loess	লোয়েস
long axis	লম্বাক্ষ
lower	নিম্ন
magnetic reversal	ভূচুম্বকের ক্ষেত্র (মেরু) উল্টান
marine regression	সামুদ্রিকসংকোচন/ সমুদ্রের পশ্চাদগামিতা
marine transgression	সমুদ্রোচ্ছ্বাস, সমুদ্রের সম্মুখগামিতা
medium	মাঝারি
Member	সভ্য
Middle	মধ্য
mixed	মিশ্র
movement	আলোড়ন
Normal polarity	সিধা (স্বাভাবিক) মেরুপ্রবণতা
oblation	নৈবেদ্য হিমকর্দ
orogeny	গিরিজনি
outwash plain	হিমান্ত পলিভূমি
pebble	উপল
periglacial zone	হিমসান্নিধ্যাঞ্চল
period	যুগ
permafrost	চিরতুষার ভূমি
plankton	ভাসমান
pluvial	বর্ষাকাল (বৃষ্টিময়)
polarity	মেরু প্রবণতা
regression	সংকোচন
relative dating	আপেক্ষিক বয়স
remanence	চৌম্বকাবশেষ
Reversal	উল্টানো
reversed polarity	উল্টা-মেরুপ্রবণতা
rotational axis	ঘূর্ণাক্ষ
seasonal frozen ground	কালিয় হিমজমাট ভূমি
section	ছেদচিত্র
Secular variation	ব্যাপক ব্যবধান
sedimentary structure	পাললিক গঠন
sedimentation	পললক্ষেপণ
sequence	পর্যায়ক্রম
series	শ্রেণী
shearplain till	স্পর্শকতল হিমকর্দ
short axis	ক্ষুদ্রাক্ষ
snow line	হিমরেখা
solifluction	মৃত্তিকাপাত, মৃত্তিকাবাহ
sorting	বাছাই
Stage	সোপান
stratigraphic correlation	স্তরক্রমের পারম্পর্য
stratigraphic Column	ভূস্তর স্তম্ভ
stratigraphic unit	স্তরীয় একক
structural unconformity	গাঠনিক
structure	গঠন
Substage	অনুসোপান

succession	স্তরক্রম
System	গোষ্ঠী
Taxa	শ্রেণী
Terrace	চত্বর, সোপান
till	হিমকর্দ
Timescale	সময় মাপনী
transgression	সম্মুখগামিতা, উচ্ছ্বাস
trough	দ্রোণী
Type area	আদর্শ ভূমি
Type locality	আদর্শ স্থান
unconformity	অসংগতি
unconsolidated rock	নরম শিলা
unsorted	অবাছাই
Upper	ঊর্ধ্ব

BANSDOC Library
Accession No. 17813
BANSDOC Library Dhaka

ড. মোঃ হোসেন মনসুর ১৯৫৩ সালের ২৭শে জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ থানার কুশাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ১৯৬৮ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯৭০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারি বৃত্তি নিয়ে মস্কো জিওলজিক্যাল প্রসপেক্টিং ইন্সটিটিউটে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৭৮ সালে ভূতত্ত্ব ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম মাস্টারস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৮৪ সালে তিনি বেলজিয়াম সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্রাসেলস গমন করেন এবং ফ্রি ইউনিভার্সিটি অব ব্রাসেলস-এ ১৯৮৬ সালে কোয়াটারনারি জিওলজিতে দ্বিতীয় মাস্টারস ডিগ্রি এবং ১৯৯০ সালে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন। ড. মোঃ হোসেন মনসুর ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং এখন পর্যন্ত উক্ত বিভাগে প্রফেসর পদে কর্মরত আছেন। এ যাবৎ তাঁর বাংলা ও ইংরেজিতে দুটি গ্রন্থসহ প্রায় ৩০টিরও বেশি দেশী ও বিদেশী গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইউনেস্কো পরিচালিত আইজিসিপি-৩৪৭ প্রজেক্টের প্রধান যেখানে সার্কভুক্ত ভারত ও নেপাল ছাড়াও আমেরিকার কতিপয় কোয়াটারনারি জিওলজিস্ট গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত।